নওবেলাল

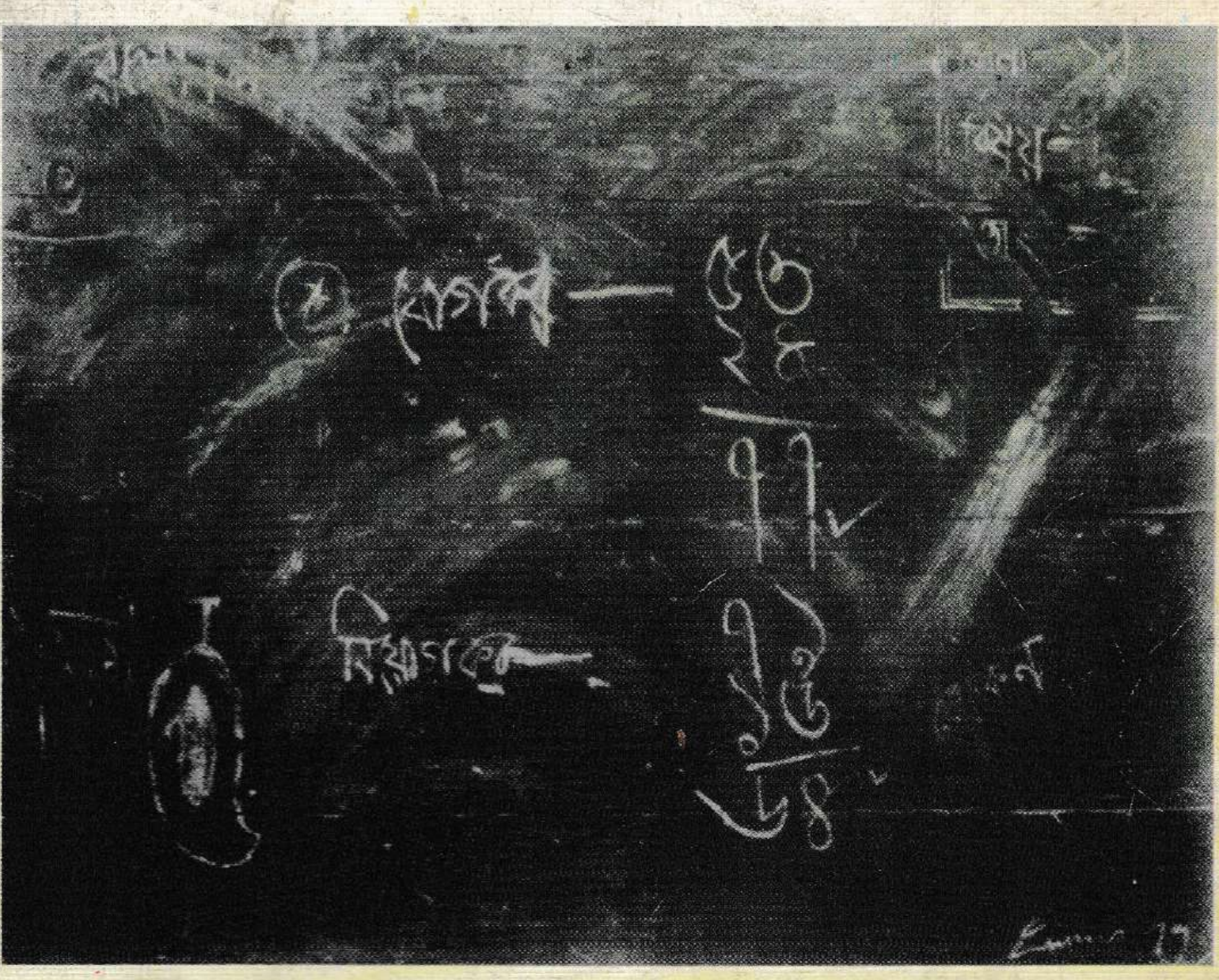

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল

নওবেলাল

বিদ্যালয় বার্ষিকী-২০০৩

"হে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা প্রতি পালক—আমার হৃদয়ে জ্ঞানের প্রসারতা দাও,
আমার কাজকে সহজ করে দাও, আমার জড়তা ভেঙ্গে দাও—
যেন আমার বক্তব্য মানুষ ভাল ভাবে বুঝতে পারে।"— আল-কুর'আন

বাংলা ১৪১০ *হিজরী ১৪২৪*

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল
বাহাদুর শাহ পার্ক, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৬৮০১

পৃষ্ঠপোষকতায়	ঃ	জনাব নাজমুন নাহার শাহীন প্রধান শিক্ষক ও জনাব সাজনে আরা মালেক সহকারী প্রধান শিক্ষক
প্রকাশনায়	ঃ	বার্ষিকী সম্পাদনা পরিষদ
প্রকাশকাল	ঃ	ডিসেম্বর ২০০৩ইং
সম্পাদক	ঃ	মোঃ আবুল বাসার ভুঁইয়া সহকারী শিক্ষক
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়	ঃ	ময়নুল ইসলাম পল শিল্পী মোহাম্মদ ইউনুসের-'শৈশব থেকে' চিত্র অবলম্বনে
ডিজাইনার	ঃ	কে, এম, রুহুল মুনির চঞ্চল ও মোঃ শফিকুল ইসলাম শফিক
অক্ষর বিন্যাস	ঃ	জি, পি, চক্রবর্ত্তী, মোঃ শাহজাহান, মোঃ কাওছার, মোঃ নয়ন সরদার
মুদ্রণে	ঃ	**কমার্শিয়াল আর্ট প্রেস** ৮০/৪, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০ ফোন ঃ ৭১২০৮৮৮, ৭১১৮৭৫৯

উৎসর্গ

"মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী শহীদ

ও

বিদ্যালয়ের কৃতী সন্তানদের উদ্দেশ্যে"

পরলোকগত শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

১। মরহুম এ. আই. এম. আঃ রশিদ
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

২। মরহুম কাজী নূরুল হক
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

৩। মরহুম এম, এ, মোতালেব
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

৪। মরহুম আব্দুর রশিদ
প্রাক্তন সহকারী শিক্ষক

৫। মরহুম আব্দুর রহিম
সহকারী শিক্ষক

৬। মরহুম আব্দুর রশিদ
সহকারী শিক্ষক

৭। মরহুম কিউ. এম. এ. গফুর
সহকারী শিক্ষক

৮। মরহুম মোঃ সানাউল্লাহ
প্রাক্তন সহকারী শিক্ষক

৯। মরহুম নূর মোহাম্মদ
সহকারী শিক্ষক

১০। মরহুম মকবুল হোসেন মিজি
প্রাক্তন অফিস সহকারী

১১। মরহুম আব্দুস ছালাম
দপ্তরী

১২। মরহুম সৈয়দ আহম্মদ চৌধুরী
মালি

আমরা এ বিদ্যালয়ের পরলোকগত উপরোক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল
প্রধান শিক্ষকবৃন্দের নামের তালিকা ঃ

নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কার্যকাল
১।	জনাব খান বাহাদুর কাজী জহিরুল হক	বি.এ	৮-৮-১৯১৬ হইতে ২২-৬-১৯২৩
২।	জনাব আবুল মকসুদ	বি.এ	২৩-৭-১৯২৩ হইতে ১১-৯-১৯২৩
৩।	জনাব খান বাহাদুর আব্দুল খালেক	বি.এ	১৫-৯-১৯২৩ হইতে ৩-৮-১৯৩৩
৪।	জনাব এ এম মোঃ আর্শাদ	বি.এস.সি, বি.টি	১৫-৯-১৯৩৩ হইতে ২-১১-১৯৩৭
৫।	জনাব আব্দুর রেজ্জাক চৌধুরী	বি.এ, বি.টি	৯-১২-১৯৩৭ হইতে ১৯-৮-১৯৩৮
৬।	জনাব আব্দুর রহমান	বি.এ, ডিপ-ইন-এড (পাটনা)	২০-৮-১৯৩৮ হইতে ২২-২-১৯৪৭
৭।	জনাব মোঃ ওসমান গনি	বি.এ, বি.টি	২৩-২-১৯৪৭ হইতে ৯-৯-১৯৪৭
৮।	জনাব মোঃ একরাম হোসেন	বি.এ, বি.এল.বি.টি, ডিপ-ইন-এড (এডিনবার্গ)	১০-৯-১৯৪৭ হইতে ৫-১১-১৯৪৯
৯।	জনাব আবদুল হামিদ	বি.এস.সি, বি.টি	৬-১১-১৯৪৯ হইতে ২৪-২-১৯৫০
১০।	জনাব আবদুল ওয়াজেদ খান চৌধুরী	এম.এ, বি.টি	২৫-২-১৯৫০ হইতে ৩১-১-১৯৫১
১১।	জনাব ফজলুল হক	এম.এ, বি.টি	১৭-৫-১৯৫১ হইতে ১৭-৬-১৯৬০
১২।	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন ভূঁইয়া	বি.এস.সি, বি.টি	১৬-১১-১৯৬০ হইতে ৪-১২-১৯৬১
১৩।	জনাব মোঃ আমীর আলী	বি.এস.সি, ডিপ-ইন-এড, (প্রথম শ্রেণী)	৯-৫-১৯৬২ হইতে ২৭-৪-১৯৬৩
১৪।	জনাব শেখ মোহাম্মদ	এম.এ, বি.টি	২৮-৪-১৯৬৩ হইতে ৮-৯-১৯৬৪
১৫।	জনাব কলিম উদ্দিন ভূঁইয়া	এম.এ, বি.টি	৯-৯-১৯৬৪ হইতে ২১-১২-১৯৬৫
১৬।	জনাব মোঃ মতিউর রহমান খান	বি.এ, বি.টি	১৭-২-১৯৬৫ হইতে ২০-৫-১৯৭০
১৭।	জনাব মোঃ সোলেমান আখন্দ	বি.এ (সম্মান), এম.এ.বি.টি (প্রথম শ্রেণী)	১৫-৭-১৯৭০ হইতে ৪-১০-১৯৭২
১৮।	জনাব মোঃ নূরুল হক	বি.এ, বি.টি	১৪-১১-১৯৭২ হইতে ৩-৫-১৯৮১
১৯।	জনাব মোঃ ডঃ সৈয়দ আহম্মদ	বি.এস.সি, বি.এড, এম.এড	২১-১-১৯৮১ হইতে ১১-৪-১৯৮৫
২০।	জনাব এম এ মোতালেব	বি.এস.সি, এম.এ.বি.টি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (লন্ডন) নিউ-ক্যাসেল, জাপান, বি.সি.এস (শিক্ষা)	১৬-৭-১৯৮৫ হইতে ২১-১২-১৯৮৬
২১।	জনাব এ আই এম, আবদুর রশীদ	বি.এস.সি, বি.এড, বি.সি.এস (শিক্ষা)	১৪-১-১৯৮৭ হইতে ৩০-১০-১৯৯০
২২।	মিসেস নিলুফার বেগম	এম.এ, বি.এড, বি.সি.এস (শিক্ষা)	১-১১-১৯৯০ হইতে ২৮-১০-১৯৯৪
২৩।	মিসেস নুরজাহান খান	বি.এ, বি.এড, বি.সি.এস (শিক্ষা)	২৯-১০-১৯৯৪ হইতে ২-৭-১৯৯৫
২৪।	জনাব আবদুল মালেক	বি.এস.সি, বি.এড (বৈরুতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত) বি.সি.এস (শিক্ষা)	৩-৭-১৯৯৫ হইতে ২৯-১২-১৯৯৬
২৫।	মিসেস ফিরোজা বেগম		১৬-১-১৯৯৭ হইতে ১৯-১-১৯৯৭
২৬।	মিসেস হোসনে আরা		২৭-৪-১৯৯৭ হইতে ২৯-৪-১৯৯৭
২৭।	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ	এম.এস.সি, এম.এড, বি.সি.এস (শিক্ষা)	২৫-৬-১১৯৯৭ হইতে ২৫-৮-১৯৯৮
২৮।	মিসেস নাজমুন নাহার শাহীন	এম.এস.সি, এম.এড, বি.সি.এস (শিক্ষা)	২৫-৮-১৯৯৮--

বিদ্যালয়ের গৌরব

☆ **খান বাহাদুর আবদুল হাকিম**—এম, এ, (ক্যান্টাব) প্রাক্তন জনশিক্ষা পরিচালক

☆ **জনাব কে, এম, কায়সার**—জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রাক্তন স্থায়ী প্রতিনিধি

☆ **বিচারপতি বি, এ, সিদ্দিকী**—রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি

☆ **জনাব আবদুর রাজ্জাক**—জাতীয় অধ্যাপক

☆ **জনাব এম, ডি, খান**—অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারী

☆ **লেঃ জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) খাজা ওয়াসীউদ্দীন**—প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত

☆ **জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমদ**—অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান

☆ **সৈয়দ আবু নাসের জিয়াউল আহসান**—(স্পীকার, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ)

☆ **আলহাজ্ব, শামসুল হক**—জেলা উন্নয়ন সমন্বয়কারী, ঢাকা, এম, পি,

☆ **সৈয়দ খাজা খয়ের উদ্দীন**—রাজনীতিবিদ

☆ **নবাব খাজা হাসান আসকারী**—সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী

☆ **ডঃ আবদুল্লাহ্-আল-মুতী শরফুদ্দীন**—অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

☆ **ডঃ বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর**—সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

☆ **জনাব আ,ন,ম, বজলুর রহমান**—অধ্যক্ষ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা

☆ **জনাব মোহাম্মদ হোসেন**—অধ্যক্ষ, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কলেজ

☆ **ডঃ এখলাস উদ্দীন আহমেদ**—ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

☆ **ডঃ এম, জেড, হায়দার**—অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

☆ **ডঃ জিয়াউদ্দীন**—সহযোগী অধ্যাপক, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

☆ **ডঃ এ, বি, এম, সালেহউদ্দীন**—সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, চট্টগ্রাম

☆ **লেঃ কর্ণেল শামসুদ্দৌলা**—কমান্ডিং অফিসার, আর্মি ফিল্ড মেডিক্যাল ইউনিট, টাঙ্গাইল

☆ **লেঃ কর্ণেল আব্দুল ওয়াহাব**—আর্মি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী, ঢাকা সেনানিবাস

☆ **জবান হুমায়ুন হামিদ**—জেনারেল ম্যানেজার, অগ্রণী ব্যাংক

☆ **জনাব হাবিবুর রহমান**—যুগ্ম সচিব, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়

☆ **জনাব মুহাম্মদ কাশেম**—জেনারেল ম্যানেজার (মার্কেটিং), বি, জে, এম, সি

☆ **জনাব আব্দুল্লাহ্ চৌধুরী**—এস, পি, ব্যুরো অব এ্যান্টিকরাপশান

☆ **জনাব সালাউদ্দীন আহমদ**—চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ফাইজার ল্যাবোরেটরী ঢাকা

☆ **জনাব মুহম্মদ আবদুল খালেক**—প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার, ডিফেন্স সায়েন্স অর্গানাইজেশান

☆ **জনাব মাহমুদ আলী চৌধুরী**—প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, মতিঝিল (সেন্ট্রাল) গভঃ হাই স্কুল

☆ **জনাব বজলুর রহমান**—পরীক্ষা উপ-নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

☆ **জনাব আবদুল্লাহ-আল-হাদী শরফুদ্দীন**—নির্বাহী প্রকৌশলী, ইমারত বিভাগ, পি.ডব্লিউ.ডি

☆ **জনাব মোঃ নূরুল হক ভূঁইয়া**—প্রধান শিক্ষক, ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ হাই স্কুল, ঢাকা

☆ **উইং কমাণ্ডার খাজা আহসানউল্লাহ**—(সাবেক পাকিস্তান বিমান বাহিনী)

☆ **জনাব আবদুর রহিম**—কমিশনার, ঢাকা পৌর কর্পোরেশন

☆ **জনাব লুৎফর রহমান**—কমিশনার, ঢাকা পৌর কর্পোরেশন

☆ **জনাব হাজী সিরাজুদ্দীন**—কমিশনার, ঢাকা পৌর কর্পোরেশন

☆ **ডঃ মাহফুজুর রহমান**—যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশী চিকিৎসক

☆ **এ, কে, এম, মুস্তাফিজুর রহমান**—জেনারেল ম্যানেজার, জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন

☆ **জনাব ফরায়েজী কামালউদ্দীন আহমেদ**—সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

☆ **লেঃ কর্ণেল মীর নজরুল ইসলাম**—আর্মি অফিসার

☆ **লেঃ কর্ণেল এ, টি, এম, এন, চৌধুরী**—আর্মি অফিসার

☆ **মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) কাজী শরীফউদ্দীন আহমেদ**—জেনারেল ম্যানেজার, মেহের ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

☆ **ক্যাপ্টেন শের মোহাম্মদ খান**—আর্মি অফিসার, ঢাকা সেনানিবাস

☆ **জনাব এ, কে, এম, গাফফার**—জেনারেল ম্যানেজার, জনতা ব্যাংক

☆ **মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) এম, সয়ফুল্লাহ**

☆ **জনাব মোঃ আক্তার আলী**—তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রজেক্ট সার্কেল ইলেকট্রিক্যাল, নতুন জাতীয় সংসদ ভবন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা

☆ **জনাব রশিদুল হাসান**— (অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ)

☆ **জনাব মোল্লা আবদুল মজিদ**— (অবসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারী, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; মেম্বার, পরিকল্পনা কমিশন)

☆ **গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবসরপ্রাপ্ত) কামালউদ্দীন আহমেদ**—প্রাক্তন অধ্যক্ষ, শাহীন স্কুল, ঢাকা

☆ **জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী**—মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

☆ **জনাব মহিউদ্দীন আহমেদ**—উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

☆ **জনাব জিয়াউদ্দীন আহমদ**—জয়েন্ট কমিশনার অব ট্যাকসেস, আপিলেট ডিভিশন, সিলেট

☆ **জনাব এ, এম, সুজাউদ্দীন আহম্মদ**—প্রিন্সিপাল অফিসার, অগ্রণী ব্যাংক, সেন্টাল রিজিওন, ঢাকা

☆ **লেঃ কর্ণেল এম, ওয়াজিউল্লাহ চৌধুরী**—ডেপুটি কমানডেন্ট, বেস ওয়ার্কশপ, ই, এম, ই, সেনানিবাস, ঢাকা

☆ **লেঃ কর্ণেল এফ, কবীর**—আর্মি অফিসার

☆ **শামিম কবীর**—বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক

☆ **আমির আলী খান মজলিশ**—প্রজেক্ট ডাইরেক্টর অব পপুলেশন প্লানিং কমিশন

উৎস ঃ 'নওবেলাল পুনর্মিলন-১৯৮২' থেকে সংকলিত

প্রার্থনা

হে দয়াময় আল্লাহ্‌,সমস্ত প্রশংসা
একমাত্র তোমারই ।
আমাদের জ্ঞান দাও । আমাদেরকে সরল সঠিক
পথে পরিচালিত কর এবং দেশ ও জাতির
জন্য অবদান রাখার তওফিক
দান কর । -আমীন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাণী

শিক্ষার্থীদের কল্পনা, আবেগ, অনুভূতি, চিন্তার উন্মেষ ও প্রকাশের সুযোগ প্রদান এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ঘটিয়ে তাদেরকে সৎ ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিদ্যালয় বার্ষিকীর ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কিশোর অভিযাত্রী দল বিদ্যার্জনের সর্পিল পথে অভিজ্ঞতা অর্জন করে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে কৌতুহল তাদের মনে জাগ্রত হয়, তা সঞ্চারিত হয় বিদ্যালয় বার্ষিকীর মাধ্যমে।

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলের সাহিত্য রথের সারথীদের সুন্দর সৃষ্টির বিকাশ ঘটবে বিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'নওবেলাল' নামে সাহিত্য বার্ষিকীর মাধ্যমে এবং এর মাধ্যমে তারা সমাজে সত্য সুন্দরের প্রতিষ্ঠার সঠিক দিশা পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের শুভ কামনা করছি এবং সকলকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

(ড. এম ওসমান ফারুক এম.পি)
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাণী

কিশোর মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোর উন্মেষ ঘটে নানাবিধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে। আর শিক্ষার্থীদের কোমল মনের সেই অনুভূতিগুলো কচি হাতের কাঁচা, সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াসে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলের বিদ্যালয় বার্ষিকী 'নওবেলাল'।

বিদ্যালয় বার্ষিকী 'নওবেলাল' এর অবদান শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে একদিন আশার আলো হয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। এ কামনা করে বার্ষিকী প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আ.ন.ম. এহছানুল হক মিলন)
প্রতিমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বীজ থেকে ফসল ফলানোর জন্য যেমন দরকার আলো, বাতাস, দরকার মাটির রস; ঠিক তেমনি কিশোর মনের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে আছে তার উপযুক্ত বিকাশের জন্যও দরকার জ্ঞান চর্চা, দরকার লালনের উপযুক্ত পরিবেশ। কিশোররা যদি নিজেদের চরিত্রকে সুদৃঢ় করে, মনোবলকে শক্ত করে যথার্থ ও উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, তবেই দেশ ও দশের কল্যাণে অবদান রাখতে পারবে। আর মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সাহিত্য। শিক্ষার্থীদের মনের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে তথা এসব কোমলমতি বিদ্যার্থীদের অনুভূতিগুলো লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াসে সৃষ্টি বিদ্যালয় বার্ষিকী।

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল অন্যান্যবারের মত এবারও প্রকাশ করতে যাচ্ছে বিদ্যালয় বার্ষিকী 'নওবেলাল'। বিদ্যালয়ের মুখপত্র বার্ষিকীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা স্বাধীন চিন্তার বিকাশ সাধন করে সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করবে বলে আশা রাখি।

পরিশেষে আমি প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলকে এবং ক্ষুদে লেখকদের স্বাগত জানাই আর সেইসঙ্গে ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়ের আরও গৌরবময় সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(প্রফেসর মোহাম্মদ জুনাইদ)
মহা-পরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন
বাংলাদেশ, ঢাকা।

বাণী

সাহিত্য জীবনের দর্পন স্বরূপ। শিশু-কিশোরদের উন্নততর বৃত্তিগুলো চায় সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের আলো। সাহিত্য সুন্দরের প্রকাশ। সাহিত্য শুধু সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে না.....প্রকাশ করে আনন্দকে সুন্দর রূপে। শিশু কিশোরদের আনন্দের এই ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল প্রকাশ করতে যাচ্ছে বিদ্যালয় বার্ষিকী 'নওবেলাল'। আমি জেনে আনন্দিত যে, বার্ষিকী প্রকাশনার প্রতিটি পৃষ্ঠা আগামী প্রজন্মের ক্ষুদে সাহিত্যিকদের লেখায় রঞ্জিত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োগবাদী দার্শনিক জন ডিউই শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেছিলেন-"সক্রিয়ভাবে কাজ করার মধ্য দিয়েই সত্যিকার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব।" তরুন শিক্ষার্থীদের বার্ষিকী প্রকাশনার বর্তমান অভিজ্ঞতা, মেধা ও শ্রম অনাগত ভবিষ্যত নির্মানের অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আমার বিশ্বাস। বার্ষিকী প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(প্রফেসর মোঃ শামসুর রহমান)
পরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন
বাংলাদেশ, ঢাকা।

বাণী

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল, ঢাকা এর বার্ষিকী "নওবেলাল" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিদ্যালয় বার্ষিকী বিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের চিত্র এবং শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও সৃজনশীল চিন্তাধারা প্রকাশের উত্তম মাধ্যম বিধায় নিঃসন্দেহে এটি একটি মহৎ উদ্যোগ।

এ বার্ষিকী প্রকাশনায় যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানিয়ে নিয়মিত বার্ষিকী প্রকাশনার প্রত্যাশা রেখে বিদ্যালয়ের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

(মোঃ রেজাউল করিম)
উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

বাণী

যা আমাদের আনন্দ দেয় তাই সুন্দর। আর সাহিত্য হচ্ছে সুন্দরের প্রকাশ। সাহিত্যে জীবন আছে, জগৎ আছে, বস্তু আছে, সত্য আছে আর আছে সুন্দর। কিন্তু শুধুমাত্র জীবন এবং সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ কামনাতেই সাহিত্য জন্মলাভ করেনি। এসব জিনিস সাহিত্যের উপাদান মাত্র, লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের লক্ষ্য হচ্ছে আনন্দ দেওয়া, জীবন ও জগতের গভীরতম রসোপলব্ধির স্পন্দনটিকে তুলে ধরা। আর এই সুকঠিন কাজটি সহজ সরল করে তুলে ধরতে বিদ্যালয় বার্ষিকীর অবদান অপরিসীম। চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি, আদর্শ ও মূল্যবোধে প্রতিফলিত শিশুতোষ সৃজনশীল মননের এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস বিদ্যালয় বার্ষিকী।

শতাব্দীর পুরাতন বিদ্যাপীঠ ঐতিহ্যবাহী ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনকল্পে বিদ্যালয় বার্ষিকী 'নওবেলাল' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রকাশনার এ মহতী উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই আর সেই সঙ্গে বার্ষিকী প্রকাশনার কাজটি সুসম্পাদনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
উপ-পরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা।

প্রধান শিক্ষকের কথা

বিদ্যালয় বার্ষিকী শিক্ষার্থীর মনের চিন্তা চেতনার স্বচ্ছ দর্পণ। বিদ্যালয় বার্ষিকীর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা মুক্তভাবে সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করার প্রথম সুযোগ পায়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও পরিচর্যার জন্য বার্ষিকী প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ সত্যকে উপলব্ধি করেই শতাব্দী প্রাচীন ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলের বার্ষিকী 'নওবেলাল-২০০৩' আত্ম প্রকাশ করতে যাচ্ছে। 'নওবেলাল-২০০৩' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে বলে আমি পরম করুণাময় আল্লাহতাআলার কাছে শুকরিয়া জানাচ্ছি।

বিদ্যালয়ের নবীন ও ক্ষুদে লেখকদের লেখা দিয়ে সাজানো হয়েছে আমাদের 'নওবেলাল' সম্ভার। হয়ত এদের মাঝ থেকেই বেরিয়ে আসবে আগামী দিনের সাহিত্য প্রতিভা। এই নবীন লেখকরাই আগামীতে বাংলা সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করবে। 'নওবেলাল' এর কণ্ঠে ধ্বনিত হবে নতুন আহ্বান। ভ্রান্ত পথিক আবার পাবে সঠিক পথের সন্ধান।

নবীন ও কচি লেখকদের কাঁচা লেখার ভুলভ্রান্তি আশা করি পাঠকদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি পাবে।

বিদ্যালয় বার্ষিকীতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীসহ যে সকল বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা।

আমার স্নেহের ছাত্র ও সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ যাঁদের লেখা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে আবার প্রাণ পেয়েছে 'নওবেলাল' তাদের সকলকে এবং প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আমার কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

(নাজমুন নাহার শাহীন)
প্রধান শিক্ষক
ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল

সহকারী প্রধান শিক্ষকের কথা

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৪ সালে, যা নব পর্যায়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬ সালে। প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা নিকেতনটির বার্ষিকী "নওবেলাল" ২০০৩ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এতে স্থান পেয়েছে আমাদেরই কোমলমতি ছাত্রদের কচি হাতের লেখা। তাদের হাতের স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক যেমন ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা, বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য যা জীবনকে নিয়েই জীবনের ঐকতান।

সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ তথা জাতির দর্পন। আমাদের নবীন লিখিয়েরা তাদের আনাড়ি হাতে সেই ব্যক্তিত্বকেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে এমন এক সময় যখন আমরা সর্বগ্রাসী সর্বব্যাপি এক অবক্ষয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। সুশিক্ষা তথা সাহিত্য-সংস্কৃতি যখন নির্বাসনে যাই যাই করছে ঠিক এমনি সময়ে তাদের এ সাহসিকতাকে সাধুবাদ জানাই। এ ধরনের একটি বার্ষিকী তাদের সৃজনশীল কাজে অনুপ্রেরনা যোগাবে। এ ক্ষুদে কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীরাই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে বিশ্ব মঞ্চে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করবে- শুনাবে-জানাবে বাঁচার কথা, গাইবে জাতির গৌরব গাঁথা। মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি- আমাদের নবীন লিখিয়েদের এ মহতি প্রচেষ্টার জন্য এবং সেই সঙ্গে যাঁরা দেশ ও জাতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিরাজমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে মনন-মেধার নির্মল ও আনন্দময় চর্চায় আমাদের ছেলেদের ব্যস্ত রেখেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(সাজনে আরা মালেক)
সহকারী প্রধান শিক্ষক
ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল

সম্পাদকীয়

"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে"— মানব শিশুর মধ্যে তেমনি থাকে অসীম সম্ভাবনাময় সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ। শিশু-শিক্ষার্থীর সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ ঘটার শক্তিকে উজ্জীবিত, প্রাণবন্ত ও প্রমাণিত করবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থাগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম মাধ্যম হলো বিদ্যালয় বার্ষিকী। শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলের বার্ষিকী প্রকাশনার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। যদিও বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার চাপে গত কয়েক বছর নিয়মিত ভাবে বার্ষিকী প্রকাশ হয়নি। শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষকের সুপরামর্শ, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নির্দেশনায় এ বছর আবার 'নওবেলাল' প্রকাশিত হলো।

ক্ষুদে লেখকদের কচি হাতের কলমের আঁচড়ে তাদের অপরিণত চিন্তা ও চেতনা অগোছালো অভিব্যক্তিতে প্রাণস্পন্দন পেয়েছে বিদ্যালয় বার্ষিকীতে। আজকের এ কুঁড়ি সাহিত্যিকরা ধীরে ধীরে প্রতিভার শতদল বিচিত্র বর্ণে পাঁপড়ি মেলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে সাহিত্য অঙ্গনে। সবুজ মনের পাতায় চেতনার যে বিন্দু বিন্দু জল জমা হলো, হয়ত তা একদিন গড়িয়ে পড়বে সাহিত্যের পাতায়। এই সব কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে লুকায়িত আছে ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনা। "নওবেলাল"-সে অনন্য ধারারই 'হিরন্ময় ফসল'। এদের মাঝ থেকেই একদিন বেরিয়ে আসবে জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিত্ব, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী দার্শনিক, রাজনীতিবিদ আর ও অনেক। তাই কবির ভাষায় বলতে হয়—

"জন্মেই মানুষ হয় না মানুষ,
থাকে সে মুকুল
বিদ্যামঠই ফোঁটায় তাদের
মনুষ্যত্বের ফুল।"

রক্ত দিয়ে গড়া আমাদের এই দেশ। আজকের গৌরবময় মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বদেশ, স্বাধীনতা ও হাজার বছরের সংস্কৃতিকে মনে প্রাণে প্রদীপ্ত করে তুলতে যাদের আত্মত্যাগ-আমাদের বার্ষিকী "নওবেলালের" পক্ষ থেকে এই সব মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদের পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই।

বার্ষিকীর সীমিত পরিসরে সবগুলো লেখার সঙ্কুলান হয়নি। যাদের লেখা ছাপা হয়নি তাদের হতাশ হবার কিছু নেই। চর্চা অব্যাহত থাকলে আগামীতে নিশ্চয় ছাপা হবে।

বার্ষিকী কমিটির সভাপতি ও সহসভাপতিসহ সকল সদস্যই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। 'নওবেলাল'কে ছাপার আকারে প্রকাশের জন্য বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীবৃন্দও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। আমি অকুণ্ঠচিত্তে তাদের প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। ২০০৩ সালের বার্ষিকী যদি পাঠকদের আনন্দ দিতে পারে তবেই আমাদরে শ্রম সার্থক; কৃতিত্ব সংশ্লিষ্ট সবার। আর এর যা কিছু অপূর্নতা, ব্যর্থতা, বিচ্যুতি তার সকল দায়ভার আমার। আর তার জন্য সকলের কাছে আমি সবিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে ইসলামী ঐতিহ্য রক্ষা ও স্কুলটির দিনদিন আরো সমৃদ্ধি ঘটুক মহান আল্লাহ্‌র নিকট এই আমার একান্ত কামনা।

(মোঃ আবুল বাসার ভূঁইয়া)
সহকারী শিক্ষক

বার্ষিকী সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

বাম থেকে বসা ঃ জনাব শাহানা আক্তার, জনাব আসমা জাহান, জনাব সাজনে আরা মালেক, জনাব নাজমুন নাহার শাহীন, জনাব আবুল বাসার ভুঁইয়া, জনাব আঞ্জুম আরা বেগম, জনাব শাহনাজ আক্তার।

বাম থেকে দাঁড়ানো ঃ মোঃ মাহমুদ হাসান, মোঃ নেয়ামুল হাসান, এস, এম, ইমরান হোসেন, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোঃ রুবাইয়াৎ হোসেন, জনাব মোঃ রেজাউল হাসান, জনাব মোঃ মাহমুদ-উল-হাসান, জনাব ময়নুল ইসলাম, জনাব আবদুর রহিম, মোঃ নাফিউর রহমান, মোঃ ইমরান হোসেন চৌধুরী, মোঃ মমিন তালুকদার, মোঃ হাসিবুর রহমান, মোঃ আসিফ খান।

সভাপতি ঃ জনাব নাজমুন নাহার শাহীন

সহ-সভাপতি ঃ জনাব সাজনে আরা মালেক

সম্পাদক ঃ জনাব মোঃ আবুল বাসার ভুঁইয়া

যুগ্ম-সম্পাদক ঃ জনাব আঞ্জুম আরা বেগম
জনাব শাহনাজ আক্তার

সদস্য ঃ জনাব মোঃ রেজাউল হাসান, জনাব শাহানা আখতার, জনাব মাহমুদ-উল-হাসান, জনাব মোঃ ময়নুল ইসলাম, জনাব আবদুর রহিম, জনাব আসমা জাহান

ছাত্র সদস্য

এস, এম, ইমরান হোসেন—শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১

মোঃ মমিন তালুকদার—শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৪

মোঃ আসিফ খান— শ্রেণী ঃ ৮ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১০

মোঃ ইমরান হোসেন চৌধুরী—শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ২

মোঃ সিরাজুল ইসলাম—শ্রেণী ঃ ৬ষ্ঠ, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৩

মোঃ রুবাইয়াৎ হোসেন—শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ১

মোঃ নেয়ামুল হাসান—শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ১

মোঃ হাসিবুর রহমান— শ্রেণী ঃ ৮ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ২

মোঃ নাফিউর রহমান— শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ২

মোঃ মাহমুদ হাসান—শ্রেণী ঃ ৬ষ্ঠ, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ৫৮

কর্মরত প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক

প্রধান শিক্ষক

জনাব নাজমুন নাহার শাহীন

এম.এস.সি, এম.এড, বি.সি.এস-শিক্ষা

সহকারী প্রধান শিক্ষক

জনাব সাজনে আরা মালেক

এম.এ, বি.এড

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলের শিক্ষকমন্ডলীর পরিচিতি

জনাব আঃ মজিদ তালুকদার
সহকারী শিক্ষক
বি.এস.সি, বি.এড

এ. এম. এম. আঃ হক
সহকারী শিক্ষক
বি.এ, বি.এড

জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল
সহকারী শিক্ষক
বি.এ, এম.এড

জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ খাঁন
সহকারী শিক্ষক
বি.এস.সি, বি.এড

জনাব মোঃ রেজাউল হাসান খাঁন
সহকারী শিক্ষক
বি.এফ.এ

জনাব মোঃ শহিদ উল্লাহ
সহকারী শিক্ষক
এম.কম, বি.পি.এড

জনাব এ, কে, মোঃ ময়নুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
এম.এফ.এ, বি.এড

জনাব মোঃ আবুল বাসার ভুঁইয়া
সহকারী শিক্ষক
বি.এস.এস (সম্মান), এম.এস.এস, এম.এড

জনাব হাফেজ মোঃ ওবায়দুল্লাহ
সহকারী শিক্ষক
কামিল-হাদিস ও ফিক্‌হ্

জনাব নাসিমা নাসরীন
সহকারী শিক্ষক
এম.এস.সি (উদ্ভিদ বিদ্যা), এম.এড

জনাব মোঃ হামিদুল হক
সহকারী শিক্ষক
বি.বি.এস(অনার্স), এম.বি.এস(হি.বি.), এম.এড

জনাব আনজুম আরা বেগম
সহকারী শিক্ষক
বি.এ(সম্মান) বাংলা, এম.এ, বি.এড

জনাব শাহানা আখতার
সহকারী শিক্ষক
বি.এ, বি.এড

জনাব আব্দুর রহিম
সহকারী শিক্ষক
বি.এস.সি (অনার্স), এম.এস.সি, এম.এড (অধ্যয়নরত)

জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
সহকারী শিক্ষক
বি.কম(অনার্স), এম.বি.এস(হি.বি.), বি.এড

জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন বেপারী
সহকারী শিক্ষক
এম.এস. সি, বি.এড

জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর
সহকারী শিক্ষক
বি.এস.এস(সম্মান), এম.এস, এম.এড

জনাব মাহমুদ-উল-হাসান
সহকারী শিক্ষক
এম.এস.এস, বি.এড

জনাব মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
বি.এ(অনার্স), এম.এ, বি.এড(অধ্যয়নরত)

জনাব হোসনে আরা
সহকারী শিক্ষক
এম.এস.এস (সমাজ বিজ্ঞান)

জনাব আসমা জাহান
সহকারী শিক্ষক
বি.এ. সম্মান(বাংলা), এম.এ

জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন
সহকারী শিক্ষক
এম.এস.সি, এম.এড

জনাব রেহেনা ফেরদৌস
সহকারী শিক্ষক
বি.এস.সি(সম্মান), এম.এস.সি(গণিত)

জনাব শাহনাজ আক্তার
সহকারী শিক্ষক
এম.এস.এস(সমাজ কল্যাণ)

অফিস স্টাফ

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম
উচ্চমান সহকারী

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ ওয়াজ উদ্দিন

মোঃ আবুল হাসেম

মোঃ আবু বকর

মোঃ ফজল হক

সৈয়দ মোঃ বিল্লাল হোসেন

প্রাত্যহিক সমাবেশ

বিদ্যালয় কর্মকান্ড ২০০০-২০০১ইং

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০০০ইং এর উদ্বোধন

বার্ষিক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা-২০০০ইং এর প্রদর্শনীর উদ্বোধন

বার্ষিক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা-২০০০ইং এর প্রদর্শণী

পরিচ্ছন্নতা অভিযান - ২০০১ইং এ স্কাউট দল

২৪ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ-২০০১ইং

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০১ ইং
পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান

বিদ্যালয় কর্মকান্ড ২০০১-২০০২ইং

যেমন খুশি তেমন সাজ - ২০০১ইং

দ্রুত পোষাক পরিবর্তন প্রতিযোগিতা শেষে স্কাউট দল-২০০১ইং

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০০১ইং এ
অংশগ্রহনরত অভিভাবক বৃন্দ

বার্ষিক পরীক্ষা-২০০২ইং এর ফলাফল ঘোষনা
করছেন প্রধান শিক্ষক

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা -২০০২ইং
এর পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান

বার্ষিক মিলাদ ও পুরস্কার বিতরন -২০০২ইং

বিদ্যালয় কর্মকান্ড ২০০৩ইং

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর মোজাম্মেল হক

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০৩ইং উদ্বোধন করছেন পরিচালক (মাধ্যমিক)

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০৩ইং এর মশাল নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ

স্কাউট দল ২০০৩-ইং

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০০৩ইং এর ২০০ মিটার দৌড়

অংক দৌড়-২০০৩ইং

বিদ্যালয় কর্মকান্ড ২০০৩ইং

সুত্রাপুর থানা আন্তঃস্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০০৩ইং এর রানার্স আপ দল

সুত্রাপুর থানা আন্তঃস্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০০৩ইং এর চ্যাম্পিয়ান দল

আন্তঃশ্রেণী খো খো ফাইনাল খেলার একটি দৃশ্য ২০০৩ইং

আন্তঃশ্রেণী খো খো প্রতিযোগিতা-২০০৩ইং এর চ্যাম্পিয়ান দল

আন্তঃশ্রেণী খো খো প্রতিযোগিতা-২০০৩ইং এর রার্নাস আপ দল

আন্তঃশ্রেণী খো খো প্রতিযোগিতা-২০০৩ইং ট্রফি গ্রহন করছে চ্যাম্পিয়ান দল

বিদ্যালয় কর্মকান্ড ২০০৩ইং

বার্ষিক মিলাদ ও পুরস্কার বিতরন - ২০০৩ইং

বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী

নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ না করার জন্য পুরস্কার নিচ্ছেন
সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ খান

নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ না করার জন্য পুরস্কার নিচ্ছেন
৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী আবুল হাসেম

বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক জনাব
মোঃ ইদ্রিছ খান এর বিদায় অনুষ্ঠান

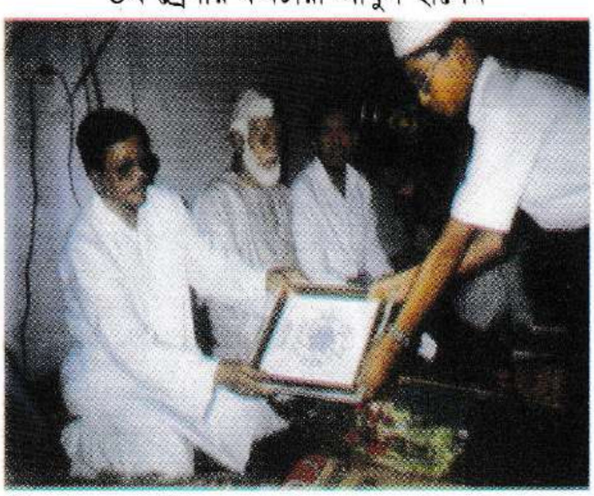

বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব মোঃ খলিল উল্ল্যাহ
এর বিদায় অনুষ্ঠান

বিদ্যালয় কর্মকান্ড ২০০৩ইং

শিক্ষা সফর -২০০৩ ইং

শিক্ষা সফর -২০০৩ ইং

আন্তঃশ্রেণী বিতর্ক প্রতিযোগিতার
উদ্বোধন -২০০৩ইং

চিত্রাংকন প্রদর্শণী-২০০৩ইং

শ্রেষ্ঠ বক্তার পুরস্কার গ্রহন -২০০৩ইং

পরিচ্ছন্নতা অভিযান -২০০৩ইং

বিদ্যালয়ের গবেষণাগার ও লাইব্রেরীতে কর্মরত ছাত্র-শিক্ষক বৃন্দ

রসায়ন ব্যবহারিক ক্লাশ

পদার্থ বিজ্ঞান ব্যবহারিক ক্লাশ

জীব বিজ্ঞান ব্যবহারিক ক্লাশ

কম্পিউটার শিক্ষা ব্যবহারিক ক্লাশ

উচ্চতর গণিত ব্যবহারিক ক্লাশ

লাইব্রেরীতে কর্মরত বার্ষিকী
সম্পাদনা পরিষদ -২০০৩ইং

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	ছড়া ও কবিতা		৩৭–৫০
১.	স্বপ্ন	মোঃ রকিবুল ইসলাম	৩৭
২.	রোযার ঈদ	শওকত জামিল	৩৭
৩.	কবি	আলী আকবর	৩৭
৪.	পরীক্ষা	মঞ্জুর মোর্শেদ চৌধুরী	৩৭
৫.	সোনার মাটি	সিরাজুল ইসলাম	৩৮
৬.	প্রিয় জন্মভূমি	মোঃ সোহেল হোসেন	৩৮
৭.	ইতিকথা	মোঃ মমিন তালুকদার	৩৮
৮.	বাবুই পাখি	মোঃ তানজিরুল ইসলাম	৩৯
৯.	হারিয়ে যাওয়া নদী	মাহ্বুবুল হক	৩৯
১০.	কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স	মোঃ রজ্জব হোসেন	৩৯
১১.	পরীক্ষার বিড়ম্বনা	আল-মামুন	৪০
১২.	মনে রেখ তুমি	রায়হান কবির	৪০
১৩.	স্বাস্থ্য	নাজমুল হুদা নাহিদ	৪০
১৪.	মা	অলিভ হাসান	৪০
১৫.	অতি প্রিয়	মোঃ নুরুল আমিন	৪১
১৬.	বিজয় দিবস	মোঃ ইমরান হোসেন চৌধুরী	৪১
১৭.	হাসতে শেখো	আসিফ হাসান মল্লিক	৪১
১৮.	পরীক্ষার হল	রাজিব দেওয়ান	৪১
১৯.	ক্রিকেট	রিয়াজুল ইসলাম	৪২
২০.	লোড শেডিং	ইতরাদ আহম্মেদ	৪২
২১.	রৌদ্র বৃষ্টির খেলা	সাইফুল ইসলাম	৪২
২২.	শীত ও বুড়ি	মোঃ রেজাউর রহমান	৪২
২৩.	মানে	মোঃ সাইফুল ইসলাম	৪২
২৪.	পথের ছেলেরা	মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন	৪৩
২৫.	আমাদের দেশ	রায়হানুল কবির	৪৩
২৬.	রাজধানী ঢাকা	মোঃ সাজেদুল ইসলাম	৪৩

২৭.	হোতেম যদি	তানভীর আহম্মেদ	৪৩
২৮.	খেলতে মানা	রফিকুল ইসলাম	৪৪
২৯.	আমার গ্রামের দৃশ্য	মোঃ জহিরুল ইসলাম সরকার	৪৪
৩০.	শিক্ষার আলো	রাজু আহম্মেদ	৪৪
৩১.	ঠিকানা	মোঃ মোতাসিম বিল্লাহ	৪৪
৩২.	মা	মোঃ মাহ্মুদুল হাসান	৪৫
৩৩.	প্রিয় বাংলাদেশ	মোঃ শাওয়ানুল হক	৪৫
৩৪.	নদীর ওপারে	মোঃ জাহিদুল ইসলাম	৪৫
৩৫.	সময়	মোঃ আল-আমিন	৪৫
৩৬.	ফ্রেন্ড শীপ	রিয়াদ-বিন-শহীদ	৪৬
৩৭.	ছোট বোন	ইমতিয়াজ আহম্মেদ মল্লিক	৪৬
৩৮.	বাঘ ছাগলের কাণ্ড	মোঃ মোক্তাদির আহম্মেদ	৪৬
৩৯.	বিদ্যালয়ের মাঠ	এস. এম. ইমরান হোসেন	৪৭
৪০.	মশার পরিচয়	মোঃ তানভীর হোসেন	৪৭
৪১.	মা	সোয়াদ মোহাম্মদ সেতু	৪৭
৪২.	আমার বাবা	আমিন খান	৪৮
৪৩.	মা	খাজা আদনানুল হক	৪৮
৪৪.	আমার স্কুল	মোঃ হাসান	৪৮
৪৫.	স্বাধীনতা যেন	মোঃ আরিফ হোসেন	৪৯
৪৬.	সুখ-দুখ দু'ভাই	মোঃ রাইসুল ইসলাম	৪৯
৪৭.	স্বপ্ন	মোঃ শাহজাহান কবির	৪৯
৪৮.	My Country	Md. Maruaf Billah	৫০
৪৯.	Tree	Md. Rafiqul Islam	৫০
৫০.	Very Easy But Very Hard	Md. Arifur Rahman	৫০
৫১.	Bell Ring	Md. Mahbub Alam	৫০

প্রবন্ধ ৫৩–১২২

১.	রহস্যে ঘেরা বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল	মোঃ রুবাইয়াত হোসেন	৫৩
২.	ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি	এস. এম. ইমরান হোসেন	৫৫
৩.	পিরামিড! এক অনন্য রহস্য	মোঃ মারুফ বিল্লাহ	৫৬
৪.	বিশ্ব কাঁপানো টুইন টাওয়ার	মোঃ রাসেল	৫৮
৫.	ভয়ঙ্কর সরীসৃপ	মোঃ তারেক রহমান	৫৯
৬.	নীল মানুষ	শেখ মোঃ জাহেদুজ্জামান	৬১
৭.	ক্যালেন্ডারের নানা কথা	মোঃ রফিকুল ইসলাম	৬২
৮.	অবিশ্বাস্য উইপোকার রহস্য	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	৬৪

৯.	প্রাচীন বাংলার ভাষা ও সাহিত্য	মোঃ ইমরান খান	৬৬
১০.	দি লেক অব নো রিটার্ন	মোঃ ইয়ামান হানিফ	৬৮
১১.	নামায সম্পর্কীয় হাদিস	মোঃ ফিরোজ	৬৯
১২.	আটলান্টিস	মোঃ আসিফ খান	৭০
১৩.	ডিসএন্টেনা সংস্কৃতির সহায়ক নয়	মোঃ আরিফুর রহমান	৭১
১৪.	শিক্ষা ক্ষেত্রে কোচিং প্রক্রিয়া	মোঃ ইমরান হোসেন চৌধুরী	৭২
১৫.	স্কাউট ঃ হাইকিং	মোঃ জহিরুল ইসলাম	৭৩
১৬.	আদর্শ সমাজ গঠনে মহানবীর অবদান	হাফেজ মোঃ ওবায়দুল্লাহ্	৭৪
১৭.	শিক্ষা ও উন্নয়ন	মোঃ হামিদুল হক	৭৭
১৮.	একজন ভাস্করের কথা	মোঃ ময়নুল ইসলাম	৮০
১৯.	শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকের ভূমিকা	মোঃ শহিদ উল্লাহ	৮৩
২০.	পরিবেশ বিপর্যয় ও বাংলাদেশ	মোঃ জামাল উদ্দিন বেপারী	৮৫
২১.	নারী ও বর্তমান প্রেক্ষাপট	আনজুম আরা বেগম	৮৮
২২.	মন ও মনের অস্বাভাবিকতা	শাহনাজ আক্তার	৯০
২৩.	ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক	মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম	৯৮
২৪.	বিশ্ব জুড়ে নারীদের কীর্তি গাঁথা	আসমা জাহান	১০২
২৫.	শিক্ষা, শিক্ষার্থীর বর্তমান পরিবেশ	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	১০৬
২৬.	বাংলা ভাষার লিপির ইতিহাস	আনজুম আরা বেগম	১০৮
২৭.	বাংলাদেশ স্কাউটস	মোঃ জামাল উদ্দিন বেপারী	১০৯
২৮.	বিদ্যালয়ের ইতিবৃত্ত	মোঃ আবুল বাসার ভুঁইয়া	১১১
২৯.	Educational Problem in Bngladesh	Md. Rubaiat Hossain	১১৩
৩০.	Dhaka Govt. Muslim H/S.....	Nazmun Nahar Shaheen	১১৫
৩১.	Learning Materials & Education..	M. A. Awal	১১৭
৩২.	English Language Learning.......	Md. Abul Bashar Bhuiyan	১১৯
৩৩.	Influence of Satellite Culture......	Shahnaz Akhter	১২২

গল্প ১২৯–১৫০

১.	অস্পষ্ট বেদনা	এস. এম. ইমরান হোসেন	১২৯
২.	ভয়ঙ্কর এক রাতের কাহিনী	শেখ মোঃ জাহেদুজ্জামান	১৩০
৩.	মুরগি ব্যবসায়ী	মোঃ ইমরান আহম্মেদ	১৩২
৪.	বন্ধু	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	১৩৩
৫.	নতুন প্রজন্মের জন্য	মোঃ মাহবুব আলম	১৩৪
৬.	টুনুর কান্ড	মোঃ আরিফুর রহমান	১৩৬
৭.	অদ্ভুত ইচ্ছা	মোঃ সিফাত ইসলাম	১৩৭
৮.	মিথ্যার পরিনাম	মোঃ শহীদুজ্জামান	১৩৯

৯.	ঘুরে এলাম চট্টগ্রাম	শেখ আশরাফ উদ্দিন	১৪০
১০.	দু'টি কুড়ি ও একটি পাতার দেশ	রিয়াদ-বিন শহীদ	১৪১
১১.	অভি	মোঃ অলিভ হাসান	১৪২
১২.	কক্সবাজার ভ্রমণ	মোঃ আশরাফুল হক	১৪৩
১৩.	হামযা ও রুস্তম	মোঃ জাহিদুল ইসলাম	১৪৪
১৪.	কোট বাড়ির স্মৃতি	মোঃ ইমরান হোসেন চৌধুরী	১৪৫
১৫.	আমার মা	মোোঃ রাকিব সরকার	১৪৬
১৬.	আমার দেখা সুন্দরবন	মোঃ আব্দুল ইলা	১৪৬
১৭.	দুখী ছেলে	মোঃ জহিরুল ইসলাম	১৪৭
১৮.	জাহাজ ভ্রমণ	শেখ মোঃ জামশেদুজ্জামান	১৪৮
১৯.	ভ্রমনে বুড়িগঙ্গা	মোঃ তৌফিক ইসলাম খান	১৪৯
২০.	চড়ুই পাখি ও কাকের থাবা	মোঃ সৈয়দ মাহমুদ	১৪৯
২১.	শিক্ষা সফরে জাফলং	সাজনে আরা মালেক	১৫০

কৌতুক ও ধাঁধাঁ ১৫৫–১৫৬

১.	কৌতুক		১৫৫
২.	ধাঁধাঁ		১৫৬

বিজ্ঞান ও বিচিত্র তথ্য ১৬১–১৬৮

১.	জিরো থেকে হিরো	মোঃ আল-আমীন	১৬১
২.	সাধারণ জ্ঞান	মোঃ নাঈম হাসান	১৬১
৩.	অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি	মোঃ ওসমান গণি	১৬১
৪.	মধুর গুণ সমাচার	মোঃ ইফতেখারুল ইসলাম	১৬২
৫.	বিজ্ঞানের মজার তথ্য	মোঃ মওদুদ ওয়ারেছ কামাল	১৬২
৬.	মানব ক্লোন	মোঃ নেয়ামুল হাসান	১৬৩
৭.	বিখ্যাতদের জীবনী থেকে	মোঃ ইমরান হোসেন চৌধুরী	১৬৪
৮.	কম্পিউটার ভাইরাস	মোঃ এহসানুল হক	১৬৫
৯.	সায়েন্স ফিকশন	খ. ম. সাদ্দাম হক	১৬৬
১০.	বাইনারি সংখ্যা	মোঃ তানজিরুল ইসলাম	১৬৭
১১.	Public Holidays	Md. Ashraful Islam	১৬৮
	বিদ্যালয় পরিক্রমা	শাহানা আখতার	১৭০

চিত্রাঙ্কন ১৭৫

১.	ছাত্রদের আঁকা ছবি		

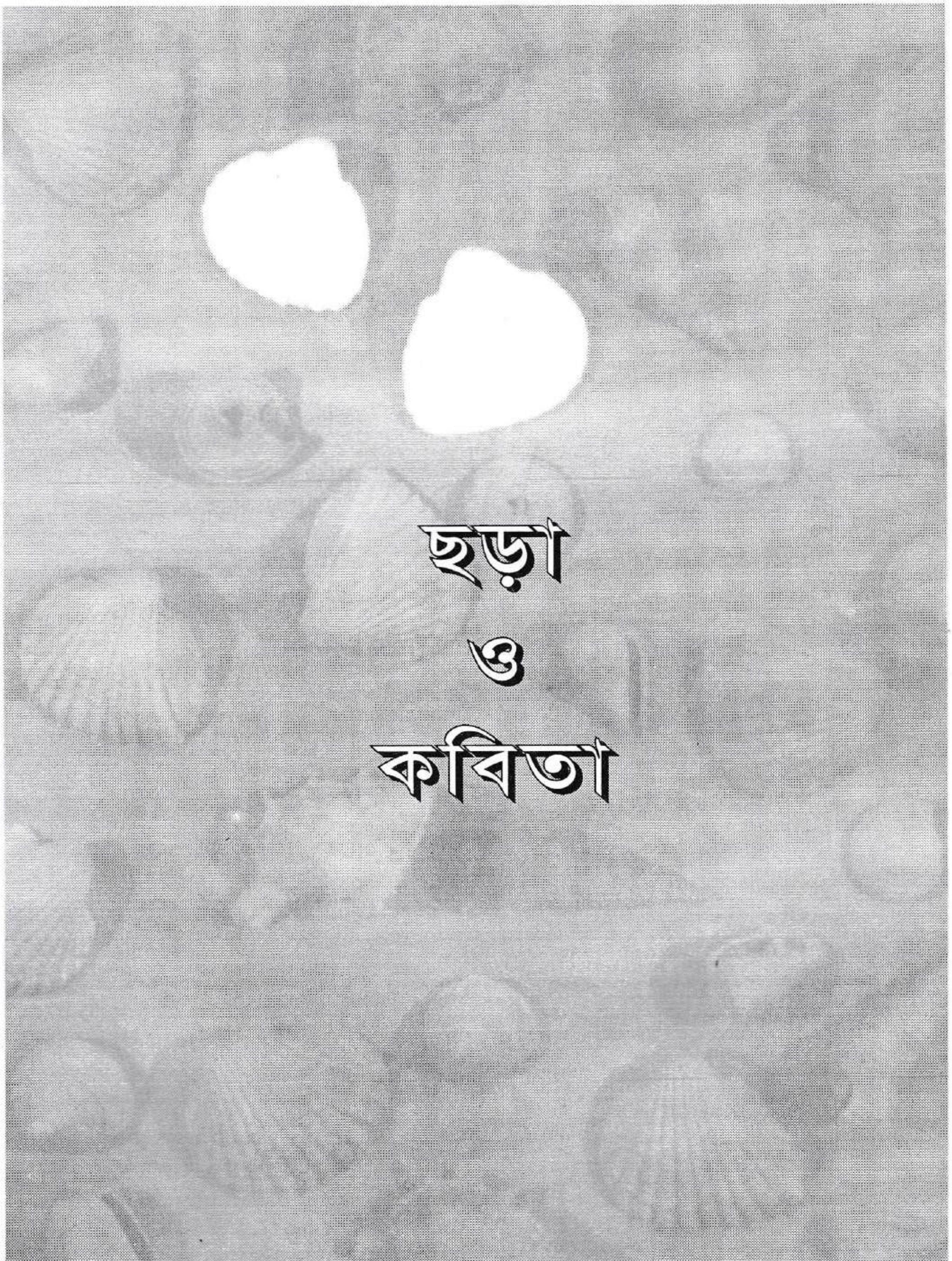
ছড়া
ও
কবিতা

কবিতা শুনিয়া কেহ যখন বলে ‘বুঝিলাম না’ তখন ভীষণ মুশকিলে পড়িতে হয়। কেহ যদি ফুলের গন্ধ শুঁকিয়া বলে ‘কিছু বুঝিলাম না’ তাহাকে এ কথা বলিতে হয় ‘ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ।’

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বপ্ন

মোঃ রকিবুল ইসলাম

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ খ, রোল ঃ ১১

ভালবাসো যদি সবচেয়ে বেশি,
দাও যে তাহার সাড়া,
বলবে সে-তো স্বদেশ আমার,
মায়া মমতা যার ঘেরা।
মায়ের কোলের ছোট্ট শিশুরা,
যখনই হবে বড়,
নিজ স্বপ্নের সমাজ সংসার,
আপন হাতে গড়ো।
সকল শিশুর সকল পিতা
তাইতো আছে জেগে,
আকাশে পাতালে জলে স্থলে,
কখন থাকবে সবার আগে?
হিংসা বিদ্বেষ অসম ভুলে।
গড়ে তুলো সেতু বন্ধন।
নয়া জমানার নয়া কিছুতে,
কিছু থাকে যদি করণীয়।
জগতে তোমাদের নাম খ্যাতি যশ,
হবে স্মরণীয় ও বরণীয়।

রোযার ঈদ

শওকত জামিল

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ ক, রোল ঃ ২৭

বছরে হয় দুইবার ঈদ
রোযার ঈদ হয় যখন পরে শীত
রোযার ঈদের সকালে
ঠাণ্ডা পানিতে করে গোসল
মনে হয় ঈদের মজার অংশ আসল।
নামায শেষে বাড়ি এসে খাও সেমাই,
আত্মীয়-স্বজন মুসলমান সবাই ভাই ভাই
কোলাকুলি করে একে অন্যের সাথে,
নতুন জামা-কাপড় পড়ে
সালামি চায় বড়দের কাছে।
রাতে খায় সব ভাল খাবার
ঘুমানোর আগে প্রার্থনা করে,
রোযার ঈদ যেন আসে বার বার।

কবি

আলী আকবর

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ খ, রোল ঃ ১২

কবি আমি চাই যে হতে
সখের কবি আমি
কবি আমার মন-প্রাণ
কবি আমার আশা।
কবি আমার জীবনের গান
হৃদয়ের ব্যাকুলতা
সবার মাঝে কবি হয়ে
বেঁচে থাকার আকুলতা।

পরীক্ষা

মঞ্জুর মোর্শেদ চৌধুরী

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ১৯

পরীক্ষাটা সামনে এলেই
মাথায় পড়ে বাজ।
যেটা ধরি সেটাই দেখি,
অনেক বাকি কাজ।
সকাল বিকাল ভাবি এখন,
কেমনে করি পাশ।
সারা বছর দিয়েছি ফাঁকি,
তাই তো সর্বনাশ।
বলছি এখন শপথ করে,
পড়াশুনা করব আমি।
ভাল করে পরীক্ষা দেব,
করব যে পাশ আমি।

সোনার মাটি

সিরাজুল ইসলাম

শ্রেণী ঃ ৬ষ্ঠ, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৩

সোনার চেয়ে ও খাঁটি
আমার মাতৃভূমির মাটি।
এই মাটিরই আদর স্নেহে
আমরা বড় হই।
তাইতো মোরা দিয়েও প্রাণ
এই মাটিকে বাঁচাই।
এই দেশকে ভালবেসে
আমরা হলাম ধন্য
প্রয়োজনে জীবন দেব
এই মাটিরই জন্য।

প্রিয় জন্মভূমি

মোঃ সোহেল হোসেন

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল ঃ ১৮

তুমি আমার ভালবাসা,
তুমি আমার প্রাণ
তুমি আমার হাসিকান্না,
তুমি আমার জান।
তুমি আমার হৃদয় জুড়ে,
একটু উদাস হাওয়া
ইচ্ছেমত আনন্দ আর,
অনেকখানি পাওয়া।
তুমি আমার ভোরের পাখি,
নিশি জাগা চাঁদ;
তাইতো জাগে ক্ষণে ক্ষণে,
তোমাকে পাওয়ার সাধ।
তুমি আমার দুঃখের দিনে,
একটুখানি সুখ;
তুমি আমার আঁধার মনের,
একটু আলোর মুখ।
তুমি আমার জীবন মরণ,
প্রাণের মাতৃভূমি;
তাই তোমাকে ভালবাসি,
প্রিয় জন্মভূমি।

ইতিকথা

মোঃ মমিন তালুকদার

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ০৪

ঐতিহ্যের উজ্জ্বলতা,মুসলিম স্কুলের ইতিকথা
বয়ে চলে মহাকাল, মনে পড়ে স্কলার।
দিগ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল, প্রতিষ্ঠা বার্তা তার;
মুসলিম যারা পড়বে শুধুই তারা
নেইকো কোন সংশয়।

সর্বহারা, অসহায় দরিদ্র, এতিম যারা,
সকলেই পাবে জ্ঞানের ডালা,
শুরু হোক জ্ঞান শিক্ষার পালা।

অন্য জাতির লাথি, গুতো, নল-ছোতো-
কেন বহিবে মাথায় করে টুকরির মত?
কেন-ই বা শুনিবে তিক্ত বাণী?
মুছে ফেল সেই অপমানের গ্লানি।

আল্লাহ্ আছেন সহায় যেথায়,
ভয় নেই তোমার চলতে সেথায়।
ঘরে বসে থেকে লাভ নাইরে ভাই!
মুসলিম স্কুল যে তোমারই পথ পানে চায়।

যে মহান উদার, আনিল এ জ্ঞানের জোয়ার
আল্লাহ্ যেন দেন তাহাকে
বেহেস্তের ঐ উচ্চ দোয়ার!

বাবুই পাখি

মোঃ তানজিরুল ইসলাম
শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ৭

তাল গাছের ঐ মগ ডালেতে
বাবুই পাখির বাসা,
শিল্পী মনের বিকাশ দেখো
ঘর হয়েছে খাসা।
খড়, বিচুলি, গাছের পাতা
মুখে করেই আনে যে তা;
কোথায় কোনটা লাগবে কটা
ভালো করেই জানে সে তা।
অবাক হয়ে রই যে চেয়ে
বুদ্ধিখানা দেখতে পেয়ে।
কেমন করে বানায় সে ঘর
কোথা থেকে শেখে;
তাইতো তোমায় আমরা সবাই
শিল্পী বলে জানি।
অনেক বড় আর্কিটেক্ট তুমি
আমরা সবাই তা মানি।

হারিয়ে যাওয়া নদী

মাহবুবুল হক
এস, এস, সি পরীক্ষার্থী-২০০৩, বিভাগ ঃ বিজ্ঞান

সোনা ঝরা দিন কি পাবো ফিরে?
যাবো কি আর সেই ব্রহ্ম নদীর তীরে?
ফেলে আসা স্মৃতির কারণে
মনেতে সংশয়
আজো না জানলাম নদীর
ভালবাসার পরিচয়।
মোর ক্লান্ত দুপুরে যখন
ঘুম আসে চোখে
তখন সে নীরবতার অবসান হয়
নদীর জল মেখে।
সারাক্ষণ ভাবি বসে, কখন—
নদীর পাবো দেখা?
আজো সেই নদীতে মোর
হল না সাঁতার শেখা।
নদীর কলকল গানেতে
এক অজানা সুখ মিশে থাকে
সে সুখ যেন ছড়িয়ে পরে
হৃদয়ের প্রতিটি বাঁকে।
হৃদয় চায় সারা বেলা
রইতে সেই সুখের মাঝে
আজো সেই সুখ সূর্য হয়ে
উঠল না মোর মাঝে।
এখন সে নদী গিয়েছে শুকায়ে।
সে নদীর পরিচয় গিয়েছে হারায়ে
চরে গিয়ে বলি আমি বারেবারে
এ নদী তুমি এসো ফিরে মোর ক্লান্ত দুপুরে।
আসো তুমি আবার কলকল সুখের সুরে।
তবুও সেই নদী ফিরে নাহি আসে
তার এক ফোটা জল অশ্রু হয়ে
চোখেতে মোর ভাসে।

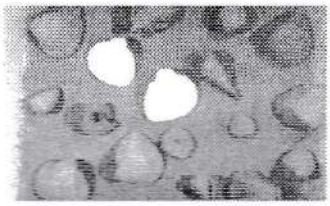

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

মোঃ রজ্জব হোসেন
শ্রেণী ঃ ৯ম , শাখা ঃ খ, বিভাগ ঃ বিজ্ঞান, রোল নং ঃ ১৩

হে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স! তুমি আসবে,
আমি জানতাম ;
তোমার সাত বছর পূর্তি উপলক্ষে রইল শত শুভেচ্ছা
নিশ্চয়ই তুমি নিয়ে আসবে নতুন সম্ভাবনা
নিয়ে আসবে বাংলার শিক্ষক ছাত্রদের মাঝে আনন্দ
তুমি নিয়ে আসবে বিশ্বের বানী,বাংলার বানী।
হে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স!
তুমি শিক্ষকদের লেখার পাতা
ছাত্রদের বইয়ের মেলা
আর অতুলনীয় জ্ঞানের বিদ্যাপীঠ।
হে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স!
তোমার আগমণে আমরা পথ চেয়ে থাকি
প্রতি মাসে আসবে তুমি নব নব রুপে।
নতুন প্রজন্মের মাঝে সকল জ্ঞানের ভান্ডার নিয়ে।

পরীক্ষার বিড়ম্বনা

আল–মামুন
শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা-খ, রোল-২২

যখন আমি পড়তে বসি,
লিখতে মনে কয়।
লিখতে বসলে লেখাটা যে,
ভীষন খারাপ হয়।
রাগ করে তাই বসে থাকি,
সব যে থাকে বাকী।
সকালেতে লিখব বলে,
রাত্রিতে দিই ফাঁকি।
এমনি করে দিন যে আমার,
হেলায় খেলায় যায়।
পরীক্ষাটা সামনে এলে,
চিন্তায় পড়ি হায়।
দুরু দুরু মন নিয়ে তাই
পরীক্ষা দিতে যাই।

মনে রেখ তুমি

রায়হান কবির
শ্রেণী ঃ ৮ম , শাখাঃ খ, রোল নং ঃ ১৭

মনে রেখ তুমি,
বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন।
মনে রেখ তুমি,
মাওলানা ভাষানীর শ্লোগান।
মনে রেখ তুমি,
বঙ্গবন্ধুর মহা ভাষন।
মনে রেখ তুমি,
রবী ঠাকুরের জাতীয় গান।
মনে রেখ তুমি,
কাজী নজরুলের রণগান।
মনে রেখ তুমি,
স্বাধীনতার ইতিহাস।
মনে রেখ তুমি,
এই কবিতা খানি।

স্বাস্থ্য

নাজমুল হুদা নাহিদ
শ্রেণী ঃ ৬ষ্ঠ, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ৩৮

গায়ে যদি বল চাও
দুধ, ভাত, ঘি খাও।
মোটা যদি হতে চাও
ডাল,ডিম, মাংস খাও।
শাক সব্জি তরকারী
নানা রোগে দরকারী।
ফলে আছে ভিটামিন
খেতে হয় প্রতিদিন।

মা

অলিভ্র হাসান
শ্রেণী ঃ ৮ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ

হাজার কাজ করো মাগো আমার সুখের জন্য
তোমার জন্য এতটুকু কাজ করব না কি জন্য
কোথায় হিমালয়, কোথায় সাগর,
দিব আমি পাড়ি।
তোমার সাথে থাকবে নাকো কারো আড়ি
আদর কর, সোহাগ কর, ভালবাস কত!
তুমি আছ আমার মনে আল্লাহ্‌রই মত।
তুমি আমার ভালবাসা, তুমি আমার প্রাণ,
সবার উপর রাখব মাগো তোমারই স্থান।

অতি প্রিয়

মোঃ নুরুল আমিন

রোল ঃ ৩৯, বিভাগ ঃ বাণিজ্য শাখা ঃ ক

প্রধান শিক্ষিকা .....
আপনাকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করি।
এই বিদ্যাপীঠে শিক্ষা
নিয়েছি আমরা দীক্ষা।
আপনার পরশে দূর হয়ে যায় আমাদের
হৃদয়ের সকল আঁধার।
সৌম্য-শান্ত চেহারা আপনার
দেখলে মাথা নত হয় আমাদের।
আপনার স্নেহ ভালবাসা
মনে জাগায় আমাদের নতুন আশা।
জ্ঞানের আলোয় আপনার ছবি
রাখি হৃদয় ভরি।
শাসন-সোহাগ শিক্ষা দিয়ে
ছোট হৃদয় দেন ভরিয়ে।
মানুষ গড়ার কারিগর আপনি
গড়ে তোলেন সবার অন্তর।
ছোট জীবন গড়তে আপনার
নেইকো কোন জুড়ি।
আপনি মোদের প্রিয় অতি
প্রধান শিক্ষিকা আপনি
নাজমুন নাহার শাহীন।

বিজয় দিবস

মোঃ ইমরান হোসেন চৌধুরী

শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ ক, রোল ঃ ০২

১৬-ই ডিসেম্বর হয়ে আস তুমি
বিজয় দিবসের দিন।
জাতিকে স্মরণ করিয়ে দাও
ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের ঋণ।
তোমরা এনে দিয়েছো মোদের
হাতে বিজয়ের পতাকা।
তাইতো আছে মোদের হৃদয়ে
তোমাদের ছবি আঁকা।
নয় মাস যুদ্ধ করেছিল
মোদের মুক্তিসেনারা,
তাইতো জাতি সারাজীবন
তাদের কাছে দেনা।

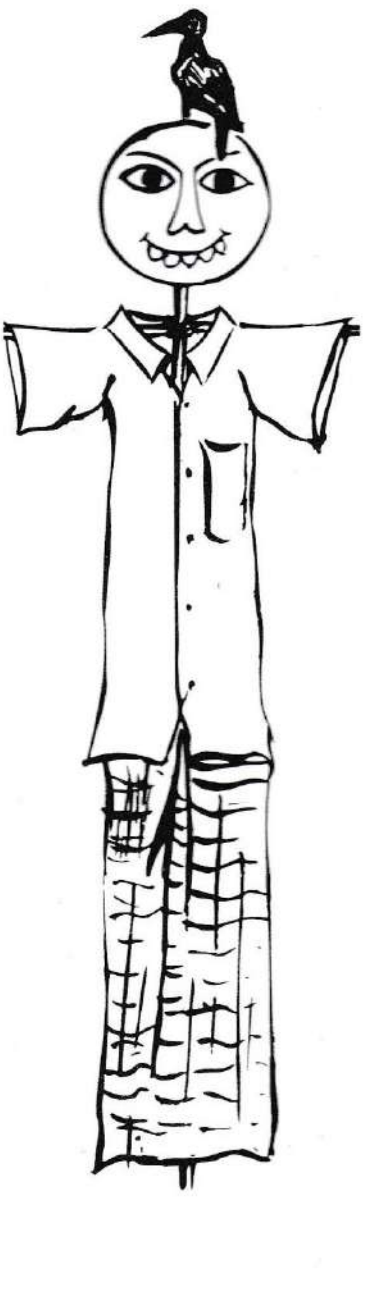

হাসতে শেখো

আসিফ হাসান মল্লিক

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল ঃ ২০

ব্যর্থতার গ্লানি মুছে,
কষ্টটাকে ফেলে পিছে;
সুখের জীবন বাজি রাখো,
পরান খুলে হাসতে শেখো।
পাপ প্রতারণা ভুয়ার মাঝে,
সত্য ও সুন্দরের খোঁজে;
জীবনটাকে বাঁচাতে শেখো,
ইচ্ছে মতো হাসতে শেখো।
প্রকৃতি প্রেম সৌন্দর্য্য,
জীবনবোধ, সৃষ্টি রহস্য;
আঁকড়ে ধরে বাঁচতে শেখো,
তৃপ্তির হাসি হাসতে শেখো।
মানুষ জীব বৃহৎ নগন্য,
পাহাড়-নদী, সাগর, অরণ্য,
সবাইকে ভালবাসতে শেখো।
প্রীতির হাসি সাহতে শেখো,
বিফলতাকে পেছনে ফেলে,
সফলতার দুয়ার খোলে;
দৃঢ় পথে চলতে শেখো,
তোমরা সবাই হাসতে শেখো।

পরীক্ষার হল

মোঃ রাজীব দেওয়ান

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ খ, রোল ঃ ২৫

পরীক্ষার হল,
নাই কোলাহল;
দুরু দুরু বক্ষে,
বসে সব কক্ষে।
হাতে আসে প্রশ্ন,
কেউ খুশি কেউ ক্ষুন্ন;
কারও হাত খাতায়,
কারও হাত মাথায়।
কেউ লেখে অবিরল,
কারও চোখ টলমল;
অবশেষে ঘন্টা,
কেঁপে ওঠে মনটা।
খাতা হয় হাত ছাড়া,
মনে পড়ে সব পড়া।

ক্রিকেট

রিয়াজুল ইসলাম

শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ ক, রোল ঃ ৩৭

ক্রিকেট একটি মজার খেলা
বিশ্ব জুড়ে শুধু ক্রিকেটেরই মেলা
কখনো চার ছয়
মারতে গিয়ে আউট হয়।
চার ছয় মেরে নেয় কত রান
দর্শক পেতে রাখে নিজের কান।
ব্যাটসম্যান দোয়া করে
হয় যেন চার ছয়
প্রতিপক্ষের বোলারের চাওয়া একটাই
আউট হয় যেন সবাই।
যদি আসে বোলারের পালা
না পারলে চেহারা করে কালা।

লোড শেডিং

ইতরাদ আহম্মেদ

শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৪৩

লোডশেডিং এর জ্বালাতন,
গরম লাগে সারাক্ষণ।
কারেন্ট নাই, পানি নাই
হাত পাখাতে বাতাস খাই।
ঠাণ্ডা কিছু খেতে চাই,
ফ্রিজ খুলে দেখি বরফ নাই।
লোডশেডিং এর আঁধার রাত্রি,
তাইতো জ্বালি মোমবাতি।

রৌদ্র বৃষ্টির খেলা

সাইফুল ইসলাম

শ্রেণী ঃ ৮ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ৯

ভোর হল, আঁধার পালালো
সূর্য এসে, তাপ ছড়ালো;
মাঠের পানি শুকিয়ে গেল।
বৃষ্টি গেল মেঘের সাথে,
ঐ দূর আকাশের অন্তনীড়ে।
রৌদ্র খেলায় সবাই হাসে;
বৃষ্টি ছিল তারই পাশে
রৌদ্রের হাসি দিগন্ত ছড়ায়
রৌদ্র এখন.....
আনন্দ আত্মহারায়।

শীত ও বুড়ী

মোঃ রেজাউর রহমান

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ২৪

শীতের বুড়ী আসছে ধেয়ে
হিমেল চাদর গায়ে,
উদোম গায়ে বেশতো ছিলাম
এখন কি উপায়?
জামা কাপড় নেই তো আমার
পাই না ভাল খেতে,
ফুটপাতে হায় শুয়ে থাকি
ইটে মাথা পেতে।
শীত বুড়ীকে ভয় করি তাই
যাও না বুড়ী যাও,
ভয় দেখিয়ে আমায় তুমি
এমন কি সুখ পাও।

মানে

মোঃ সাইফুল ইসলাম

শ্রেণী ঃ ৮ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ০৯

স্কুল মানে ভোর বেলাতে
কাঁধে ব্যাগের ঝোলা।
পথ মানে রাস্তা ঘাটের
কাঁদা আর ধূলা।
বন্ধু মানে চকলেট কিনে
আধা আধি খাওয়া।
স্যার মানে একটু ভুলে যাওয়া
পড়া না পাড়লে যে ভীষন রাগ করা
ক্লাশ মানে বেঞ্চেতে
সাটা সাটি বসা।

পথের ছেলেরা

মোঃ আবদুল্লাহ্ আল মামুন
শ্রেণী ঃ ৮ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ

সারাদিন ধরে,
পথে পথে ঘোরে,
গায়ে মেখে ধুলো।
তারা কারা!
পথের ছেলেরা।
খায় তারা ডাস্টবিনের পড়ে থাকা
বাসি পঁচা খাবার।
সারাদিন খেটে,
তাদের ভাগ্যে জোটে না
এক মুঠো আহার।

আমাদের দেশ

রায়হানুল কবির
শ্রেণী ঃ ৫ম, শাখা ঃ খ ,রোল নং ঃ ৪

এই আমাদের দেশ
পরিবেশের সুন্দর সমাবেশ।
সুন্দর সবুজ গাছপালা
মনে হয় যেন পৃথিবীর মালা।
আকাশে ঘুরে বেড়ায় সাদা মেঘের ভেলা
বড় ভাল লাগে দেখতে বিকেল বেলা।

রাজধানী ঢাকা

মোঃ সাজেদুল ইসলাম
শ্রেণী ঃ ৬ষ্ঠ, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ২

বাংলাদেশের প্রধান শহর
রাজধানী ঢাকা
এই শহরের রাস্তায় চলে
রিক্সা, গাড়ী, মোটর।
উঁচু উঁচু দালান কোঠা
এই শহরে আছে
তারই মাঝে মানুষগুলো
লড়াই করে বাঁচে।
এই শহরে ট্রাফিক জ্যাম
বড়ই সমস্যা
রিক্সা ভ্যানের চালকরা
আইন মানে না।

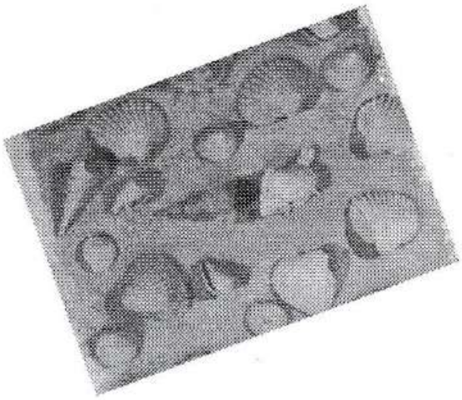

হোতেম যদি

তানভীর আহম্মেদ
শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৫৩

হোতেম যদি ক্রিকেটার
মারতাম শুধু ছক্কা,
তা দেখে সব বোলাররা
পেতো শুধু অক্কা।
হোতেম যদি ফুটবলার
দিতাম শুধু গোল,
তা দেখে সব গোলকিপারদের
বুক করত ধরফর।
হোতেম যদি র‍্যাকেটার
খেলতাম এমন র‍্যাকেট,
তা দেখেই আমার প্রতিপক্ষ
আমার হাতেই প্যাকেট।
হোতেম যদি বক্সার
মারতাম এমন ঘুষি,
তা দেখেই সব দর্শকরা
আমার প্রতি খুশি।

খেলতে মানা

রফিকুল ইসলাম
শ্রেণী ঃ ৬ষ্ঠ, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১১

মা বলেন পড়রে খোকা
বাবা বলেন লেখ,
পড়ালেখার কথা শুনলে আমার
গায়ে আসে জ্বর।
সকাল বেলা খেলতে মানা
স্কুল দুপুর বেলা,
বিকেল বেলা টিচার বলেন
বন্ধ কর খেলা।
সন্ধ্যা বেলা পড়তে বসি
অংক করি রাতে,
খাওয়ার পরে মা বলেন
ঘুমাও বিছানাতে।
খেলাধুলা না করলে
আমার অসুখ বাড়ে
ছোট্র বেলা না খেললে
বাঁচতে কি কেউ পারে?

আমার গ্রামের দৃশ্য

মোঃ জহিরুল ইসলাম সরকার
শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৪১

আমার গ্রামের কাঁচা মাটি,
আমি সেখানে খালি পায়ে হাটি।
সেখানে আছে নদী ও ঘাট,
সেখানে আছে আরো অনেক মাঠ।
গ্রামে আছে অনেক পাখি,
প্রতিদিন তাদের কল কাকলি শুনে থাকি।
গ্রামের মানুষেরা খুব কষ্টে কাটায় তাদের জীবন,
কারণ তারা অল্প আয়ে চলে সারাজীবন।
তাদের নেই কোন বিশ্রাম
ভোর থেকে শুরু হয় তাদের কঠোর পরিশ্রম,
কত না কষ্টে কাটে তাদের জীবন
তবুও কি সুন্দর তাদের মন।

শিক্ষার আলো

রাজু আহমেদ
শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ১৬

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড
শিক্ষা অবহেলার নয়,
কারও সাথে এ শিক্ষার
তুলনা কি হয়?
মূর্খ মানুষ সারা জীবন
খেটে খেটে মরে,
শিক্ষা জীবনে
বয়ে আনে উষার আলোরপথ।
ধনী মানুষ বিদ্যা না শিখলে
বিদ্যার জ্ঞান কি সে পায়?
ধন-সম্পদ দিয়ে যায়না কেনা
মূর্খ হয়ে সে রয়।
এসো করি পন সবাই মিলে
শিক্ষার আলো, জ্ঞানের আলো
ছড়িয়ে পড়ুক সবার মনে।

ঠিকানা

মোঃ মোতাসিম বিল্লাহ
শ্রেণী ঃ৭ম , শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ১

একদিন আমি যাব চলে
তোমাদেরকে ছেড়ে,
আমার সাথে যাবে না কেউ
অন্ধকার সেই ঘরে।
সেখানে রবে আঁধারের ভয়
থাকবে না কোন আলো,
জীবন স্মৃতির পাতায় পাতায়
পাতা হবে মোড়ানো।
বাংলার এই মানুষগুলো ভুলে যাবে আমায়
দিনে দিনে আমার স্মৃতি ভুলে যাবে সবাই।
এমনি করে আমার মত কতজন আসে
কতজন চলে যায়।
কেউ আমাকে রাখবে না মনে আমায়
চলে যাব মোর আপন ঠিকানায়।

মা

মোঃ মাহামুদুল হাসান পিয়াস

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ ক,রোল নং ঃ ৪ বিভাগ ঃ বাণিজ্য

মাগো তুমি আছ,
তাই ভালো লাগে এই ধরনী।
তুমি আছ মা,
তাই ভালো লাগে ফুলের সুবাস, পাখির সুর।
সুন্দর সকালে যখন ঘুম থেকে উঠে দেখি
মা তোমার মুখ,
তখন মনে হয় সবাই আছে,
আছে পৃথিবীর সুখ।
বিপদ আপদ , দুঃখ ব্যথা যতই আসুক ঠেলে
তুমি মা তখনি আমায় রাখবে বেঁধে।
এ পৃথিবীর সব কিছুই তুচ্ছ,
মা তোমায় কাছে পেলে।

প্রিয় বাংলাদেশ

মোঃ শাওয়ানুল হক

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৫০, বিভাগ ঃ বাণিজ্য

আমি বাংলায় জন্মেছি,
আমি বাংলায় যেন মরি।
আমার জীবন ধন্য হয়েছে,
এই দেশেতে জন্ম নিয়ে।
এমন সুন্দর দেশ
যার রূপের নাইরে শেষ,
সেই তো আমার জন্মভূমি
প্রিয় বাংলাদেশ।

নদীর ওপারে

মোঃ জাহিদুল ইসলাম

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক
রোল নং ঃ ২৮, বিভাগ ঃ বাণিজ্য

মুসলিম স্কুলের ছাত্র আমি
থাকি নদীর ওপারে,
প্রতিদিন আসতে হয়
নৌকা পাড়ি দিয়ে।
সাঁতার আমি জানি না ভাই
ভয় লাগে যে সারাক্ষণ,
কখন বুঝি নৌকা ডুবে
প্রাণটা যাবে বিসর্জন।

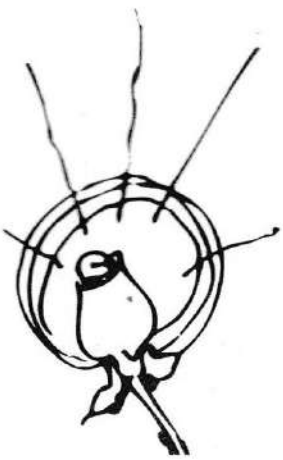

সময়

মোঃ আল–আমীন

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ২

সময় যা ছিল, তা তো গত,
যতই ডাকো না তাকে
ফিরে পাবে না তো
সময় যা হাতে, তা তো আছে
যেটুকু তোমার তাকে লাগাও না কাজে।
ভাবী কালগর্ভে যা,
পাবে না হয়তো তাকে আর
বর্তমান কাল যেটা,
মনে রেখো সেটাই তোমার।

ফ্রেন্ডশীপ

রিয়াদ-বিন-শহীদ
শ্রেণী ঃ ৮ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৩৯

ঈষান হল লম্বা জোকার
করে শুধু বকর বকর,
শশী তার উল্টোটা ঠিক
সে আমাদের লাল্টু বিট।
আদনান মিঞা ছেলে ভালো
ফ্রেন্ড সার্কেলের আলো।
হীরা যেন হীরা ঠিক,
তাকে ছাড়া পাইনা দিক।
আশরাফটা খুব দুষ্টু ছেলে
সে না এলে কষ্ট মেলে।
সাইদ খুবই চুপচাপ,
বৃষ্টি পরে টুপটাপ।
রিয়াদ হল লক্ষ্মী ভারী,
কারও সাথে নেয়না আড়ি।

ছোট বোন

ইমতিয়াজ আহমেদ মল্লিক
শ্রেণী ঃ ৬ষ্ঠ, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ৩৭

ও আমার ছোট বোন
নাম তার বিউটি।
সারাদিন করে খেলা
এই তার ডিউটি।
নেই কোন কাজ তার
তবুও সময় নেই তার।
লেখা পড়ার কথা শুনে
সে মুখ ভার করে।
লতা, পাতা, মাটি দিয়ে
রান্না করে মায়ে ঝিয়ে,
তার রান্না কেউ খান না
তাই তো জুড়ে দেয় সে কান্না।

বাঘ ছাগলের কাণ্ড

মোঃ মোক্তাদির আহমেদ
এস, এস, সি পরীক্ষার্থী, বিভাগ ঃ বাণিজ্য

সাবাশ! সাবাশ! সাবাশ! মোরা
বাংলাদেশের দল।
বুক ভরা সাহস মোদের,
বাহু ভরা বল;
ক্রিকেটের বলটা মোদের,
কাছে মনে হয়।
বাতাস ভরা বেলুন যেন,
হালকা অতিশয়;
ব্যাটের কাছে এলেই মোরা,
উড়িয়ে দেই বাতাসে,
অপর পক্ষের বোলারেরা,
কাঁপে ভয়ে সামনে এসে।
যখন মোরা বোলিং করি,
গুলির মত জোরে।
অপর পক্ষের ব্যাটসম্যানেরা,
কাঁপে থরে থরে।
জোরে তারা হাঁকাতে চায়,
কিন্তু নাহি পারে,
বলটা গিয়ে স্ট্যাম্পে লেগে তিনটা পল্টি মারে।
ঘরের কোণে পারি মোরা,
মাঠে নাহি পারি;
তাইতো মোরা বারে বারেই,
গাধার মত হারি।
ঘরের কোণে বাঘের শাবক,
বাইরে গেলে হায়;
কেমনে জানি হঠাৎ করেই,
ছাগল হয়ে যাই।

বিদ্যালয়ের মাঠ

এস, এম, ইমরান হোসেন

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক
বিভাগ ঃ ব্যবসায় শিক্ষা, রোল নং ঃ ১

শৈশবে,
বিদ্যালয়ের এই মাটিতে আমি
খেলেছি কত খেলা,
দুলছে হৃদয়েতে এখন
সেই সব স্মৃতির মেলা।

খেলতে যেয়ে পড়েছি মাঠে
পেয়েছি কত ব্যাথা,
কেঁদে বলেছি তখন আমি
কতই না কত কথা।
বিকেলেতে ঝরে যাওয়া বকুল
মাঠে থেকেছে পড়ে,
তুলেছি নিজ হাতে গেঁথেছি মালা
মোর ছোট বোনেরই জন্যে।
চলে গেছে সেই দিনগুলি
মোরে বড় করে,
বকুল ঝরা গাছটি মোরে
গেছে কাঁদিয়ে।

মশার পরিচয়

মোঃ তানভীর হোসেন

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৮

ডেঙ্গু আমার নাম;
কষ্ট করে রক্ত খেয়ে বেড়ানোই যে আমার কাম।
আজব শহর ঢাকা;
রক্ত খেতে আমার তো ভাই লাগে না কোন
টাকা।
প্রিয় রং একটাই তো টুকটুকে লাল;
প্রিয় সে যে পাতলা কাপড় মানুষেরই চামড়ায়;
যাতে করে সহজেতেই হুল ফুটানো যায়।
প্রিয় বর্ষা আছে ঋতু,
ভাল্লাগেনা ডেঙ্গু ভীতু;
প্রিয় মানুষ আছে সেজন,
গভীর ঘুমে ঘুমায় যেজন।
ঢাকায় মোদের প্রধান ঘাটি
কয়েল যদি হয় এক নম্বর খাঁটি
মরেই পড়ে যাই।
মরার আগে বলতে চাই দেশের জন্য
কিছু করতে চাই,
ডেঙ্গু মোরা জনসংখ্যা কমাতে পারি ভাই।

মা

সোয়াদ মোহাম্মদ সেতু

শ্রেণী ঃ ৬ষ্ঠ, শাখা ঃ ক

ত্রিভুবনে সবার প্রিয়
আছে সবার জানা।
মা ছাড়া এই পৃথিবীতে
আর আছে ক'জনা।
সুখে বল, দুঃখে বল
সব সময়ই মা।
তাই তো এত গর্ব করে
সবাই বলে- মা।
সবাই মোদের ছাড়তে পারে
দিতে পারে দাগ
কিন্তু মায়ের তুলনা যে
হয়নাতো আর ভাগ।

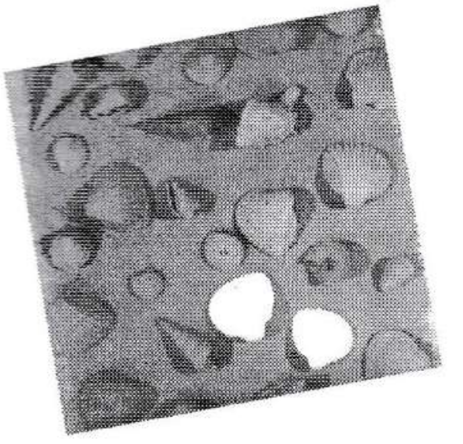

আমার বাবা

আমিন খান
শ্রেণী ঃ ৬ষ্ঠ, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ২৮

আমার বাবার মত কি আর
আছে কারো বাবা?
সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে যে
আমার প্রিয় বাবা।
কত দেশ ঘুরেছি আমি
কতনা বাবা দেখেছি,
আমার বাবার মত আর
একটিও না পেয়েছি।
বাবা আমার প্রাণের উৎস,
ভবিষ্যতের পথ,
বাবার পথে চলবো আমি
গরব ইমারত।
বাবার সুখে সুখি আমি
বাবার দুঃখে দুঃখি,
বাবার দোয়ায় পারি সবই
সাধ্য আর অসাধ্য কি!
বাবা আমার বাবা
সে যে প্রিয় বাবা আমার,
শ্রেষ্ঠ সে যে বাবা আমার
সারা দুনিয়ার।

মা

খাজা আদনানুল হক
শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১০

মা তুমি কত সুন্দর মোর মনে,
তোমার কথা ভাবি আমি বিরলে
চন্দ্রের ন্যায় হাসি তোমার,
আমাকে আকৃষ্ট করে।
মধুর চেয়ে ও মধুর,
তোমার মুখের বাণী।
সর্বদা তুমি আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ কর,
দোয়া করি তুমি যেন স্বর্গে প্রবেশ কর।
তোমাকে নিয়ে আমি গর্ববোধ করি,
তোমাকে ছাড়া এই পৃথিবী মূল্যহীন।

আমার স্কুল

মোঃ হাসান
শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ১৫

ঢাকা গভঃ মুসলিম স্কুল
সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী স্কুল
মুসলমান ছাত্রদের প্রিয় স্কুল
ঢাকা গভঃ মুসলিম স্কুল।
এই স্কুলের নিয়ম কড়া,
আসলে কেউ টুপি ছাড়া।
আছেন সেথায় মানিক স্যার,
ধরে তাকে দেন মার।
চুল যদি বড় হয়,
টুপি খুলতে স্যারে কয়
কান ধরে দেন আছাড়,
তিনিই মোদের মানিক স্যার।
স্যার ম্যাডাম আছেন যারা
নিজ নিজ বিষয়ে দক্ষ তারা,
আছেন স্কুলে জামাল স্যার।
পড়া না পারলেই দেন মার,
আরো আছেন হাসান স্যার,
তিনি বলেন পড়া বল
না পারলে কানে ধর।
আরো আছেন বাশার স্যার
ইংরেজিতে দক্ষতা তার
আছেন আরো অনেক স্যার
এই স্কুলেতে,
ম্যাডামরাও আছেন যে,
নিজ দক্ষতা নিয়ে
স্কুলটা যে দেখতে ভাল,
ছাত্ররা পায় জ্ঞানের আলো
হরষিত মনে তারা টিফিন পিরিয়ডে
মসজিদে গিয়ে জোহর নামাজ পড়ে।
এসব মিলিয়েই আমাদের স্কুল,
ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল।
সকল স্কুলের সেরা স্কুল!!!

সুখ-দুখ-দু'ভাই

মোঃ রাইসুল ইসলাম
শ্রেণী ঃ ৮ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ

সুখ-দুঃখ-দুই ভাই
থাকে পাশাপাশি,
সুখের পর দুঃখ আসে,
সময় অতি কাছাকাছি।
মানুষ বলে আমার দুঃখের অন্ত নাই
সুখ কোথায় পাই?
মানুষ বলে আমার সুখের সন্ধান চাই,
সুখ আসিলে দুঃখ মোচন হয় ভাই।
সুখ! সুখ! সুখ! চাই
তারপরও কেন দুঃখ পাই,
কারণ সুখ দুঃখ দুই ভাই।

স্বাধীনতা যেন

মোঃ আরিফ হোসেন
শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১৪

স্বাধীনতা যেন ফুটন্ত এক
লাল গোলাপের ফুল,
স্বাধীনতা যেন বিরহী মায়ের
এক রাশি এল চুল।
স্বাধীনতা যেন রাখাল ছেলের
একটি বাঁশের বাঁশি।
স্বাধীনতা যেন কোটি মানুষের
একটু মধুর হাসি।
স্বাধীনতা যেন মুক্ত আকাশে
উড়ন্ত এক পাখি।
স্বাধীনতা যেন অন্ধলোকের
নতুন পাওয়া আঁখি।
স্বাধীনতা যেন বিধবা মায়ের
হারিয়ে পাওয়া ছেলে
স্বাধীনতা যেন ছোট্ট শিশুটি
ঘুমানো মায়ের কোলে।

স্বপ্ন

মোঃ শাহজাহান কবীর
সহকারী শিক্ষক

শয়নে স্বপ্নে আমি
তোমাকে চাই।
রাতের স্বপ্নেতে তাই
তোমাকেই পাই।
আস তুমি কাছে
হাসি মাখা আমার মুখে
আবেগে জড়িয়ে ধর
মায়া ভরা বুকে
বুকের ভিতর দেখতে পাই
ভালবাসার ঘর,
যে ঘরেতে শুধু থাকব আমি,
থাকবে না কোন পর।
ভালবাসার ঘরটি দেখতে
তাজমহলের মত,
মায়া মমতায় ভরা যেন
মমতাজের মত।
সেই ঘরেতে থাকব আমি
সারা জীবন ভরে,
আদর সোহাগে রাখবে
আমায় একান্ত আপন করে।

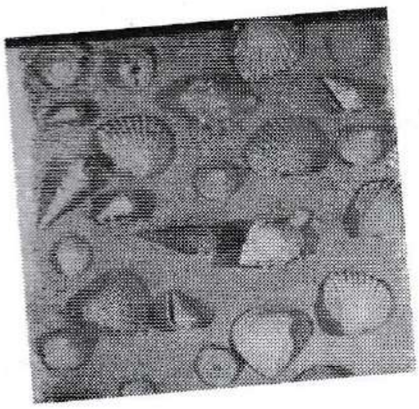

My Country

Md. Maruf Belal
Class : 10, Sec: B
Roll No : 03, Division : Science

It is my country, as like as dwelling land
How nice you are!
My joy's have no bound
Seeing the nature everywhere.

It is my land not comes in a day
And stand against struggle even today.
At night there are dazzing stars
Since stopped out exploit over the years.

It is from Teknaf to Tetulia
My writings are rough and rugh
How the pretty your continuity in the sky
Birds fly freely at a large in the sky.

Padma, Meghna, Jumuna are our rivers
Fields are full of golden crops in winter
I am manifested to look upon creations beauty
Loves you by heart soul my formost duty.

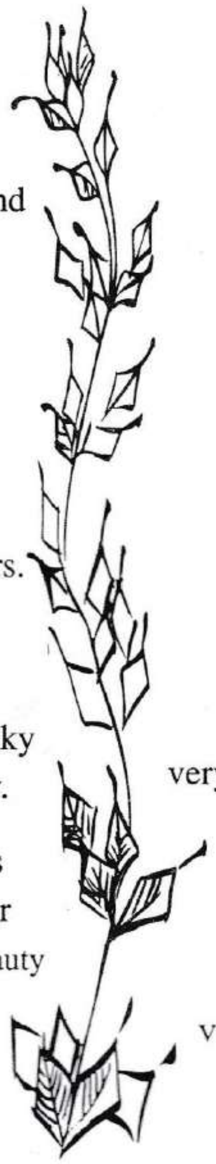

Tree

Md. Rafiqul Islam
Class : 9, Sec. : B
Roll No. : 3, Division : Scince

Trees are our best friend
Which contribute us Oxyzen.
That's why created human civilization.

Trees give us charcoal and fruits
And these are very useful for us
Really we are grateful to the trees.

So, for our betterment we shall plant more trees
After few years it will be our assets.

Very Easy But Very Hard

Md. Arifur Rahman
Class-IX , Sec : A, Roll No.: 3

very easy to say no
but
very hard to say yes.
very easy to say sorry.
but
very hard to forgive anybody.
very easy to spend money
but
very hard to earn money.
very easy to hate each other
but
very hard to love one another.
very easy to study at school
but
very hard to take part in the examination.
very easy to play all day
but
very hard to work all day
very easy to gain bad name
but
very hard to gain name and fame.

Bell Ring

Md. Mahbub Alam
class-IX , Sec: B, Roll No : 2

bell ring, bell ring
of the school
let's go let's go
in the classroom.

do not make a noise
outside and in classroom.
let's we study in
our school and home.

প্রবন্ধ

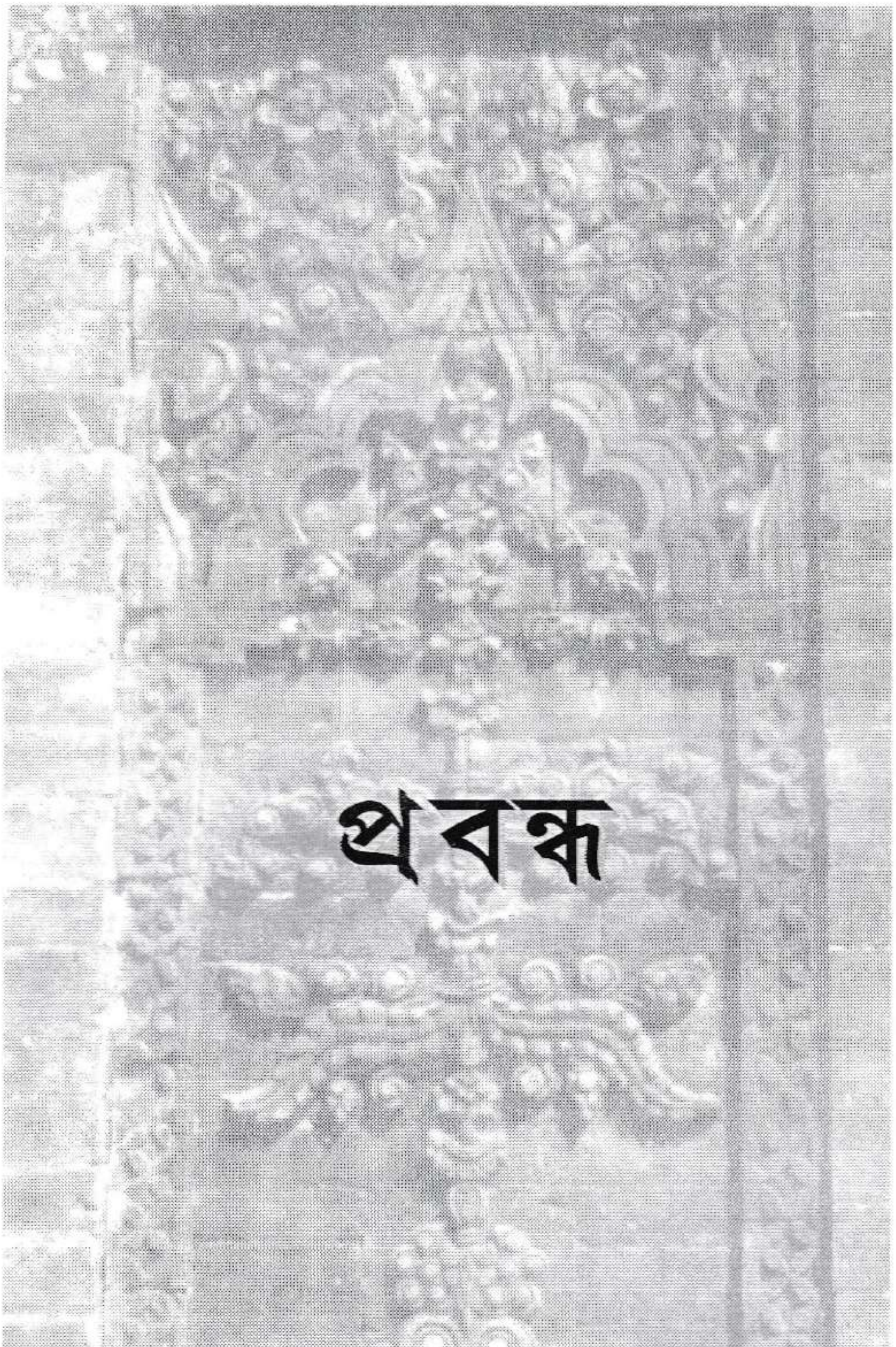

তুমি যাহা লিখিবে লোকে পড়িবামাত্র
যেন তাহা বুঝিতে পারে।
—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রহস্যে ঘেরা বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল

মোঃ রুবাইয়াত হোসেন

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ খ, বিভাগ ঃ বিজ্ঞান, রোল নং ঃ ১

রহস্য কে না ভালবাসে? যেখানে রহস্য সেখানেই আমাদের মন ছুটে যায়। কৌতুহল নিয়ে উঁকি দেয়। সহজেই আকৃষ্ট হয়। সৃষ্টির শুরু থেকেই আজ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় পাতায় যে কত রহস্য ধরা পড়েছে, বলে শেষ করা যাবে না। এসব রহস্যের গভীরে সত্য-মিথ্যা যে কোথায় কতটুকু লুকিয়ে আছে মানুষ তার সন্ধান করে ফিরছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। কত ব্যাখ্যা, কত বিচার, কত বিবেচনা করছে। কিন্তু রহস্য যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। এমনই এক রহস্যে ঘেরা জায়গা হল বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল।

এ অঞ্চলটি একটি ত্রিভুজের আকৃতি বিশিষ্ট আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম ভাগের একটি অংশ। আমেরিকার দক্ষিণপূর্ব ভূ-ভাগ ছাড়িয়ে জলদেশে এর অবস্থান। ত্রিভূজের একটি শীর্ষে আছে এই বারমুডা নামক একটি দেশ এবং সেই দেশের নামেই এই অঞ্চলের নাম বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল। আসলে এ অঞ্চলটি এমনই এক রহস্যাবৃত স্থান যার নিকট দিয়ে কোন সমুদ্র জাহাজ, নৌকা বা এর ওপর দিয়ে কোন বিমান গেলে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। যা আর কখনই খুঁজে পাওয়া যায় না। এ রকম ঘটনার প্রথম শুরু হয় ১৯১৮ সালে। ইউ. এস নেভির কয়েকটি জাহাজ নিঁখোজ হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে রহস্য জনক "সাইক্লোপস" জাহাজটির অন্তর্ধান। ইউ. এস. এস সাইক্লোপস ৩০৯ জন যাত্রীসহ ১৯০০০ টনের ভারী জাহাজ বার্বাডোজ থেকে বাল্টি মোরের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু সে যাত্রাই তার শেষ যাত্রা। সে জাহাজটি এই অঞ্চলের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় সমুদ্রগর্ভে একেবারে হাওয়া হয়ে যায়। এ জাহাজের জন্য খোঁজ খবর কম করা হয় নি। কিন্তু কোথাও তার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নি। তখন অবশ্য এই বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল সম্পর্কে কোন বিষয়ে বা এই জাহাজ ডোবার জন্য যে এই অঞ্চলই দায়ী তাও মনে করা হয় নি। এ সম্পর্কে সবার প্রথম গবেষণা শুরু হয় ১৯৪৫ সালে যখন ফ্লাইট নাম্বার নাইনটিন উধাও হয়ে যায়। ১৯৪৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর রৌদ্রোজ্জ্বল এক শীতের অপরাহ্নে লেফটেন্যান্ট টেলারের নেতৃত্বে ৫টি অ্যাডভেঞ্চার টর্পেডো জঙ্গি বিমান আকাশে ওড়ে। এটিই ফ্লাইট নাম্বার নাইটিন। এ ফ্লাইটের উদ্দেশ্য ছিল বিমান মহড়া, আর কিছু নয়। চারজন বৈমানিক সাথে আটজন ক্রু। প্রায় ৩টা ৪৫ মি. মূল কেন্দ্রে ১ম বার্তা এল। বার্তায় বিপদের আশঙ্কা সুস্পষ্ট। দলনেতা কন্ট্রোল রুমকে ডাকছে জরুরী অবস্থা তারা পথ হারিয়েছে। বেতার যোগাযোগ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। উদ্বিগ্ন কর্তৃপক্ষ নিকবর্তী নৌ-কেন্দ্র থেকে একটি দৈত্যকার মার্টিন মেরিনার ফ্লাইং বোট পাঠাল। ১৩জন ক্রু নিয়ে এই বিমানটি নিরুদ্দিষ্ট ফ্লাইট নাইনটিনের সম্ভাব্য অঞ্চলে উড়ে চলল। উড়ে যাবার এক মিনিট এর মধ্যে লেফটেন্যান্ট টেলা নামে এক জন ক্রু ফ্লাইট নাইনটিন যেখানে যাবার কথা সেই অঞ্চলে উড়ে গিয়ে জানাল যে

১৮০০ মি. এর ওপরে তারা এক বাতাসের ঝড়ের মধ্যে পড়েছে। উদ্ধারকারী বিমান থেকে এই খবরই শেষ খবর। সাথে সাথে বিমানটিও অদৃশ্য হয়ে গেল। অবশেষে সন্ধ্যা ৭টার ফ্লাইট নাইনটিন হারিয়ে যাবার কিছু আগে মিয়ামী কন্ট্রোল রুমে শেষ সংকেত ধরা পড়ল-এফ, টি-এফ,টি। এই সংকেতের ফলে অনেকেই অবাক হল। কারণ এর প্রায় ২ ঘন্টা আগেই তো বিমানের জ্বালানী ফুরয়ে যাবার কথা। আর এক বিস্ময় যেহেতু ফ্লাইট নাইনটিনের শেষ সংকেত এসে পৌঁছে সন্ধ্যায় পর। তার মানে তখন সূর্য পশ্চিমে ডুবতে শুরু করে। এতেও তারা দিক নির্ণয় করতে পারত। তাহলে কি তারা এমন এক স্থানে পৌঁছেছিল যে সেখান থেকে সূর্যকেও দেখা যায় না। পরবর্তীতে সেই এলাকার পাহাড় পর্বতে, অরণ্যে প্রান্তরে, নদ, নদীতে, সমুদ্রে জলাভূমিতে প্রায় ৯,৮৪,০০০ বর্গ কি. মি. জায়গার মধ্যে অনুসন্ধান করা হল। কিন্তু কপাল এমনই মন্দ যে, সেই বিমানগুলোর সামান্য ভগ্নাংশটুকুও খুঁজে পাওয়া গেল না। তাহলে বিমান কি পানির ওপর পড়েছিল। পানির ওপর পড়লেও কেউ না কেউ তো জীবিত থাকার কথা। কারণ এ ধরনের বিমান ৯০ সেকেন্ড পানিতে ভাসবে। আর বৈমানিকেরা এমন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যে বিমান ছেড়ে বেরিয়ে আসতে তাদের ১ মি. এর বেশি সময় লাগবে না। তাহলে বিমানগুলো কোথায় হারিয়ে গেল বা বৈমানিকেরা কোথায় গেল? এ প্রশ্ন যখন সবার মুখে তখন অঞ্চলের দৃষ্টি পড়ল যে অঞ্চল থেকে এরা অদৃশ্য হয়েছে তার দিকে, মানে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের ওপর। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকেও এই ত্রিভূজ অঞ্চল থেকে জাহাজ হারানোর খবর আছে। উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সময়েও মার্কিন জাহাজসহ একাধিক বিদেশী জাহাজও এই "অভিশপ্ত অঞ্চল" থেকে হয় হারিয়ে যায় না হয় ওটা পরিত্যক্ত হয়। অথচ বন্দর থেকে ওটা যখন ছাড়ে তখন কোথাও কোন গোলমাল থাকে না। এভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনা আজও ঘটে চলছে। কেউ তা রোধ করতে পারে নি। বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের মৃত্যু গহ্বরে পড়েও আবার অনেকে অদ্ভুভাবে বেঁচে এসেছে। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে আমেরিকান বৈমানিক ডিক স্টার্ম। তিনি ২ বার এই অভিশপ্ত অঞ্চল থেকে বেঁচে যান। শুধু বিমানেই নয়, নৌযানের ক্ষেত্রেও এরকম বহু ঘটনা আছে। কিন্তু তারাও এই রহস্যময় অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলতে পারেন নি। অনেক বিশেষজ্ঞরা এই অঞ্চলকে শয়তানের খাদ বলে ধারণা করেছেন। তাদের মতে, পৃথিবীতে এরকম আরও অনেক খাদ রয়েছে। তার মধ্যে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল সবচেয়ে বড়। এই যে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলকে নিয়ে এত রহস্য এর কারণ কি? এ অঞ্চলের আকাশের ওপরে যত দূর্যোগ দেখা গেছে, সব ক্ষেত্রেই বিমানের যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেছে, কম্পাস কাজ করেনি, ফলে এসব দূর্ঘটনার কারণ হিসেবে গবেষকরা পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের ভূমিকাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চান না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আজও রহস্যের গভীরে। বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল এখনও কুহেলিকা ঘেরা আতঙ্কের মত অনেক ব্যাখ্যাই দেয়া আছে। গবেষকরা, তথ্য অনুসন্ধানকারীরা এখনও দমে যাননি। কিন্তু বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের রহস্য আজও উদঘাটিত হয় নি। ভবিষ্যতে কি মানুষ পারবে এর রহস্য উদঘাটন করতে?

[সংগৃহীত ও সংকলিত]

যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষন ও জ্ঞান অর্জন করে তার জন্য পুরস্কার রয়েছে।-আল হাদীস

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

এস. এম. ইমরান হোসেন

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, বিভাগ ঃ ব্যবসায় শিক্ষা, রোল নং ঃ ১

আমেরিকার দুই প্রেসিডেন্ট জে, এফ কেনেডি আর আব্রাহাম লিংকনের নাম আমরা সবাই জানি। এ দু'জন ঠিক একশ বছরের ব্যবধানে মারা যান। অবাক হবার কথা দু'জনকেই মাথার পেছন দিক থেকে গুলি করে মারা হয়। দু'জনেই শুক্রবার মারা যান। ১৮৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট লিংকন তার পার্সোনাল সেক্রেটারির অনুরোধ উপেক্ষা করে স্ত্রীকে নিয়ে থিয়েটার হলে যান এবং স্ত্রীর সামনেই গুলিবিদ্ধ হন। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১৯৬৫ সালের ঠিক একশ বছর পরে। একইভাবে প্রেসিডেন্ট কেনেডি তার পার্সোনাল সেক্রেটারির অনুরোধ উপেক্ষা করে ডালাস সফরে যান এবং স্ত্রীর সামনেই গুলিবিদ্ধ হন।

লিংকনের হত্যাকারীর নাম জন উইকস বুথ। (John Wilks Booth) ১৮৩৯ সালে তার জন্ম। কেনেডির হত্যাকারীর নাম লী হারভে অসওয়াল্ড (Lee harvey Oswald)। ১৯৩৯ সালে তার জন্ম। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, দু'জনের জন্মের ব্যবধান একশ বছর এবং দুজনেই উত্তর আমেরিকার নাগরিক। এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এদের দুজনেরই নামের অক্ষর সংখ্যা পনেরটি (ইংরেজিতে)। শুধু তাই নয় প্রেসিডেন্ট কেনেডি (Kennedy) ও লিংকন (Lincoln) এর নামের অক্ষর সংখ্যা ও সাত। দু'জন হত্যাকারীই তাদের বিচার চলাকালীন অবস্থায় জেলখানায় মারা যায়। ইতিহাসে আরও দেখা যায় যে, লিংকনের পার্সোনাল সেক্রেটারির নাম কেনেডি আর কেনেডির পার্সোনাল সেক্রেটারির নাম লিংকন। লিংকনের উত্তরাধিকারী হিসেবে যিনি এসেছিলেন তার নাম এন্ড্রো জনসন (Andrew Johnson) । তার জন্ম ১৮০৮ সালে আর কেনেডির উত্তরাধিকারীর নাম লেন্ডন জনসন (Lyndon Johnson)। তিনি জন্মেছিলেন ১৯০৮ সালে। দু'জনের নামের অক্ষর সংখ্যা তের (ইংরেজিতে)।

একশ বছরের ব্যবধানে এই রকম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কোথাও ঘটেছে বলে জানা যায় নি।

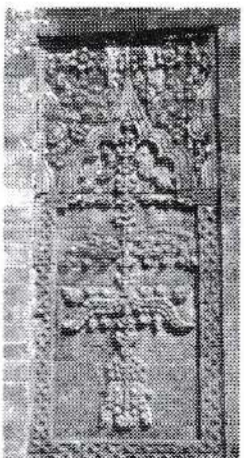

সময় খুব মূল্যবান, কিন্তু সত্য সময় হতেও মূল্যবান।-ডিজনেলী

পিরামিড! এক অনন্য রহস্য!

মুহাম্মদ মারুফ বিল্লাহ্

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ খ, বিভাগ ঃ বিজ্ঞান, রোল নং ঃ ৩

পিরামিড (Pyramid) যার আভিধানিক অর্থ যে ঘনবস্তুতে কোন ভূমির উপর অবস্থিত হয়ে ছুচালো হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের এই নব উৎকর্ষতার যুগে মানুষ যখন অসম্ভব সব কল্পনাবিলাসী মনোভাবকে সম্ভব করে পুরো পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় আয়ত্ত করেছে, তখন পিরামিডের নাম শুনতেই মনের মাঝে জেগে উঠে অজানা এক কৌতুহল। সত্যিই পিরামিড রহস্যের এক আদি বিস্ময়। বর্তমান সভ্যতার উপর দাড়িয়ে মানুষ যেখানে শৌখিনতার বেশে মঙ্গল গ্রহে বসবাস করার জন্য তাদের সন্ধানী চিত্তকে নিয়োজিত করেছে সেখানে পিরামিড আধুনিক সভ্যতাকেও হার মানায়। অপরূপ সৌন্দর্য্যের আঁধার পিরামিড পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের রহস্যপূর্ণ আশ্চর্য্যের মধ্যে একটি। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে নির্মিত পিরামিড মূলত একটি স্তম্ভ বিশেষ। বিজ্ঞানের এই নব জাগরণের যুগে শত সহস্র অনুসন্ধিৎসু মনের নানান প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হলেও পিরামিড যেন এক অজানা নিভৃত রহস্য। যা কৌতুহল দীপ্তক মানুষের মনকে সান্ত্বনা দিতে পারবে না, পারবে না এ রহস্যের জানালা খুলে দিতে। তারপরও পিরামিডের কারুকার্য, গঠন ও স্থাপত্যশৈলী মানুষের হৃদয়কে করে আবির্ভূত, হরণ করেছে মানুষের কৌতুহলী মনকে।

পিরামিডের ইতিহাস অতি প্রাচীন। পিরামিড হচ্ছে মূলত মিশর দেশের তিনকোনা পার্শ্ব বিশিষ্ট ও চারিকোনা ভূমির উপর অবস্থিত স্মৃতিফলক যা প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের সমাধির উপর সুবিশাল পাথর দ্বারা নির্মিত। পিরামিডের ভেতর রয়েছে বিশাল ও বড় বড় কক্ষ যাতে মৃত ব্যক্তির কবর বা মমি পৃথক পৃথকভাবে দাফন করা হতো। মমির পাশে অবশিষ্ট কক্ষও রয়েছে যা ব্যবহৃত হত মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রার্থনার জন্য এবং এর জন্য দর্শনার্থীদের জন্যে কক্ষ খুলে দেওয়া হতো। আসলে পিরামিডের আভ্যন্তরীনটা হচ্ছে ফাঁপা। যা বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে পুরু কিন্তু ভেতরে মনে হবে মাটির নিচের একটি দর্শনীয় স্থান। পিরামিডের চারিপার্শ্বেও রয়েছে বিশাল সব প্রার্থনা ঘর ও সমাধিক্ষেত্র। পিরামিডের প্রবেশ পথটি গ্রানাইট দ্বারা নির্মিত এবং এটিই একমাত্র প্রবেশপথ যা মমিদের রক্ষা করার জন্য বন্ধ থাকতো।

পিরামিডের অভ্যন্তরে যা সমাধিক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো তাই হচ্ছে মমি। মমির অর্থ হচ্ছে প্রক্রিয়াজাতকরণ লাশ। মিশরীয়রা তাদের মৃত রাজা বা রাণীদের পচনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মৃতদেহকে মমি করে রাখতো। কিন্তু তখনকার মিশরীয়রা মমি করার পদ্ধতি জানতো না, কিন্তু লাশ দাফন করতো। অর্থাৎ সেই সব সমাধি স্থলের মাটিতে থাকত এক প্রকার তরল পদার্থ। আর সেই মৃত্তিকা থেকে মমির উৎপত্তি হয়। অতঃপর মিশরীয়রা লাশসমূহ মমি করা শুরু করে সেই সাথে সেই

সব ব্যক্তিদের দেহ থেকে পচনশীল অঙ্গসমূহও পৃথক করতে থাকে। এরপর তারা পুরো শরীরকে নানা রকম কাপড় দিয়ে বেঁধে মুড়ে ফেলতো। সবশেষে তারা মৃত লাশগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে কবর দিত। ধারণা করা হতো যে আত্মা পুনরায় জীবিত হবে, আর সেই সাথে তাদের যেন কোন অমঙ্গল না হয় তাই কয়েক দিনের মধ্যেই লাশ মমি করা হতো।

সাধারণত মিশরীয় রাজা রাণীদের মমি করার প্রথা প্রচলিত ছিল। সে সময় কোন রাজা বা রাণী মৃত্যু বরণ করলে তাদেরকে গোপনভাবে মমি করা হতো। মূল্যবান সামগ্রী, সোনা রত্ম, খাবার-সামগ্রী এবং তাদের সাথে তাদের গোলাম বাদীরাও থাকতো। এমনকি তাদের সাথে অস্ত্রসস্ত্রও দেয়া হতো যাতে করে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে। পিরামিডের অভ্যন্তরে থাকতো রাজাদের কর্মচারীবৃন্দ। মমি করার কাজ শেষ হবার পর আত্মার প্রতি প্রার্থনা শেষে মমি প্রবেশ করানো হতো ও দরজা বন্ধ করে দেওয়া হতো। সেই সাথে কাজ সম্পন্নকারী ব্যক্তিকেও মেরে ফেলা হতো যাতে কেউ কেউ কোন অজানা রহস্য জানতে না পারে।

পিরামিডের নির্মানকাল বহু বছর আগের। প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব দুই হাজারের অধিক সময় আগে শুরু হয় পিরামিড নির্মানের পরিকল্পনা। মিশরীয়রা বিশ্বাস করতেন যে, মৃত্যুর পর আত্মা পুনরায় চির দিনের জন্য পৃথিবীতে ফিরে আসে। তাই তারা শরীরকে অক্ষত রাখার জন্য মমি করে পিরামিড তৈরির পরিকল্পনা করে। এ ছাড়া মৃত ব্যক্তিদের সাথে সংরক্ষিত মূল্যবান সামগ্রী রক্ষার্থে পিরামিড তৈরির প্রয়োজন দেখা দেয়। সর্ব প্রথম তৎকালীন বিখ্যাত প্রকৌশলী মৈহুতাব নির্মান করেন সাত তলা বিশিষ্ট বিশ্বের প্রথম পিরামিড। তার প্রায় পর অর্ধশত বছর পর ফেরাউন বংশীয় রাজা মানকারু নতুন পদ্ধতিতে আলাদা আলাদাভাবে ৪৮ ফুট উঁচু পিরামিড নির্মান করেন। কিন্তু এটি ধ্বসে পড়ায় সাকায়ায় নির্মান করা হয় সুবিশাল চারকোনাকার বিশিষ্ট পিরামিড। প্রায় ২০ বছর ধরে এক লাখ শ্রমিকের দ্বারা নির্মিত হয় এই অপরূপ নন্দনশীল স্থাপত্যকর্ম।

মিশরে প্রায় ৭৮টি পিরামিড রয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় পিরামিডটি হল রাজা খুপুর পিরামিড। ৫.৩ হেক্টর এলাকার উপর নির্মিত এই পিরামিডের বেধ ২৩০ মি. উচ্চতা ১৪৮ মি. এবং প্রায় ২৩ লাখ পাথর ব্যবহৃত হয়েছে এটি নির্মানে। এছাড়া দাফনকৃত কবরের উপর দেওয়া হয়েছে গ্রাফাইট পাথরের ছাদ যা একে করেছে আরও সৌন্দর্যশালী। সুনিপুণভাবে তৈরি করা এর এক এক স্থাপত্যশৈলী দেখলে মনে হয় প্রতিটি অংশই যেন প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া, সব যেন এক অজানা রহস্য।

মানুষ স্বভাবই কৌতুহল প্রিয়। বিবর্তনের এই যুগে এক এক আবিষ্কার এক এক রহস্যের দরজা খুলে দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু কেউ কি বলতে পারবে পিরামিডের সেই অজানা রহস্যের কথা অথচ সেই রহস্যের হাত ধরে মানুষ মনের দুয়ারে কল্পনাবিলাসী স্বপ্নকে লালন করছে। তবুও পিরামিডের এই অজানা ইতিহাস মানুষকে নিয়ে যাবে আরো রহস্যময় আঁধারের দিকে। মানুষ পারবে কি সেই রহস্যের জট খুলতে? অনুসন্ধানী মানুষ হয়তো পারবে, হয়তো পারবে না।

[সংগৃহীত ও সংকলিত]

যদি জীবন জগৎ থেকে কিছু পেতে চান, ভ্রমণ করুন, দু'চোখ ভরে দেখুন এই রহস্যময় জগৎটাকে।-আইজ্যাক ওয়ল্টন

বিশ্ব কাঁপানো টুইন টাওয়ার

মোঃ রাসেল

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৩৭, বিভাগ ঃ বাণিজ্য

১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ইং, রোজ মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ৯টা। পৃথিবীর মানুষ প্রচন্ড রকম চমকে উঠল খবরটা শুনে। যুগের বৃহত্তম ভবন টুইন টাওয়ার বিধ্বস্ত হয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে। পৃথিবীতে এই প্রথম এত বড় ভবন ধ্বংস হলো। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বিরাট শিরোনামে ছাপা হলো সেই খবর। এ সংবাদ পড়ার পরও অনেকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। চোখ ধাঁধাঁনো টুইনটাওয়ার কি সত্যিই ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেক মানুষ মনে করে টুইনটাওয়ার ধ্বংস হওয়ারই প্রয়োজন ছিল। কারণ অতিরিক্ত অহংকার আর নানা রকম পাপাচারে লিপ্ত মানুষ এই ভবনে ছিল। এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাবের সূরা-আল-নিসায় এ ভবন ধ্বংসের পূর্বাভাস রয়েছে।

স্বপ্নের আমেরিকা বলতেই সবার প্রথমে যে ছবিটি চোখের সামনে ভেসে উঠত, নিউইয়র্কের "দ্যা স্ট্যাচু অফ লিবার্টি" এর পাশাপাশি যে টুইন টাওয়ারের ছবি সব জায়গায় ব্যবহৃত হতো, মঙ্গলবারে স্ময়নকালের ভয়াবহ এবং ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হামলায় তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এখন এ স্থানে স্তূপীকৃত বালু ও কংক্রিটের রাশি লোহার দুমরানো টুকরো কাঠামো আর চাপা জড়া মানুষের ছিন্ন ভিন্ন দেহাবশেষ। উদ্ধার কর্মীদের তৎপরতা আর নিউইয়র্কবাসীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নেই।

১৯৭৩ সালে নির্মান কাজ পুরোপুরি শেষ হওয়ার মূহূর্তে ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টারের টাওয়ার দুটি বিশ্বের সর্বোচ্চ টাওয়ার হিসেবেই খ্যাত ছিল। কিন্তু বছর দুয়েক পর সিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার নির্মানের পর সেই খ্যাতিতে ভাটা পড়বে ও নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের আকাশে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা টুইন টাওয়ার আমেরিকাবাসীর গর্বের কারণ হয়ে ছিল। কেননা এটাই ছিল নিউইয়র্ক শহরে প্রবেশের জন্য অন্যতম দরজা। সমালোচনা করা হয়েছে যে, ভবনটিকে লেগোব্লক বলতেই বেশি পাছন্দ করতেন। সেই ১১০ তলা বিশিষ্ট এবং যথাক্রমে ১হাজার ৩৬৮ ফুট বা ১ হাজার ৩৬২ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন স্টিলের টুইনটাওয়ার তৈরী করতে খরচ পড়েছিল ৮০ কোটি ৩০ লক্ষ মার্কিন ডলার। সবচেয়ে অবাক কথা হলো এই বিশাল ১১০ তলা টাওয়ার তৈরী করতে মাত্র ১৬মাস সময় লাগে এবং পেন্টাগণ ভবনের মেরামতের জন্য প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৫০ কোটি ডলার। বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী দু'টি টাওয়ার নির্মান করতে প্রায় ৮০ হাজার টন ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রায় ২০০ফিট চওড়া, প্রতিটি টাওয়ারের প্রত্যেকটি ফ্লোর ইস্পাত দিয়ে মোড়া ১৮ ইঞ্চি পরু ইস্পাতের টিউব। প্রতিটি টাওয়ারে ১০৪টি যাত্রীবাহী লিফট, ২১ হাজার ৮০০ জানালা ছিল। আর প্রতিটি ফ্লোরেই ভাড়া দেয়ার মতো প্রায় এক একর জায়গা রয়েছে। তাছাড়া দু'টি টাওয়ারেই পর্যবেক্ষন ডেক থেকে যেদিকেই তাকানো হোক না কেন ৪৫ মাইল দূর পর্যন্ত দেখা যেত। নির্মান কারীদের ব্যাপক উদ্দাম ছিল। এ ভবন দু'টিকে ঘিরে। তারা বলতেন ওয়াল্ডট্রেড সেন্টারটিকে অবশ্যই এমন হতে হবে যেন মানবতার এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে গড়ে উঠো আর এটা প্রয়োজন স্বাতন্ত্রের জন্য।

মানুষের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে উদারতা খুজে পাওয়ার জন্য। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বরে ২০০১ইং মঙ্গলবার ভয়াবহ দূর্ঘটনায় তাদের অহংকার, গর্ব করার টাওয়ার দুটি ধ্বংস হয়ে যায়। টুইন টাওয়ার হামলায় কি পরিমান ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে তা এখনো সঠিক ভাবে বলা সম্ভব হয়নি। তবে প্রাথমিক ভাবে একটি ধারনা দেয়া হচ্ছে যে, টুইন টাওয়ারে বিশ্বের ২৬টি দেশের ৪০০টি ব্যবসা প্রতিষ্টানের দফতর ছিল। যার ক্ষতির পরিমান ৮০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। তবে এখন এই স্থানেই আবারও টাওয়ার বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

একমাত্র সৎ ব্যক্তিরাই অন্যকে কঠোরভাবে তিরস্কার করতে পারে।-জর্জ ম্যারাডিথ

ভয়ঙ্কর সরীসৃপ

মোঃ তারেক রহমান

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ৬ বিভাগ ঃ বিজ্ঞান

"জুরাসিক পার্ক" স্টিফেন স্পিলবার্গের অনবদ্য চলচিত্র। তারপর "দ্য লষ্ট ওয়ার্ল্ড" আরও একটি অসামান্য সৃষ্টি। বিস্ময়কর দুনিয়া কাঁপানো। আজ থেকে সাড়ে দু'কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া ডায়নোসোরদের চলচিত্র। দুটো চলচিত্ররই প্রধান চরিত্র ডায়নোসর। মাইকেল ক্রিসাটনের লেখা কল্পবিজ্ঞান কাহিনী নিয়ে তৈরি হয়েছে "জুরাসিক পার্ক"। পরিচালক স্পিলবার্গ তার অসাধারন বিজ্ঞান মনস্ক সৃষ্টিশীলতা, কম্পিউটার প্রযুক্তি এবং ক্যামেরার যাদু, সব কিছু মিলে জীবন্ত করে তুলেছে মানুষের কসিল ধারণাকে। পৃথিবী থেকে সাড়ে দু'কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এই দৈত্যাকার ভয়ানক দর্শন প্রাণীরা নতুন করে আবার কাপন জাগিয়েছে মানুষের মনে। "জুরাসিক পার্ক" এর অর্থ কি? ডায়নোসোরদের সাথে এর সম্পর্ক কি? ডায়নোসোরই বা কি? পৃথিবীতে জীব সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে সাড়ে তিনশ কোটি বছর ধরে জীবজগতে নানা বিপর্যয় ঘটেছে। ভূতাত্ত্বিকেরা এ দীর্ঘ সময়কালকে তিনটি মহাযুগ এবং প্রত্যেক মহাযুগকে কয়েকটি যুগে ভাগ করেছেন। সময়ের বিচারে ২য় মহাযুগের নাম মেসোজোয়িক মহাযুগ। একে আবার তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছেঃ—ট্রায়াসিক, জুরাসিক এবং ক্রিটোসিয়াস। ২য় মহাযুগের ৩টি যুগ ধরেই পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে ডায়নোসোররা। যে কারণে গোটা মহাযুগকেই বলা হয় অতিকায় ডায়নোসেরে যুগ। তবে ৩টি যুগের মধ্যবর্তী যুগেই ডায়নোসোরদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিস্তার ঘটেছিল। তাই জুরাসিক শব্দটি একাকার হয়ে গেছে ডায়নোসোরদের সাথে। আমেরিকার মনটানা আর নর্থ ডাকোটায় এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ডায়নোসরের হাড়গোড় পাওয়া গেছে। বিভিন্ন গোত্রের ডায়নোসরের এই বিপুল হাড় দেখে বিজ্ঞানীরা এখানেই ডায়নোসরদের আদি বাসভূমি ছিল বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। ভয়ানক হিংস্র প্রকৃতির টিরানোসোরাস রেক্স এর ১৬ জন কংঙ্কাল পাওয়া গেছে এখানকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। ডায়নোসরের এক ছোট প্রজাতির নাম ভোলোসিরাপটর। আকারে চার মিটার মাত্র তাদের কংঙ্কালও পাওয়া গেছে এই মনটানা অঞ্চলেই। যারা ছিল মাংসাশী এবং টিরানোসোরাস রেক্স এর চাইতেও ভয়ঙ্কর। এরা দল বেধে বড় বড় তৃণভোজী সাইনোসোরদের আক্রমণ করত এবং কাবু করে ফেলত। আজ থেকে সাড়ে দু'কোটি বছর আগে হঠাৎ করেই পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে এই প্রাণী। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে একজন ব্রিটিশ ডাক্তার এবং সৌখিন ফসিল সংগ্রাহক জি, এ মেনটেল এবং তার স্ত্রী মেরী ম্যানটেল যখন ইংল্যান্ডের সাসেক্স অঞ্চলে অজ্ঞাত পরিচয় এক জন্তুর বিরাট আকৃতির কয়েকটা দাঁত খুঁজে পান। তখন এটা এক রকম কল্পনার বিষয়বস্তু ছিল। তারপর দীর্ঘ দিন ধরে

বহু বিজ্ঞানী এবং ফসিল সংগ্রাহকদের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত বিভিন্ন প্রজাতির ডায়নোসোরদের হাড়গোড় থেকে বেড়িয়ে এল কল্পনার থেকে কয়েকশগুণ বড় একটি অতিকায় প্রাণীর অবয়ব। বিজ্ঞানীরা অনেকবার নাম পাল্টানোর পর এর নামকরণ করলেন ডায়নোসর। গ্রীক ভাষায় ডিনোস (Deinos) নামে ভয়ঙ্কর আর সোরাস (Sofros) মানে হল সরীসৃপ। দুটো মিলে ভয়ঙ্কর অতিকায় সরীসৃপ হয়। ১৪ কোটি বছর ধরে নানান প্রাজাতির নানা রকমের ডাইনোসর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল পৃথিবীর নানা প্রান্তে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল কাঠ বিড়ালীর মত ছোট। আবার কেউ বা বিশাল ওজনে প্রায় ১০০ টন। কেউ চার পায়ে ছুঁটে বেড়াতো। কেউ ছিল নিরামিষাশী কেউ বা মাংসভূক। সংগৃহীত কংঙ্কাল ও হাড়গোড় থেকে বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত প্রায় তিনশ রকমের ডাইনোসরের নামকরণ করেছেন। আর্জেন্টিনায় আবিস্কৃত মাত্র এক ফুট লম্বা ডায়নোসরটির নাম ল্যাগোসকাস। প্রায় ২২ কোটি বছর আগে অস্তিত্ব ছিল নয় ফুট লম্বা এক রকম ডায়নোসর যার নাম হেরেরাসরাস। প্রায় ১৫.৫ কোটি বছর আগে নিউ মেক্সিকো অঞ্চলে বিচরণ করত যে ডায়নোসর তার নাম সিসমোসরাস। দেড়শো ফুট লম্বা এবং ৯০ টন ওজনের বিশালাকার সিসমোসরাস। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত জীবজন্তু এসেছে তার মধ্যে সবচেয়ে লম্বা ডাইনোসর এর নাম ডিপলোসেকাস। প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ মিটার লম্বা। আর সর্ববৃহৎ মাংসাশী স্থলচর জন্তু হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে টিরাসোসোরাস নামের হিংস্র ডাইনোসর, ট্রাইসেরাটোপস, মোনোক্লোনিয়াম। এরা সব হল শিং বিশিষ্ট ডায়নোসর। আরও কত রকমের ডাইনোসর, কত রকম তাদের নাম। ব্রনটোসরাস, সেরাটোপসিয়ানস, হাড্রোমরাস, অসপটোসরাস, আলোসরাস, ইগুনয়ানোডন, কোরিথোসরাস, স্টেগোসরাস আরও কত কি। বছর দশ বারো আগে আর্জেন্টিনার এক পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিজ্ঞানীরা তেইশ কোটি বছরের পুরানো একটি কুকুর আকৃতির ডাইনোসরের কংঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত ছিল, এই ১০ কেজি ওজনের মাংসাশী প্রাণীটিই ডাইনোসরের আদি পূর্ব পুরুষ। এ পর্যন্ত পাওয়া সব ডাইনোসরের কংঙ্কালের মধ্যে এটিই প্রাচীনতম। জীবাশ্ম বিজ্ঞানীরা এই ডাইনোসরের নাম দিয়েছেন ইউরেবটর। তেমনি আর্কি ও পটেরিক্স কে বিজ্ঞানীরা মনে করেন পৃথিবীর প্রথম পাখি। কিভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল এই অতিকার সরীসৃপরা পৃথিবীতে? গত সারে ষাট কোটি বছরে পৃথিবীতে বড় আকারের ধ্বংসও ঘটেছে বেশ কয়েকটি। তার মধ্যে তিনটি ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম ঘটনায় ধ্বংস হয় সমুদ্রের ট্রিলো বাইট শ্রেণীর জীব। দ্বিতীয় ঘটনায় পৃথিবীর প্রায়ই নব্বই শতাংশ জীব বিলুপ্ত হয়ে। তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে ক্রিটোশিয়াস এবং টারশিয়ারী যুগের সন্ধিহানে। আর এই বিপর্যয়েই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ডাইনোসর বংশ। বিজ্ঞানীরা মনে করেন মহাজাগতিক কারণেই হঠাৎ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল ডাইনোসররা। ধূমকেতু, গ্রহানু কিংবা ঘন ধূলির মেঘে ঢাকা পড়েছিল সূর্যালোক, আবহাওয়ার শীতলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঘটেছিল চরম পরিবেশ বিপর্যয় এবং আকস্মিকভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ডাইনোসর নামক পৃথিবীর অতিকায় প্রাণী।

[সংগৃহীত]

যে মানুষকে ভয় করে, সে ঈশ্বরকে ভয় করে না।-আব্দুল কাদের

নীল মানুষ

শেখ মোঃ জাহেদুজ্জামান

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ খ, বিভাগ ঃ বিজ্ঞান, রোল নংঃ ১৮

সাহারা মরুভূমির মরুদ্যানে দেখা যায় রহস্যময় নীল মানুষদের। তারা হল বাগুইরাট পাহাড়ি উপজাতির যাযাবর মানুষ। অনেকে মনে করেন এই নীল মানুষেরা হল হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিসের শেষ অধিবাসী। বিচিত্র এদের জীবন ধারা। রহস্যের কুয়াশায় যেন ঢেকে রয়েছে এদের জীবন। এদের কেউ যদি নগরীতে আসে তখন লোকেরা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। মনে হয় তারা যেন অন্য গ্রহের অধিবাসীদের দেখছে।

ছোটবেলা থেকেই এই উপজাতির লোকেরা পরে ঢিলে আলখাল্লা ধরণের পোশাক যা তাদের গায়ের সাথে লেপটে থাকে। মেয়েরা মুখে আঁকে নীল উল্কি। এদের স্বভাব হিংস্র। সাহারার আতংক এবং ত্রাস হল এই নীল মানুষ। লুটতরাজ এদের প্রধান পেশা। তাছাড়াও এরা করে লবণের ব্যবসা। মরূভূমিতে বালু ঝড় ওঠার খবর এরা আশ্চর্য এক উপায়ে বুঝতে পারে। মরুভূমির কাটা ঝোপের ভেতর থেকে এক ধরণের মেঠো ইঁদুর ধরতে এদের জুড়ি নেই। মরক্কো ও আলজিরিয়ার দক্ষিণে তিন লক্ষ ও মালেতে দুই লক্ষ নীল মানুষ রয়েছে। এরা উটের পিঠে চেপে ঘোরে। ব্যবহার করে বিষ মাখানো তীর। যা দেহে বিঁদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে মৃত্যু ঘটে। এরা দুর্গম অঞ্চলে বাস করে। একবার সরকার তাদের গবাদি পশুর উপর কর বসালো। দেখা গেল কর আদায় করা কোনমতেই সম্ভব হচ্ছে না। কারণ যারাই কর আদায় করতে গেছে তাদের কেউ আর ফিরে আসেনি। নীল মানুষ তাদের হত্যা করেছে। এই নীল মানুষদের প্রধান শত্রু হচ্ছে সাহারা অঞ্চলের আরেক দুর্ধির্ষ্য উপজাতি টাটজিকেটা। প্রায়ই তাদের মাঝে রক্ত পাতের সংঘর্ষ ঘটে। নীল মানুষেরা মরক্কোর মরুদ্যান উপশহর জাগোরা আর গুনিয়াইনে বাস করে। এদের উৎসবের নাম গুয়েদরা। শনিবার রাতে মাদল বাজিয়ে তারা এই উৎসবে মেতে ওঠে।

[সংগৃহীত]

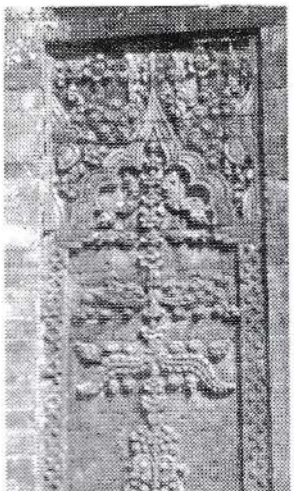

ক্যালেন্ডারের নানা কথা

মো রফিকুল ইসলাম

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ৩ বিভাগ ঃ বিজ্ঞান

ক্যালেন্ডার মানেই একটি বছরের নবসূচনা। একটি নতুন বছর ক্যালেন্ডারকে নিয়েই যাত্রা শুরু করে সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ক্যালেন্ডারের নানা কথা প্রচলিত রয়েছে।

ক্যালেন্ডারের জন্মকথা ঃ খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দ পর্যন্ত রোমান রাজাগণ ১৫ মার্চ সিংহাসনে বসতেন। তখন বছরের পহেলা দিন ছিল ১৫ মার্চ। রোমান-মাসের প্রথম দিনকে বলা হয় (Calends) এবং চাঁদের প্রথম দিনকে বলা হতো (kalends)। সেই ক্যালেন্ডস থেকেই আজকের ক্যালেন্ডারের জন্ম। পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণের সময়কে সৌরবর্ষ বলা হয়। ১২ মাস বা ৫২ সপ্তাহ সময়কে ১ সৌরবর্ষ বলা হয়। এই সময়কেই মাস, সপ্তাহ, দিন ও ঘন্টায় ভাগ করা হয়েছে। ক্যালেন্ডার সম্পর্কে এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটিনিয়াতে বলা হয়েছে—"Calender is a System of days, month and years" বর্তমান যুগে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই গ্রেগরিয়ান বা ইংরেজী ক্যালেন্ডার ব্যবহৃত হয়। পৃথিবী তার নিজ কক্ষপথে ঘুরে আসতে সময় নেয় ২৪ ঘন্টা। এই সময়কে মানুষ তার ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ কর্মের সুবিধার্থে এক দিন হিসেবে গণ্য করে আসছে। এভাবেই মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে মাস, পক্ষ, সপ্তাহ নামে সময়কে ভাগ করে আসছে।

প্রাচীন সুমেরীয়, মিসরীয় ও ব্যবলীয়নরা চাঁদের হিসেবে তাদের সময় গণনা করত। ক্যালেন্ডারের উদ্ভব ও বিকাশে মিসরীয় সভ্যতার দান অপরিসীম। মিসরীয়রাই প্রথমে মৌসুমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সময় গণনার আধুনিক পদ্ধতি চালু করে। তারা বছরকে ৩২ দিন বিশিষ্ট বার মাসে বিভক্ত করে এবং বছর শেষে ৫ দিন যুক্ত করে ৩৬৫ দিন হিসেবে বছর গণনা করত।

এক সময় রোমানরা তাদের ফসল উত্তোলনের সময়কে ধরে মার্চ-ডিসেম্বর এই নয় মাসে সময় গণনা করত। পরবর্তীতে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে রোমানরা ১২ মাস হিসেবে ৩৬৫ দিনে বছর গণনা শুরু করে।

ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস জানুয়ারীর জন্ম কথা ঃ (Janus) জ্যানাস বা জানুস রোমান পুরানের গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। ফটক ও দরজার অধিপতি। ফটক ও দরজা দিয়ে যেহেতু প্রবেশ ও প্রস্থান ঘটে সে জন্য দ্বাররক্ষী দেবতা জ্যানাসকে বিপরীত দিকে ফেরানো দুই মুখের অধিকারী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। আর এই কারণে তাকে বর্ষ শুরু ও বর্ষশেষ দেবতা হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। জ্যানাসের নামানুসারেই বছরের প্রথমমাস জানুয়ারী মাসের নামকরণ করা হয়েছে। প্রাচীন রোমে জ্যানাস সব কিছুর শুভ উদ্বোধনের দেবতারূপে ও পূজিত হতেন। তাই তিনি শুধু প্রবেশ পথেরই দেবতা ছিলেন না, প্রকৃত অর্থেই ছিলেন প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথে অবস্থান করে জ্যানাস রোমের জনজীবনের সব কিছুর উপর কর্তৃত্ব করতেন। রোমানরা যুদ্ধকালীন অবস্থায় জ্যানাসের

মন্দিরের উভয় দ্বার খোলা রাখতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল দুই দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি রোমকে পাহারা দেবেন। অবাক হলেও সত্যি, এখন রোমানরাতো বটেই, বিশ্বের অন্য সকল জাতি গোষ্ঠী ক্যালেন্ডারের পাতায় সেই দেবতা জানুস কিংবা জ্যানাসকেই বছরের প্রথম মাস জানুয়ারী নামের সঙ্গে স্মরণ করে।

বিশ্বের প্রথম মুদ্রিত ক্যালেন্ডার ঃ খ্রিষ্টপূর্ব ৫০ অব্দ থেকে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার এক রাজকীয় আদেশ জারী করে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন। তখন থেকেই সর্ব প্রথম অফিসিয়াল ক্যালেন্ডারের উদ্ভব হয়। জুলিয়াস সিজারের এই ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের পেছনে সেই সময়ের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সোসিজেনাসের অবদান রয়েছে অনেক। মূলত সোসিজেনাস ক্যালেন্ডারের আধুনিকায়নে ব্যাপক পরিবর্তন ও সংস্কারের উদ্যোগ নেন। সেই পরিবর্তিত ক্যালেন্ডার বহু বছর পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপসহ রোমান সাম্রাজ্যের বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে প্রতি বছর ১১ মিনিট কম সময় ধরা হয়েছিল। অবশ্য জ্যোতির্বিদ সোসিজেনাস প্রতি চার বছর পর যে লিপইয়ার গণনার কথা বলেছিলেন পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডে ব্রিটিশরা জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে মিলিয়ে এবং প্রতি চার বছর অন্তর লিপিয়ার গণনার জন্য আইনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেন। আইনগত স্বীকৃতি ও রাজা এয়োদশ গ্রেগরি প্রচলিত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয় ১৭৫২ সালের দিকে। এই সময় ব্রিটিশরা আইন করে মার্চ মাসের পরিবর্তে জানুয়ারী মাসকে বছরের প্রথম মাস হিসেবে ঘোষণা করে এবং ১লা জানুয়ারী হতে নববর্ষের প্রচলন করে। সেই থেকে জানুয়ারী হলো বছরের প্রথম মাস এবং পহেলা জানুয়ারী ইংরেজী নববর্ষ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে বিশ্ব জুড়ে। বর্তমান বিশ্বের সর্বজনীন যে ইংরেজী ক্যালেন্ডার তাকে "গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার" নামে ও অভিহিত করা হয়।

একটি ভাষা একটি জাতীর জন্ম ও একটি ক্যালেন্ডার ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী, ৮ই ফাল্গুন। ঢাকার রাজপথে মাতৃভাষা বাংলার দাবীতে শত তরুণের সাহসী মিছিল। পাকিস্তানি নর হায়েনাদের গুলি। হঠাৎ গুলিতে শহীদ হলো রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম ও নাম না জানা আরো অনেকে। ২১শে ফেব্রুয়ারী ক্যালেন্ডারে এ দিবসটি হয়ে উঠল বাঙ্গালিদের শোক ও প্রতিবাদের হিরন্ময় দিন। বাঙ্গালিরাই একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য জীবন দান করেছে। বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে এটি স্বীকৃতি লাভ করেছে। এদিনটি আমাদের দান করেছে ভবিষ্যৎ অনুপ্রেরণা। যার ফলশ্রুতিতেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর জয় লাভ করে। কত দিন, মাস, বছর, যুগ চলে যাচ্ছে তবুও ক্যালেন্ডারের পাতায় ২১শে ফেব্রুয়ারীও ১৬ই ডিসেম্বর উজ্জ্বলভাবে গেঁথে রয়েছে। বাংলা ভাষা এবং বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশের মধ্য দিয়েই আমাদের অনাগত দিনের ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো উজ্জ্বল করতে হবে।

মর্মান্তিক, কত বেদনাময়! হৃদয় উথলানো সর্বগ্রাসী কান্নার নোনা জলে যেন ডুবে যাচ্ছে সব। মা হারা, ছেলে হারা মানুষেরা খুব দুঃখী। মানব জীবনের কত হাস্যোজ্জ্বল দিন, দুঃখ-বেদনার নীরব-নিঃশব্দ সাক্ষী হয়ে থাকে ক্যালেন্ডারে স্মৃতিময় পাতাগুলো। ক্যালেন্ডার যুগ-যুগান্তর ধরে হয়ে উঠেছে নিত্য দিনের সঙ্গী............. ।

[সংক্ষেপিত ও সংগৃহীত]

অবিশ্বাস্য উইপোকার রহস্য

মোঃ আশরাফুল ইসলাম শাহেদ

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ খ, বিভাগ ঃ বিজ্ঞান, রোল নং ঃ ৫

পরিচয় ঃ আমরা উইপোকাকে সামাজিক জীব হিসেবেই জানি। উইপোকা ছাড়াও এর অন্যান্য নাম আছে। এর আঞ্চলিক নাম হচ্ছে উই, উলি, উলু ইত্যাদি। উইপোকাকে ইংরেজিতে বলা হয়ে থাকে (Termite)। এর বাহ্যিক গঠন ডানাসহ একটা সাদা পিঁপড়ার মত। এরা আমাদের আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড়, হার্ডবোর্ড ইত্যাদির ক্ষতি করলেও এর ব্যক্তিগত জীবনটা বৈচিত্র্যময় ও রহস্যে ভরপুর। উইপোকা বাংলাদেশে বৈশাখ মাসে অর্থাৎ বর্ষাকালে বাইরের পরিবেশে দেখতে পাওয়া যায়। বের হয়েই এরা উড়তে থাকে এবং আলো দেখলেই সেখানে ধাবিত হয়। এ সময় বিভিন্ন প্রাণী যেমন ঃ পাখি, টিকটিকি, মাকড়সা, ব্যাঙ ইত্যাদি এদের খেয়ে ফেলে।

প্রকারভেদ ঃ একটা উইপোকার বাসায় সাধারণতঃ ৪ ধরনের উইপোকা দেখা যায়। যথাঃ স্ত্রী, পুরুষ, সৈনিক ও শ্রমিক উইপোকা। এদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উইপোকা শুধু বংশ বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত থাকে। অপরদিকে সৈনিক ও শ্রমিক উইপোকা বংশ বৃদ্ধির কাজে অংশ গ্রহণ করে না। এর কারণও অবশ্য আছে। মূলতঃ শ্রমিক ও সৈনিক উইপোকা বন্ধ্যা।

স্ত্রী উইপোকা ঃ একটা উইপোকার বাসায় সাধারণত একটাই স্ত্রী উইপোকা থাকে। এদের দুই জোড়া পাখা থাকে। একটি স্ত্রী উইপোকা আকারে পুরুষ উইপোকার চেয়ে বড় হয়। এর আকৃতি দেখলে সবারই প্রকৃতপক্ষে মনে হবে এটা যেন একটা ডিম দেওয়ার ইঞ্জিন বা যন্ত্র বিশেষ যা সময়ের স্বল্পতায় প্রচুর ডিম দেয়। একটি স্ত্রী উইপোকা প্রতিদিন হাজার হাজার ডিম দিয়ে থাকে। প্রধানত স্ত্রী উইপোকা প্রতি মিনিটে প্রায় ৬০টি ডিম দেয়। ডিম দেয়ার সময় স্ত্রী উইপোকা আকারে বড় হয়ে থাকে। অনেক সময় এরা ৩/৪ ইঞ্চিও হয়ে থাকে দৈর্ঘ্যের দিক থেকে। প্রথম চার পাঁচ বছর যেসব ডিম দেয় তা থেকে শুধু সৈনিক এবং শ্রমিক উইপোকা জন্মায়। মজার কথা এটাই যে, ডিম দেওয়ার সময় স্ত্রী উইপোকা নিজে খাদ্যবস্তু খেতে পারে না সৈনিক ও শ্রমিক উইপোকা তাদের মুখের মধ্যে খাদ্য তুলে দেয় এবং তা স্ত্রী উইপোকা গ্রহণ করে।

পুরুষ উইপোকা ঃ সাধারণত পুরুষ উইপোকা আকারে স্ত্রী উইপোকা হতে ছোট হয়ে থাকে। স্ত্রী উইপোকার মত এরও দুই জোড়া ডানা আছে। পুরুষ উইপোকা বংশ বৃদ্ধির কাজ ব্যতীত অন্য কাজ করে না। একটা পুরুষ উইপোকা স্ত্রী উইপোকা থেকে শক্তির দিক থেকে দুর্বল হয়ে থাকে। পুরুষ উইপোকা প্রতি সেকেন্ডেই অর্থাৎ সব সময় স্ত্রী উইপোকার সাথে থাকে। অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্য যে, শুধু মাত্র স্ত্রী ও পুরুষ উইপোকা বাদে সকল উইপোকাই জন্মান্ধ।

সৈনিক উইপোকা ঃ একটা উইপোকার বাসায় সৈনিক উইপোকাকে সহজেই চেনা যায়। তাদের চেনার প্রধান উপায় হচ্ছে এরা সম্পূর্ণ ডানাবিহীন। অর্থাৎ, এদের কোন ডানা নেই। সৈনিক উইপোকার চোয়াল আকারে বড় হয়ে থাকে। তাছাড়া এদের মস্তকের আকারও বড় হয়ে থাকে। সৈনিক উইপোকার প্রধান কাজ হচ্ছে বহিঃশত্রুদের আক্রমন থেকে বাসা ও বাসার অন্যান্য উইপোকাকে রক্ষা করা। একটা

বাড়ি পাহারা দেবার জন্য যেমন বন্দুকধারী একজন দারোয়ান থাকে, তেমনি সৈনিক উইপোকাও দলে দলে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে থাকে। তারা তাদের শক্তিশালী চোয়াল দিয়ে বহিঃশত্রুদের আক্রমণ করে থাকে। এ ছাড়াও উত্তর আমেরিকায় নসুটি নামে এক প্রকার সৈনিক উইপোকা রয়েছে যা এক ধরনের তরল পদার্থ নির্গত করে এবং এর ফলে অন্যান্য শত্রু বা পতঙ্গ কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারে না। এসব তরল পদার্থ সাধারণত বিষযুক্ত হয়ে থাকে। যার ফলে শত্রু কাছে ঘেঁষতে পারে না। মূলত একটি সৈনিক উইপোকার আচরণ, স্বভাব ও চলাচল সম্পূর্ণ একটি সৈনিকেরই মত।

শ্রমিক উইপোকা ঃ শ্রমিক উইপোকা একটা বাসায় সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। এরা আকারে সবচেয়ে ছোট হয়ে থাকে। এদের কোনো ডানা নেই। শ্রমিক উইপোকারা প্রায় কাজই করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বাসা তৈরি করা, খাদ্য সংগ্রহ করা, ডিম বা নিম্‌ফ দেখাশুনা করা, উইপোকার বাচ্চার তদারকি করা, প্রয়োজনবোধে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা, স্ত্রী ও পুরুষ উইপোকাকে খাওয়ানো, তাদের দেখাশুনা করা, বাসাকে পরিষ্কার রাখা, বাসা মেরামত করা ইত্যাদি সব ধরনের কাজই শ্রমিক উইপোকারা করে থাকে। শ্রমিক উইপোকার খুব ছোট একটি চোয়াল থাকে। এ চোয়ালের শক্তি খুবই কম। একটি বাসায় শ্রমিক উইপোকার শ্রমিকের মতই আচরণ হয়ে থাকে।

উইপোকার বাস স্থান ঃ স্বাভাবিকভাবে একটা বাড়িতে যেমন বেডরুম, ডাইনিং রুম, ড্রইংরুম, কিচেন রুম, স্টোর রুম, ড্রেসিং রুম, রিডিং রুম ইত্যাদি থাকে উইপোকার বাসাও তেমনি বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এসব প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি প্রকোষ্ঠে স্ত্রী ও পুরুষ উইপোকা অবস্থান করে। এ প্রকোষ্ঠটি সবচেয়ে উন্নত প্রকোষ্ঠ। এ প্রকোষ্ঠটিকে রাজকীয় প্রকোষ্ঠও বলা হয়ে থাকে। উইপোকার বাসা ও তার আশপাশ সব সময়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ উইপোকা যে প্রকোষ্ঠে বাস করে সেখানে বেশ কিছু শ্রমিক উইপোকা তাদের পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত থাকে, যেমন পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত থাকে রাজারাণীর জন্য চাকর বাকর। উইপোকার বাসাকে উইয়ের ঢিবি বলা হয়। ইংরেজিতে এর নাম (Termataium)। এ সব বাসাকে বল্মীকও বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে সবচেয়ে উঁচু উইয়ের ঢিবি দেখা গেছে উত্তর অষ্ট্রেলিয়ায়। এর উচ্চতা ২০ ফুট এবং এর পরিধি ১২ ফুট। তাজমহল যেমন বহু শ্রমিক তৈরি করেছিল তেমনি এ ঢিবিটিও তাজমহলের মত রহস্যজনক। আসল কথা বলতে গেলে বলতে হয় উইয়ের ঢিবি তৈরি হতে কোন খুঁটির প্রয়োজন হয় না। আরেকটি মূল কথা এই যে, পানি বিহীন স্থানে উইপোকা বাসা বাঁধে না। এক্ষেত্রে মরু অঞ্চলের উইপোকা ফনিমনসা গাছের কান্ড থেকে পানি সংগ্রহ করে থাকে।

উইপোকার খাদ্য ঃ উইপোকার অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে প্রধান খাদ্য হল সেলুলোজ। তাছাড়া কিছু সংখ্যক উইপোকা ছত্রাকও খেয়ে থাকে। শুকনো কাঠ, কাপড়, কাগজ ও অন্যান্য অংশ হতে এরা সেলুলোজ সংগ্রহ করে। এগুলো সহজে পরিপাক হয় না। কারণ সেলুলোজ এক প্রকার পলিথিন জাতীয় পদার্থ। সত্যি বলতে, উইপোকার বাসায় কোন জিনিস নষ্ট হয় না। কারন শ্রমিক উইপোক মৃত সাথীদেরকে ঢিবির এককোণে জমা করে রাখে। খাদ্যাভাব দেখা দিলে মৃত উইপোকা জীবিতদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতেও খাদ্যাভাব না মিটলে ঢিবির অংশ বিশেষ খেয়ে ফেলে। পরে শ্রমিক উইপোকা তা মেরামত করে নেয়।

নীতিকথা ঃ একটি স্ত্রী উইপোকা স্বভাবত ২০-২২ বছর বাঁচে। পুরুষ, সৈনিক ও শ্রমিক উইপোকা অপেক্ষাকৃত কম বাঁচে। উইপোকা অন্ধ হয়েও যদি সুন্দরও সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবন যাপন করতে পারে তাহলে আমরা মানুষ হয়ে কি পারিনা এরকম সুশৃঙ্খল জীবনে আবদ্ধ হতে হয়তো চেষ্টা করলেই পারি।

প্রাচীন বাংলার ভাষা ও সাহিত্য

মোঃ ইমরান খান

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ খ, বিভাগ ঃ বিজ্ঞান, রোল নংঃ ৬

প্রথমে "প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা" তারপর "মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা" তারপরে "নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা" বা আধুনিক আর্য ভাষাসমূহের জন্ম। এই যেমন বাংলা, অসমিয়া (আসামের ভাষা), উড়িয়া (উড়িষ্যার রাজ্যের ভাষা) প্রভৃতি। ভাষার এই বিবর্তন ঘটেছে দু হাজারের ও বেশি বছর সময় ধরে। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার আসলে প্রাকৃত ভাষা হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ প্রাচীন বাংলার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল প্রাকৃত। এই প্রাকৃত ভাষা অঞ্চল ভেদে তৈরি হয়েছিল অপভ্রংশ। ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ভাষার এই অপভ্রংশ স্তর সৃষ্টি হয় ৪৫০-৬৫০ সালের মধ্যে। এই অপভ্রংশ থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম। তবে অপভ্রংশের নানা রূপ রয়েছে যেমনঃ-মাগধী, গৌড়ীয় এবং শৌরসেনী। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। অন্যান্য ভাষাবিদগণ এই মতকেই সমর্থন করেছেন। সুতরাং মোটামুটিভাবে বলা যায়, অষ্টম থেকে দশ, শতাব্দীর কোন এক সময় বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে এবং তা মাগধী অপভ্রংশ থেকেই হয়েছে।

প্রাচীন বাংলা ভাষা কিন্তু আজকের বাংলা ভাষার মতো ছিল না। প্রাচীন বাংলা ভাষার নমুনা বা নিদর্শন পড়লে দেখা যাবে, কিছুটা তা বুঝা যাচ্ছে আবার কিছুটা বুঝা যাচ্ছে না। এ জন্য একে আলো আধারীর ভাষাও বলা হয়। এখানে প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন "চর্যাপদ" থেকে দুটি লাইন নিম্নে দেয়া হল ঃ—

উঞ্চাঁ উঞ্চাঁ পাবত তাই সবরী বালী

মোরঙ্গী পীচ্ছ সবরী জিবত গুঞ্জরী শালী।

আধুনিক ভাষায়—

উঁচু উঁচু পর্বত সেখানে বাস করে শবরী-বালিকা,

ময়ূরের পাল পরা শবরীদের গলায় গুঞ্জার মালা।

এ তো গেল প্রাচীন বাংলা ভাষার কথা। এবার আমরা প্রাচীন বাংলায় রচিত সাহিত্যের খবর জানব।

১। আদি ব্রাহ্মী লিপি
(৫০০ খ্রিষ্ট পূর্ব)
↓
২। অশোক লিপি
↓
৩। কুশান লিপি
↓
৪। গুপ্তলিপি
↓
৫। কুটিল বা পূর্ব লিপি
↓
৬। নাগরী লিপি
(৬০০-৯০০ সাল)
↓
৭। প্রাচীন বাংলা লিপি
(১০০০ সাল)

নিম্নের ছকটি দেখলে আমরা ভাষার বিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্টই জানতে পারব।

প্রাচীন বাংলায় হয়তো অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। কিন্তু এতো বছর পর তার সবগুলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। কিছু কিছু পাওয়া গেছে। এর কোনটি পাওয়া গেছে প্রত্যন্ত গ্রামে, কোনটি সুদুর নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগারে। যেমন "চর্যাপদ" আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের বলা যায় প্রধান নিদর্শন, এটি পাওয়া গেছে নেপালে। চর্যাপদে আছে সুখ-দুঃখের কথা, তেমনি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কথা।

নিম্নে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও তার রচয়িতার নাম দেয়া হলঃ

১। চর্যাপদ (প্রাচীন বাংলার কবিতার সংকলন)

রচয়িতা ঃ বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সিদ্ধাচার্যগন।

কবিতার উদাহরণ ঃ

কাআ তরুবর পাঞ্চাবী ডাল
চঞ্চল চীএ পাইবা কাল।

[কাআ=দেহ, তরু=গাছ, পাঞ্চ=পাঁচ, ডাল=শাখা, চীএ=চিত্ত (হৃদয়)]

২। শূন্যপূরাণ (ধর্মবিষয়ক কাব্য)

রচয়িতা ঃ রামাই পণ্ডিত।

উদাহরণ ঃ *নাহি রেক নাহি রুপ ছিল বন্নচিন্*
রবি সসী নাহি ছিল রাতি দিন।।

৩। সেক শুভদয়া (কয়েকটি বাংলা গান)

রচয়িতা ঃ হলারুধ মিশ্র

উদাহরণ ঃ

আশে পাশের শ্বাস করে উপহাস।
বিনা বায়ুতে ভাঙ্গে তালের গাছ।
ভাঙ্গিল তাল লুম্ভিল রেখা
চল জাই সখি পলাইল শঙ্কা।

৪। চতুরাভরন (বাংলা অপভ্রংশ মিশ্রিত ছড়া)

রচয়িতা ঃ ভুসুক পাদ

উদাহরণ ঃ *সুরকার ছাড়ি ন যাই*
সো দুর যোগী এ ন জানিহ খোজ।
গুরু নিন্দা করি যোগ।

৫। মানসোল্লাস (সংস্কৃত বিশ্বকোষে উল্লেখিত কয়েকটি শ্লোক)

রচয়িতা ঃ আচার্য হেমচন্দ্র

উদাহরণ ঃ

আদি শব্দ	বর্তমান শব্দ
অল্লট্ট পল্লট্ট	উল্টা পাল্টা
ভল্লু	ভালুক
হড্ড	হাড়

৬। টীকাসর্বস্ব

রচয়িতা ঃ বন্দ্যঘর্টীয় সর্বানন্দ

উদাহরণ ঃ

আদি শব্দ	বর্তমান শব্দ
খড়কি	খিড়কি
পরসু	পরশু
বেঙ্গ	বেঙ

৭। নাথগীতিকা, লোককথা, ছাড়া প্রবাদ।

ডাক ও খনার রচনা ঃ

১) হাত বিশ করে ফাঁক
আম কাঁঠাল পুতে রাখ।

[সংগৃহীত ও সংকলিত]

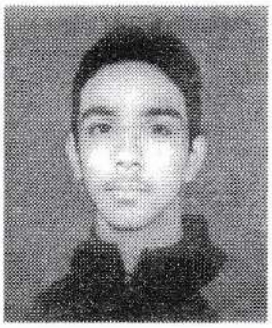

দি লেক অব নো রিটার্ন

মোঃ ইয়ামান হানিফ

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ২৯ বিভাগ ঃ ব্যবসায় শিক্ষা

দি লেক অব নো রিটার্ন- নামটি শুনলেই শরীর শিহরিত হয়। রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগে। আসলে খুবই রহস্যময় স্থান এটি। আমাদের এই পৃথিবী অতুলনীয় ঐশ্বর্য ও স্বচ্ছ সৌন্দর্যের আঁধার। কিন্তু এর মাঝে ও লুকিয়ে আছে রহস্যের জাল। পৃথিবীর এসব রহস্যময় অঞ্চল সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। তন্মধ্যে বিখ্যাত (বা কুখ্যাত) বারমুডা ট্রায়াঙ্গল সম্পর্কে কম বেশি আমরা সবাই জানি। আজও এর রহস্যের কুজ ঝটিকা উন্মোচিত হয় নি। তেমনই এক রহস্যমময় স্থান "দি লেক অব নো রিটার্ন"।

"দি লেক অব নো রিটার্ন" একটি ছোট হ্রদ যা মায়ানমারের (বার্মার) উত্তর দিকে অবস্থিত। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এই হ্রদটির নামকরণ করেছিলেন। যার অর্থ-যে হ্রদ থেকে ফেরা যায় না। এর নাম থেকেই এই রহস্যময় দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। এই রহস্যময় হ্রদটির উপস্থিতি প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। ১৯৪৩ সালে এই অঞ্চলে একটি রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সেই সময়ই এই হ্রদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রকাশিত হয়। সেই হ্রদে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেসব মিলিটারী ফোর্স পাঠানো হতো, সেই ফোর্সগুলো লেকের কাছাকাছি "পাভাস" নামক জায়গা অতিক্রম করার সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে যেত। এই অলৌকিক হ্রদের রহস্য বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মতো আজও উদঘাটিত হয়নি। এর অলৌকিক ক্ষমতার কারণে এ অঞ্চলে লোকজনের পদচারণ প্রায় হয় না বললেই চলে।

এ অঞ্চলের এসব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর কয়েকজন লোক বিশেষ অনুমতি নিয়ে হেলিকপ্টারে করে এ অঞ্চলের উপর একটি বিশেষ সমীক্ষা চালান যার ফলাফল নিতান্ত বিস্ময়কর। তারা জানান যে, উক্ত অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে এবং দ্রুত পরিবর্তিত হয়। তাই এটি সত্যি টলটলে পানি, না পরিত্যক্ত জলাভূমি, না একখন্ড জঙ্গলপূর্ণ অঞ্চলতা সঠিকভাবে বলা যায় নি। কাজেই বোঝা যাচ্ছে এর পরিবর্তন কত রহস্যময়!

অনেক হেলিকপ্টার আরোহী জানান যে, এক লেক পূর্ণযৌবন দানে সক্ষম। তাঁরা এই হ্রদের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় বিস্ময়কর ভাবে পূনরায় যৌবন প্রাপ্ত হন। একজন হেলিকপ্টার চালক জানান যে, যখন তিনি ঐ লেকের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর শরীরের সাদা লোমগুলো কালো হয়ে যায়। কিন্তু সেখান থেকে চলে আসার পর সেগুলো আবার সাদা হয়ে যায়। অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের বাইরে আসলে প্রাপ্ত যৌবন হারিয়ে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে।

ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা (বার্মিজ ও ভারতীয়) জানিয়েছেন যে, রাতে ঐ অঞ্চল থেকে অনেক দুর্বোধ্য শব্দ শোনা যায়। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ অঞ্চলের নৈসর্গিক দৃশ্যের ছবি ক্যামেরায় কখনও ধরা যায় নি। এমনকি "পাভাস" থেকে অঞ্চলটি স্পষ্ট দেখা গেলেও সেখান থেকেও ক্যামেরায় কোন স্পষ্ট ছবি উঠেনি। ক্যামেরায় ঐ অঞ্চলের ছবি তুলবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞের ধারনা ঐ পুরো অঞ্চলে কোন অনাবিষ্কৃত রহস্যময় রশ্মি সর্বদা বিকিরিত হচ্ছে যার ফলে ক্যামেরায় ছবি তোলা সম্ভব হয় না।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উত্তোরোত্তর উন্নয়নের ফলে মানুষ পৃথিবীর বাইরে মহাকাশের বুকে পা রেখে রহস্য ভেদ করছে। কিন্তু এই পৃথিবীতেই এসব রহস্যময় স্থানে বিজ্ঞানের উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করেও মানুষ রহস্যভেদে সক্ষম হয়নি। ভাবতেই কি অবাক লাগে, তাই না???

নামায সম্পর্কীয় হাদিস

মোঃ ফিরোজ

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ খ, বিভাগ ঃ বিজ্ঞান

হাদীস ঃ নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযু করে অতঃপর ফরয নামায পড়ে আল্লাহ্তালা তার ঐ দিনের ঐ সমস্ত গোনাহ্ যাহা চলাফেরার দ্বারা হইয়াছে, যাহা হাতের দ্বারা করিয়াছে, যাহা কানের দ্বারা হইয়াছে, যাহা চক্ষু দ্বারা করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত গোনাহ যে গুলির খেয়াল অন্তরে পয়দা হইয়াছে সবই মাফ করিয়া দেন।

হাদীস ঃ সব চাইতে নিকৃষ্ট চোর ঐ ব্যক্তি যে নামাযের মধ্যে চুরি করে, অর্থাৎ রুকু ও সিজদাহ্ ঠিক মত আদায় করে না।

হাদীস ঃ হুযুর নবী করীম (সঃ) যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি নামাযে মনোনিবেশ করিতেন।

হাদীস ঃ নবী করীম (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামায ছুটিয়া গেল, তাহার যেন পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবকিছু লুট হইয়া গেল।

হাদীস ঃ নবী করীম (সঃ) বলেন, যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন ফেরেশতা একজন এসে বলে হে আদম সন্তান উঠ এবং জাহান্নামের যে আগুন তোমরা (নিজের গোনাহের কারণে) নিজেদের ওপর জ্বালান শুরু করিয়াছ তাহা নিভাও। (আংশিক)

হাদীস ঃ হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, একবার শীতকালে হযরত নবী করীম (সঃ) বাহিরে তশরীফ আনিলেন তখন গাছ থেকে পাতা ঝরিতেছিল। তিনি গাছের একটি ডাল ধরিলেন, ফলে উহার পাতা আরও বেশি করিয়া ঝরিতেছিল। তিনি বলিলেন, হে আবু বকর! মুসলমান বান্দা যখন এখলাসের সাথে নামায পড়ে তখন তার গোনাহ্সমূহ এই গাছের পাতার মত ঝরিয়া পড়ে।

হাদীস ঃ নবী করীম (সঃ) বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ এরূপ যেমন, কাহারও দরজার সম্মুখে একটি নহর আছে, যাহার পানি প্রবাহমান এবং খুব গভীর উহাতে সে প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এর অর্থ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের ছগীরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার দরুন।

হাদীস ঃ হুযুর (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ফজর ও এশার নামায জামাতের সাথে পড়ে সে যেন সারা রাত্র দাড়িয়ে এবাদত করার ছওয়াব হাসিল করল।

হাদীস ঃ হুযুর (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি—

১) ফজরের নামায পড়ে তাহার চেহারায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় ও নূরাণী হয়।

২) যোহরের নামায পড়ার দ্বারা সংসারে আয়-রোজগার বৃদ্ধি পায়।

৩) আছরের নামায পড়ার দ্বারা তার স্বাস্থ্য ঠিক থাকে।

৪) মাগরীবের নামায পড়লে তার সন্তান-সন্ততি তার কাজে আসে।

৫) এশার নামায পড়ার দ্বারা ঘুমে পরিতৃপ্তি আসে।

হাদীস ঃ নবী করীম (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করিয়া নামাযের জন্য মসজিদে

গমন করিয়া দেখে যে নামায শেষ হইয়া গিয়াছে তবুও সে জামাতের সহিত নামায আদায় করিয়া সওয়াব পাইবে। জামাতে নামায আদায়কারী হইতে কোন অংশে কম সওয়াব পাইবে না।

হাদীস ঃ নবী করীম (সঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হইবে। যদি উহা ভাল ও পরিপূর্ণ পাওয়া যায় তবে অন্যান্য আসল ও সঠিক বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি উহা খারাপ হয়, তবে অন্যান্য আসল ও খারাপ বলিয়া গন্য হইবে।

হাদীস ঃ নবী করীম (সঃ) বলেন, যে নামায তোমাকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখিতে পারে না সে নামায, নামাযই নয়।

হাদীস ঃ নবী করীম (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সময়মত নামায আদায় করে, উত্তমরূপে ওযু করে, খশু-খুযুর সহিত পড়ে, ধীর স্থিরভাবে নামাযে দাড়ায়, রুকু-সেজদা ভালভাবে ও শান্তভাবে করে মোটকথা নামাযের সব কিছু উত্তমরূপে আদায় করে, তার নামায উজ্জ্বল ও নূরাণী হয়ে উপরে যায়। এবং নামাযীকে দোয়া দেয় যে, আল্লাহ্ তোমার এরূপ হেফাজত করুন, যেরূপ তুমি আমার হেফাজত করেছে। অপর দিকে যে ব্যক্তি মন্দভাবে নামায আদায় করে, সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখে না। তার নামায বিশ্রী ও কালো হইয়া বদ দোয়া দিতে দিতে যায়। আর বলে আল্লাহ্ তোমাকেও এরূপ ধ্বংস করুন যেরূপ তুমি আমাকে ধ্বংস করেছে।

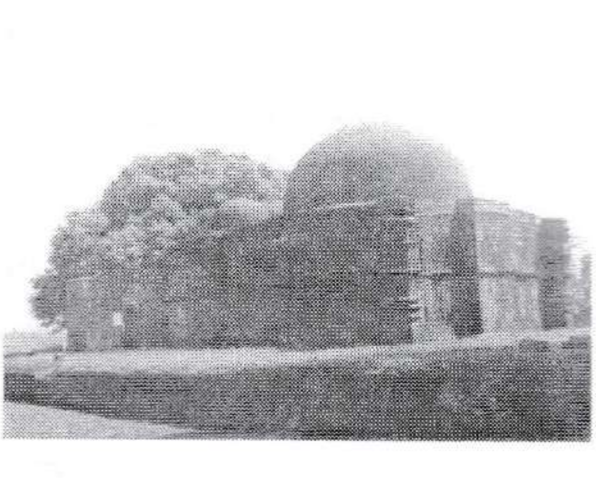

আটলান্টিস

মোঃ আসিফ খান

শ্রেণী ঃ ৬ষ্ঠ, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ২৪

পৃথিবীতে এমন বহু ঘটনা আছে যার কথা শুনলে মানুষ চমকে উঠে। এমনই এক ঘটনার নাম হলো আটলান্টিস। আটলান্টিস একটি শহর বা দেশের নাম। জায়গাটি এখন আর নেই। সে অনেক অনেক দিন আগের কথা।

আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে শহরটির অস্তিত্ব ছিল। শহরটির সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল শহরটি আটলান্টিক মহাসাগরের উপরে। দার্শনিক প্লেটো বলেছেন–এই শহর তার সময়ের তুলনায় এত উন্নত ছিল যে তার সময়ে মানুষেরা কল্পনাই করতে পারত না। অর্থাৎ প্লেটো দুই হাজার বছর আগের মানুষ হলে আমাদের তুলনায় তারা অনেক উন্নত ছিল। সেক্ষেত্রে বলা যায় আটলান্টিস শহরের সভ্যতা বর্তমান যুগের সভ্যতার কাছাকাছি। প্লেটো বলেছেন- শহরটিতে কৃত্রিম আলো তৈরির ব্যবস্থা ছিল। রাস্তা-ঘাট ছিল অনেক উন্নত। শহরের মধ্যে বাঁধের ব্যবস্থা ছিল আরও উন্নত। সবচেয়ে আশ্চর্য, প্লেটো বলেছেন-শহরের মানুষেরা পরস্পরের সাথে দূর থেকে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে কথা বলতে পারত যা বর্তমান টেলিফোনের উত্তর সুরি। তিনি আরও বলেছেন শহরে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর দূর পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র ছিল। কিন্তু ভাবার মত বিষয় হলো এত শক্তিশালী ও এত সভ্য হয়েও আটলান্টিস কেন ধ্বংস হল। দার্শনিক প্লেটো এর ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। তিনি এর ব্যাখ্যা করতে না পারলেও বর্তমানের ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভে বলেছেন- কোন আক্রমন নয় কিংবা তাদের নিজেদের মধ্যে মারামারির কারণেও আটলান্টিস ধ্বংস হয়নি। বরং সাগরের জলোচ্ছ্বাস বা পৃথিবীর অগ্নিগিরি ধূমকেতুর কারণে দেশটি ধ্বংস হয়ে গেছে। এই আটলান্টিস শহরের অস্তিত্ব নিয়ে বহু বিজ্ঞানীরা আজও সন্দেহ পোষন করেন।

[সংগৃহীত]

ডিস এন্টেনা আমাদের সংস্কৃতি সহায়ক নয়

মোঃ আরিফুর রহমান

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৩, বিভাগ ঃ ব্যবসায় শিক্ষা

বিজ্ঞানের নব নব অবদানে মানববিশ্ব অভূতপূর্ব উন্নতির শীর্ষ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছে। ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিস্ময়কর যোগাযোগ সাধিত হয়েছে। ফলে ঘরে বসে টেলিভিশনের মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে অবলোকন করা সম্ভব হচ্ছে। ডিস এন্টেনার সাহায্যে একাধিক টিভি চ্যানেলের দ্বারা বিভিন্ন টিভি কেন্দ্রীক অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ ঘটছে। আর্ন্তজাতিক জীবনে চেতনার ধারায় মেধা ও মননকে সমৃদ্ধ করতে হলে অবশ্যই ডিসের উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যাবে না। ডিস এন্টেনারে মাধ্যমে আন্তর্জাতিক চ্যানেলে যেসব দেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করি তা আমাদের বিশ্ব সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। ডিসের মাধ্যমে আমরা প্রতি মূহূর্তে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের খবর পেয়ে যাচ্ছি। ডিস এন্টেনা আন্তর্জাতিক জীবন চেতনার ধারায় মেধা ও মনন মজবুত করে। শিক্ষা ও জীবন যাত্রার প্রতিযোগীতায় নামার জন্য ডিসের মাধ্যমে প্রচারকৃত অনুষ্ঠান আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়। ডিসের ইন্টারনেট শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অভিনব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছে এবং জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করছে। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এত কিছু থাকতে ডিস এন্টেনা কিভাবে আমাদের সংস্কৃতির সহায়ক হয়। এর উত্তরে আমি বলব আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক প্রবাহ যে চলছে এসব চ্যানেলের সাহায্যে তা প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করা সম্ভব হচ্ছে। অনেক ব্যয় সাপেক্ষ অনুষ্ঠানমালা আমরা স্বল্প খরচে অতি সহজেই উপভোগ করতে পারছি। আমাদের মত গরিব দেশের লোকের জন্য এর চেয়ে বড় সুবিধা আর কি হতে পারে। ডিস এন্টেনা পৃথিবীর নানান দেশের জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করায়। বিবিসি, সিএনএন এর মতো তথ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের নানা প্রান্তের তথ্য ও ঘটনা সম্পর্কে মুহূর্তেই অবহিত হতে পারি।

বিশ্বের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো সঙ্গে সঙ্গে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। ন্যাশনাল জিওগ্রাফী ও ডিসকভারী চ্যানেলের অনুষ্ঠান থেকে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের জানার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে। স্যাটেলাইট টিভির মাধ্যমে বিশ্ব সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রচিত হচ্ছে। একুশ শতকের প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে পদক্ষেপ রাখার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছে। বিশ্ব বিখ্যাত অনেক চলচ্চিত্র ও অনুষ্ঠান আমরা খুব সহজেই ঘরে বসে দেখতে পারছি। বর্তমানে স্যাটেলাইট টিভির বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে খেলাধূলা, ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, বাস্কেটবলসহ অনেক খেলা প্রচারের কয়েকটি নির্দিষ্ট চ্যানেল রয়েছে। এসব চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা আমাদের সংস্কৃতিতে উন্নতি লাভ করতে পারছি।

ভিন দেশী সংস্কৃতি মানেই অপসংস্কৃতি নয়। যে কোন সংস্কৃতি গ্রহণ করার সঙ্গে আমাদের ভেবে নিতে হবে যে তা আমাদের সহায়ক হবে কি না? যে কোন জাতিই নিজস্ব সংস্কৃতিতে উন্নত হতে পারে না। সংস্কৃতিকে উন্নত করতে অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। আর ডিস এন্টেনাই আমাদের সংস্কৃতিকে আধুনীকিকরনের মাধ্যমে বিকশিত করছে।

আমরা ইচ্ছে করলেও বর্তমানে পুরনো জেনারেশনে ফিরে যেতে পারব না। জীবনের দাবিতে সভ্যতার অনেক সংস্কৃতির উপাদানই আমাদের চাহিদা সূচির অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। কিন্তু এই ডিস এন্টেনার মাধ্যমেই আমরা পুরানো সংস্কৃতিকে বহির্বিশ্বে পরিচিত করতে পারছি।

শিক্ষাক্ষেত্রে কোচিং প্রক্রিয়া প্রকৃত মানুষ গড়তে পারে না

মোঃ ইমরান হোসেন চৌধুরী

শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ২

ভূমিকা ঃ আদিম যুগ থেকে কতগুলো ধাপ পেরিয়ে মানুষ সভ্যতার এই স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। মানব সমাজ তাদের জ্ঞান স্পৃহা মেটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত হবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং তারা অনেকাংশে সফলতা ও লাভ করছে। মানুষ এক সময় বর্বর ছিল। তা থেকে তারা নিজ নিজ প্রয়োজনে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার করেছে যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, সংকলিত। ভাষাগত দিক থেকে ভিন্ন রূপ লাভ করে বর্তমান স্তরে অবস্থান করছে। যার মধ্যে মানুষের মৌলিক চাহিদা শিক্ষা বিদ্যমান। শিক্ষার মাধ্যমেই মানব সমাজ জাতিগত দিক থেকে উন্নতি করতে সচেষ্ট হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষা ঃ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে একটি সভ্য মানব সমাজ। এই আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন মানব বিবর্তনের একটি চরম উন্নতি জাতি। মূলত আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা ৪টি স্তরে বিদ্যমান। এগুলো হলো ঃ

১) প্রাথমিক স্তর—১ম থেকে ৫ম শ্রেণী।

২) নিম্ন মাধ্যমিক স্তর—৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী।

৩) মাধ্যমিক স্তর—৯ম থেকে ১০ম শ্রেণী।

৪) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর—কলেজ এবং বিশ্বদ্যিালয়।

বাংলাদেশে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। যথাঃ

১) সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা।

২) মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা।

আধুনিক শিক্ষার প্রেক্ষাপটে সাধারণ দৃষ্টি কোন থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এ দেশে গড়ে ওঠা স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর মধ্যে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর আকর্ষন থাকে অধিকতর উন্নত বিদ্যালয়গুলোর দিকে। ফলে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় প্রতিযোগিতা। যার ফলে বর্তমান সময়ে সৃষ্টি হয়েছে বিকল্প ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা যার নাম কোচিং সংস্কৃতি।

শিক্ষা ব্যবস্থায় কোচিং ঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে কোচিং শব্দটি নতুন সংযোজন। কোচিং সেন্টারগুলোতে ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন শিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তির জন্য ধারণা পায়। আর এ সুযোগ লুফে নেয় এ সকল কোচিং সেন্টার। তারা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এ সকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে একটি সমক্ষ ধারণা প্রদান করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে কাচিং সেন্টার এখন পর্যন্ত ততটা গ্রহণ যোগ্যতা অর্জন করেনি। এক শ্রেণীর বক্তব্য হচ্ছে কোচিং ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তক সীমিত করে কেবল কিছু ঈষৎ শিক্ষা দেয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা হয়তো বা পরীক্ষায় পাশ বা ভাল নম্বর পেতে পারে কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা গ্রহন থেকে তারা বঞ্চিত হয়। তাদের মতে কোচিং শিক্ষা গ্রহনে বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে এবং তা ব্যধির মত দেখা দিয়েছে। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা এ সকল কোচিং সেন্টার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহনে পথের কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিকল্প দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে আমাদের দেশে বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষাদান প্রকৃতভাবে হয় না। ফলে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীরা আগ্রহী কোচিং সেন্টারের প্রতি।

সেখানকার অভিজ্ঞ শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও মেধার বিকাশের সমন্বয়ের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করছে ও তার ফলাফল ভোগ করছে পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের মাধ্যমে।

মূলত প্রকৃত বা পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে একজন নিজেকে তখনই প্রকাশ করতে পারে যখন সে সকল শাখার কিছু পরিমান জ্ঞান রাখে এবং কেবল কেতাবী শিক্ষা নয়। প্রকৃত অর্থে ব্যবহারিক শিক্ষায় নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তোলে এবং মানবিক গুনাবলীগুলো অর্জনে সক্ষম হয়।

তাছাড়া অন্য দৃষ্টিকোন থেকে তাকালে দেখা যায় যে, কোচিং সেন্টারগুলো অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। ফলে তারা পড়ালেখার নামে ব্যবসা খুলে বসে। আর এতে নষ্ট হয় ছাত্র-ছাত্রীদের সুন্দর জীবন।

আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিয় জীবনে শিক্ষা ক্ষেত্রে কোচিং প্রক্রিয়া অপরিহার্য নয়। আবার একেবারেই অপ্রয়োজনীয়ও নয়। ব্যক্তি স্বার্থে জীবন গড়তে শিক্ষা অর্জনে ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে কোচিং সেন্টারগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। শতভাগ হিসেবে কোন মানুষ সফলতা পায় না। তবে সে যদি শিক্ষায় নিজ জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তবে কোচিং সেন্টার ঈষৎ হলেও অবদান রাখে।

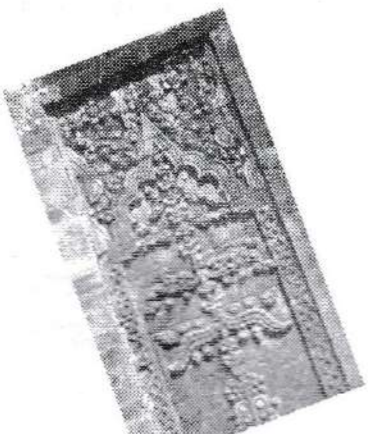

স্কাউটঃ হাইকিং

মোঃ জহিরুল ইসলাম

শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৪১

হাইকিং খুব মজাদার। এটি এক ধরনের খেলা। এই খেলায় প্রত্যেক দল বিভিন্ন রঙের পতাকা পাবে। যে দল যে রঙের পতাকা পাবে, সেই পতাকার রং অনুযায়ী যে চিহ্ন থাকবে সে দিকে যেতে হবে। তখন এক সময় একটি গন্তব্য থাকবে। সেখানে পৌঁছাতে হবে। পৌঁছানোর পর একটি গাছে বিভিন্ন রং এর চিঠি থাকবে। যার যে রং সে সেই রঙের চিঠি নেবে এবং সেই চিঠিতে দু'টি কাগজ থাকবে। একটি কাগজে দিক নির্দেশ এবং হাটার পরিমাণ লিখা থাকবে। অন্য একটি কাগজে একটি ইংলিশ পত্র যার মধ্যে লিখা থাকবে তোমাকে এই পর্যন্ত আসার জন্য ধন্যবাদ। তোমাকে কষ্ট করে আরো হাটতে হবে। যদি হাটতে না পার তাহলে তাবুতে ফিরে যাও। না যাওয়াটাই মঙ্গলজনক কারণ এই খেলা থেকে চলে আসলে নম্বর কাটা যাবে। তাই যেতে হবে। এখানে আরেকটি কাজ করতে হবে। তা হল প্রথম থেকে যেভাবে শুরু করা হয়েছে তার পুরো একটি মানচিত্র আঁকতে হয়। চারপাশে যা আছে তাও কিছুটা আঁকতে হবে। প্রথমে থাকে ডিগ্রী। ঐ ডিগ্রী মাটিতে রেখে কাটাকে উত্তর দক্ষিণ দিক করে দেখতে হবে। তাতে যে দিক চিহ্নিত থাকবে সেই দিকে মানচিত্র বসিয়ে হাটতে হবে। এরপর পায়ের কদম লিখা থাকবে। তা দেখে সেই অনুযায়ী হাটতে হবে। এক সময় হাটতে হাটতে গন্তব্য এসে পড়বে। গন্তব্যের পথে অনেক খাদ থাকবে। কোন দল খাদে পড়লে সেই দল বাদ হয়ে যাবে। তাই খাদ দেখে রাস্তা সাবধানে পার হতে হবে। এরপর গন্তব্যে পৌছালে পতাকা, মানচিত্র, চিঠি ও অন্য একটি কাগজে নাম লিখে ফেরত দিতে হবে।

আদর্শ সমাজ গঠনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর অবদান

হাফেজ মোঃ ওবায়দুল্লাহ্

সহকারী শিক্ষক

প্রাক-ইসলামী যুগে সামাজিক ক্ষেত্রে আরবরা ছিল চরম বর্বরতা, কুসংস্কার ও অরাজকতায় নিমজ্জিত, মানবতা ছিল ভুলুণ্ঠিত মানব জাতি ছিল এক মহামানবের অপেক্ষায়, ঠিক তখনই মহান আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বন্ধু সর্ব কালের সর্ব শ্রেষ্ঠ মহামানব, মানবতার মহান শিক্ষক, আরববাসী তথা বিশ্ব বাসীর পথ প্রদর্শক বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত রাহমাতুল্লীল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে এই ধরাধামে প্রেরণ করেন। স্বল্প কালের মধ্যেই তিনি আরবে এমন এক আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন যা সর্বকালের মানুষের জন্য অনুকরনীয় ও অনুসরনীয়। এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ—

(১) গোত্রীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঃ প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ছিল অত্যন্ত প্রকট। সামান্য কারণেই গোত্রে গোত্রে ভয়াবহ যুদ্ধ লেগে যেত এবং তা দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী হত। মহানবী (সাঃ) সকল গোত্রীয় সংঘাত ও যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন।

(২) হিলফুল ফুযুল গঠন ঃ নবুয়্যাত প্রাপ্তির অনেক আগে মাত্র ১৪ বছর বয়সে মুহাম্মদ (সাঃ) এর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল কায়েস ও কুরাইশদের মধ্যে অনুষ্ঠিত "হারবুল ফিজার" বা অন্যায় যুদ্ধের বিভীষিকাময় করুন দৃশ্য দেখে। অতঃপর তিনি শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে "হিলফুল ফুযুল" বা শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান জাতিসংঘ এই হিলফুল ফুযুলের নিকট অনেকাংশে ঋণী। তবে পার্থক্য এই যে বর্তমান জাতিসংঘ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনেকাংশ ব্যর্থ আর হিলফুল ফুযুল ছিল সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফলকাম।

(৩) সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ ঃ আরবদের সমাজ জীবনে যখন ছিল জন্ম ও বংশগত প্রাধান্য এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের সৃষ্ট বৈষম্য বিরাজিত। তখন মহানবী (সাঃ) ই সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যে সাম্যের শাশ্বত বাণী ঘোষণা করেন 'মানুষ মাত্রই সমান'।

(৪) কালো পাথর স্থাপন ঃ কুরাইশদের মধ্যে কালো পাথর সংস্থাপন নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে বিচারের ফয়সালা মহানবী (সাঃ) এর উপর ন্যস্ত করা হল। যুবক আল আমীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অত্যন্ত বিচক্ষনতার সাথে শান্তিপূর্নভাবে এর মীমাংসা করে দিলেন। তার বুদ্ধিমত্তার ফলে বিরাট অনিবার্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধ হল।

(৫) মদীনা সনদ ঃ মহানবী (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পর সেখানকার অধিবাসী ইহুদী, খৃষ্টান ও মুলসমানদের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৪৭টি শর্ত সম্বলিত একটি সনদ প্রনয়ন করেন। ইহাই ইতিহাসে মদীনা সনদ নামে পরিচিত। যা বিশ্বের সর্ব প্রথম লিখিত সংবিধান।

(৬) কন্যা সন্তান হত্যা রোধ ঃ প্রাক ইসলামী যুগে আরবরা দারিদ্য ও অপমানের ভয়ে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। কারণ কন্যা সন্তানের জন্ম নেওয়াকে তারা অপমান মনে করত। মহানবী (সাঃ) সমাজ থেকে কন্যা হত্যার মত জঘন্য অপরাধ রোধ করে একটি প্রগতিশীল সমাজ গঠন করেন।

(৭) নারীর মর্যাদা ঃ প্রাক ইসলামী যুগে নারীরা ছিল অবহেলিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, পরাধীন ও অসহায়। পরিবার ও সমাজে তাদের কোন মূল্য ছিল না। স্বামী ও পিতার সম্পদে ছিলনা তাদের কোন অধিকার। মহানবী (সাঃ) তাদেরকে এসব দূর্গতি ও দূর্দশা থেকে মুক্ত করে ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেন।

(৮) দাস প্রথা উচ্ছেদ ঃ তৎকালীন আরবে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। পশুর ন্যায় তাদেরকে বাজারে বিক্রি করা হত। দাসীরা মনিবের উপপত্নী রূপে ব্যবহৃত হত। মহানবী (সাঃ) ই বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম দাস প্রথা উচ্ছেদ করেন আর বলেন "দাস দাসীকে আযাদ করার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কাজ আল্লাহ্‌র কাছে আর কিছু নেই"।

(৯) ভিক্ষাবৃত্তির অবসান ঃ তৎকালীন আরব সমাজে ভিক্ষা বৃত্তির প্রচলন ছিল। মহানবী (সাঃ) ভিক্ষা বৃত্তিকে অত্যন্ত ঘৃনার চোখে দেখতেন। তিনি মনে করতেন গায়ে শক্তি থাকতে ভিক্ষা করা লজ্জাজনক ব্যাপার। তাই তিনি ভিক্ষা বৃত্তির অবসান কল্পে সমাজের প্রত্যেককে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য পরিশ্রমের পরামর্শ দেন। কবির ভাষায় "নবীর শিক্ষা করনা ভিক্ষা মেহনত কর সবে"।

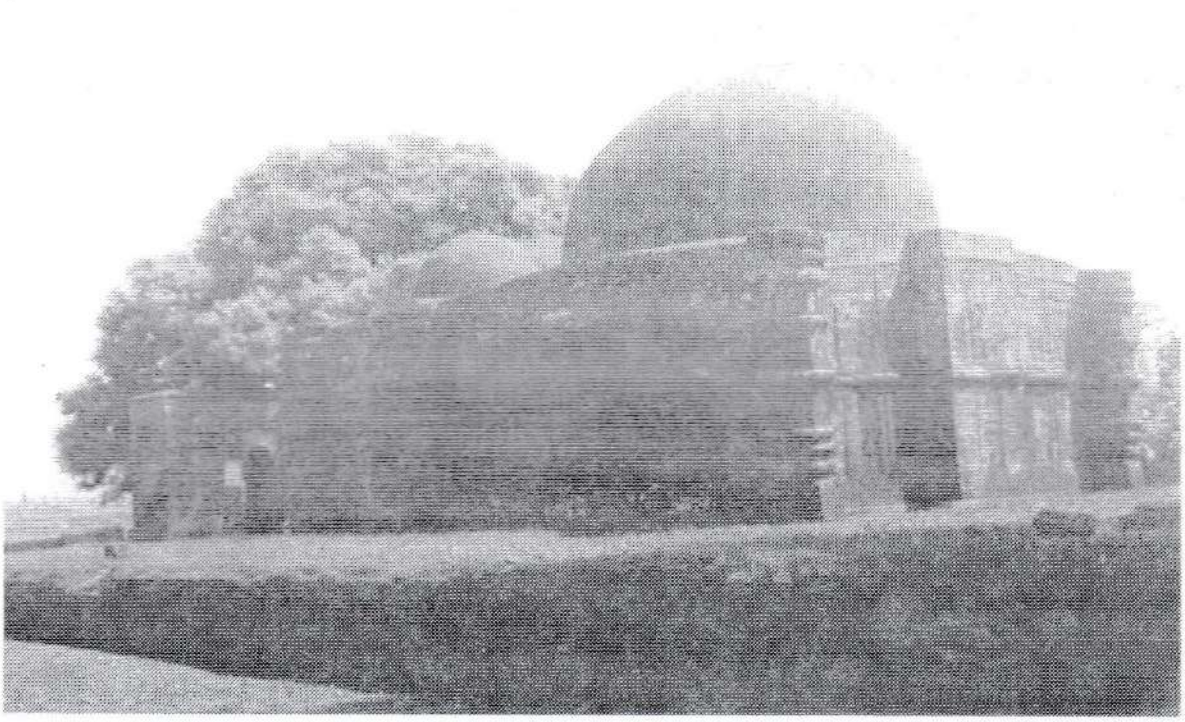

(১০) প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ঃ তৎকালীন আরব সমাজে সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কেউ বিপদে আপদে কারো প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করত না। তাই প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মহানবী (সাঃ) বলেন—"যার প্রতিবেশী তার অন্যায় অত্যাচার থেকে রক্ষা পায় না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

(১১) আত্মীয় স্বজনের অধিকার প্রতিষ্ঠা ঃ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী আরবরা যাতে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে তাদের অধিকার আদায় করে সে জন্য মহানবী (সাঃ) বলেন— "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না"। তিনি আরো বলেন—যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকে সেখানে আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয় না।

(১২) শান্তি প্রতিষ্ঠায় হুদাইবিয়ার সন্ধি ঃ মহানবী (সাঃ) সাথীদের নিয়ে কাবা শরীফে হাজ্জ করতে রওয়ানা হন। কিন্তু মহানবীর চির দুশমন কুরাইশরা তাকে মক্কা প্রবেশে বাধা দেয়। মহানবী (সাঃ) শক্তি খাটিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে পারতেন। কিন্তু শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যার ফলে আরব বিশ্বে যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১৩) ক্ষমার উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন ঃ শত অত্যাচার, নির্যাতনে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে, বহু যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে অনেক সাথীকে শহীদ করে, যারা প্রিয় নবীজী (সাঃ) কে আজীবন সীমাহীন দুঃখ কষ্ট দিয়েছিল।। মাত্র আট বৎসরের মাথায় বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে অত্যন্ত সুকৌশলে মহানবী (সাঃ) মক্কা বিজয় করেন। তিনি বিজয়োত্তর মক্কার কাফির 'মুশরিক', 'কুরাইশ' তায়েফবাসী ও অন্যান্য গোত্রের প্রতি কোন প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ঘোষণা করেন "যাও তোমরা সকলে আজ হতে মুক্ত" দুনিয়ার ইতিহাসে এ একটি ক্ষমার অনুপম বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

(১৪) বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত ঃ ভাবতে অবাক লাগে যে আধুনিক বিশ্বের জাতিসংঘ সেদিনকার শান্তি সংঘ (হিলফুল ফুযুল) এর কাছে অনেকাংশ ঋণী। ধর্মের প্রতি যেমন মহানবী (সাঃ) ছিলেন পরম সহিষ্ণু তেমনি পররাষ্ট্রের প্রতিও তার নীতি ছিল শান্তি সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য তিনি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, অশান্তিময় বিশ্ব সমাজে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে কলুষ মুক্ত সামাজিক শিক্ষা ও সংস্কারের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তার একাগ্র সাধনায় আরব সমাজ থেকে সকল অনাচার দূরীভূত হয়। আর আরব জাতি একটি সুসভ্য ও প্রগতিশীল জাতিতে পরিনত হয়। মহানবী (সাঃ) এর একক সাধনায় গঠিত জাতি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগ পরিবর্তিত হয়ে উপাধি পেয়ে ছিল, আহুরুজ জাহাবীয়্যাহ বা সোনালী যুগ।

যে কোন খারাপ কাজের পরই ভাল কাজ করো, যাতে সেটা খারাপটাকে মুছে দেয়।
-আল হাদীস

শিক্ষা ও উন্নয়ন

মোঃ হামিদুল হক

সহকারী শিক্ষক

যে অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে মানুষের আচরণের কাঙ্খিত ও সমাজস্বীকৃত পরিবর্তন ঘটে তা শিক্ষা।

শিক্ষা মানব জীবনের এক মূল্যবান সম্পদ। যা ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক সকল ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপযোগী ব্যক্তিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নৈপুণ্য ও কর্মদক্ষতার সাথে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত থেকে মানুষ তাঁর অর্জিত জ্ঞান দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলো পরবর্তী বংশধরদের কাছে উপস্থাপন করার প্রক্রিয়াই শিক্ষা। শিক্ষার প্রধান কাজ হল মানুষের মাঝে সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করে তাকে জ্ঞান দক্ষতার সহায়তায় সক্রিয় মূল্যবোধ করিয়ে জাতীয় লক্ষ্যে পৌছার সকল দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া। এ ছাড়া শিক্ষা যে কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুনত্বের সন্ধান লাভে মানুষকে সহায়তা দান করে এবং তার জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করে নতুন প্রয়োজন মিটাতে পারে। শিক্ষা জীবন ব্যাপী অভিজ্ঞতার উন্নয়ন ও সঞ্চয়ন। এ জন্য বলা হয়— Man Learns from cradle to the Grave আপন প্রতিভা এবং সুযোগ অনুসারে মানুষ দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করে থাকে। শিক্ষাকে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমনঃ

১) সক্রেটিস এর মতে, "শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিষ্কার।"

২) প্লেটোর মতে," শরীর ও আত্মার পূর্ণতা সাধনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাই হলো শিক্ষা।"

৩) এরিস্টটলের মতে," শিক্ষার সত্যিকার লক্ষ্য ধর্মের পবিত্রতার মধ্য দিয়ে সুখ লাভ করা।"

৪) পেস্টালজীর মতে," একই সাথে শরীর ও মনের পূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য।"

৫) রুশো এর মতে," সু-অভ্যাস গঠনের নাম শিক্ষা।"

৬) জন ডিউই এর মতে," শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো আত্মোপলব্ধি।"

৭) হোয়াইট হেড এর মতে," জ্ঞান প্রয়োগের কলাকৌশল্ অর্জন করাই শিক্ষা।"

উন্নয়ন একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। উন্নয়ন শব্দটির সমার্থক শব্দ উন্নতি, প্রগতির তথা পরিবর্তন। কারো মতে উন্নয়ন বলতে বুঝায় শিল্পায়ন, কারো কাছে স্বাধীনতা অর্জন, কারো কাছে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনতা অর্জন। কেউ বলেন উন্নয়ন হচ্ছে আকাশচুম্বী অট্টালিকা, গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর। কেউ বা চায় তাৎক্ষনিক বিশ্ব জুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জেট প্লেনে যাতায়াত। এক সময় উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বোঝান হতো। অর্থনীতিবিদদের মতে, উন্নয়ন

মানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশকে আধুনিকায়ন এর দিকে নিয়ে যাওয়া। মূলত তারা দেখতে চায় দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি। অর্থাৎ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে গেলে উন্নয়ন হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নই জাতীয় উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি নয়। বিভিন্ন শিক্ষাবিদাগণ জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ জাতীয় উন্নয়ন বলতে সামগ্রিকভাবে পুঁজি সঞ্চয়নকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে সঞ্চিত পুঁজি বন্টনের বিষয়টি আদৌ গুরুত্ব পায়নি। অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৎকালীন প্রকশারা মনে করেন মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধিই হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন। বিভিন্নজন উন্নয়নকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমনঃ

১। শুমপিটারের মতে "উন্নয়ন হলো বাহ্যিক উদ্দীপনার ফলশ্রুতি।"

২। নাটার এর মতে, "উন্নয়ন হলো প্রচ্ছন্ন উৎপাদনের একটি প্রসারন।"

৩। কিন্ডার বার্গার ও হেগেল এর মতে, "উন্নয়ন হচ্ছে কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি।"

৪। ডঃ ইউনূস এর মতে, "নিচের অধিকাংশ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা অর্থাৎ যিনি অন্যের চেয়ে মত বেশি নিচে তিনি তত বেশি অগ্রাধিকার পাবেন।"

৫। প্রফেসর অমর্ত্যসেন এর মতে, "উন্নয়ন হলো জনগণের ক্ষমতার বিকাশ।" যে দেশের মানুষ, মৌলিক শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষায় বেশি শিক্ষিত, সে দেশ তত বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধ উন্নয়নের শিক্ষা হলো ঃ

১। মানুষের নিজের ও সমাজ সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে শেখা।

২। সামাজিক সমস্যার বিশ্লেষন করতে শেখা।

৩। বিশ্লেষনের মাধ্যমে সমাজ কাঠামোর সবল ও দুর্বল দিকগুলো বের করতে শেখা।

৪। সমস্যার কারণ ও সমাধান খুঁজে বের

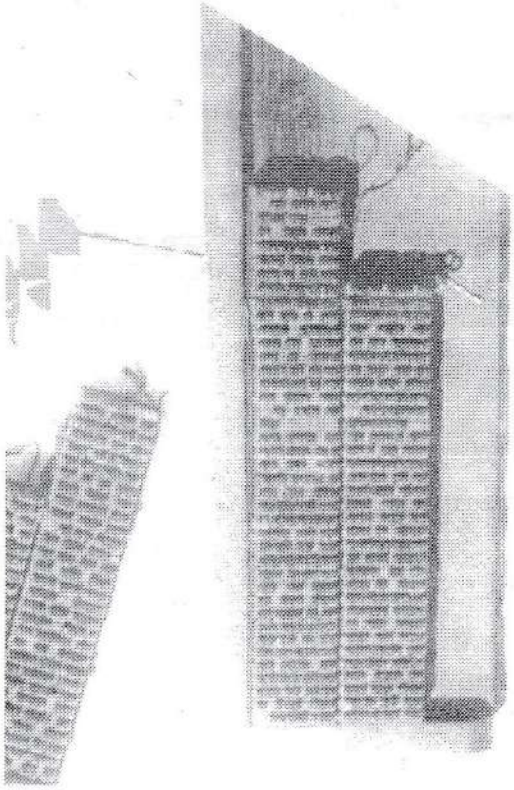

করতে শেখা।

অতএব, উপরিউক্ত সংজ্ঞা ও আলোচনার আলোকে বলা যায় যে জাতির উন্নয়ন হচ্ছে একটি অব্যাহত পরিবর্তন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটবে, সঞ্চয় বাড়বে, সম্পদের সুসম বন্টনের দ্বারা বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নূন্যতম মৌলিক চাহিদা পূরন করা সম্ভব হবে। জাতীয় আয় যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরন করতে সমর্থ হয়, তবে তাকেই প্রকৃত উন্নয়ন বলা যাবে।

উপরোক্ত মতবাদ এর পরিপেক্ষিতে বলা যায় যে, শিক্ষা মানব জাতির উন্নতির অবলম্বন। শিক্ষা ও উন্নয়নের আলোচনা থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, শিক্ষার সাথে উন্নয়নের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। শিক্ষা ও উন্নয়ন শব্দ দুটো একটি

জাতীয় উন্নয়ন উপযুক্ত ভূমিকা রাখার জন্য শিক্ষা বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, চিকিৎসাবিদ, গবেষক, প্রশাসক, বিচারপতি, শিক্ষাবিদ ইত্যাদি তৈরি করে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে থাকে। কারণ, শিক্ষা কারিগরি ও প্রকৌশল জ্ঞানের বিকাশ ঘটায়। শিক্ষাই মানুষের রুচি, আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিতবর্তন করে নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমে পরিবর্তন আনয়নের পথ প্রশস্ত করে। শিক্ষাই দৈহিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটিয়ে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধান করে। অতএব, শিক্ষাই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। নিরক্ষরতা একজন ব্যক্তির জীবনে চরম অভিশাপ। নিরক্ষরতা মানুষ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত। শিক্ষা মানুষের জীবনকে উৎকর্ষ সাধন করে তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করে, মানুষের মনে আকাঙ্খা সৃষ্টি করে, সৃজনশীলতা বাড়িয়ে দেয়, চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা মানুষকে অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে, সমাজ সংস্কার ও জাতীয় পুণর্গঠনে সাহয্য করে জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহায়তা করে। যে জাতি শিক্ষায় মত এগিয়ে গেছে সে জাতি উন্নয়নেও তত এগিয়ে আছে। পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে, দেশের মানুষ যত বেশি শিক্ষিত, সে দেশ তত বেশি উন্নত। কাজেই দেখা যাচ্ছে শিক্ষাই হচ্ছে উন্নয়নের একটি প্রধান হাতিয়ার। দেশের প্রকৃত উন্নয়ন করতে হলে দেশের অধিকাংশ মানুষের জন্য শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার বাড়লে তাদের প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে।

মানুষ তাদের যাবতীয় ভুল ত্রুটির নাম দেয় অভিজ্ঞতা।-অস্কার ওয়াইল্ড

আরেকটির সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। একটি আর একটির পরিপূরক অর্থাৎ শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। আবার উন্নয়ন ছাড়া উপযুক্ত শিক্ষা সম্ভব হয় না। শিক্ষার মাধ্যমে উন্নয়ন দুদিক থেকে সম্ভব। যথাঃ—বৈষয়িক ও নৈতিক দিক। বৈষমিক মানে বিষয় সম্পদাদির উন্নয়ন আর নৈতিক দিক মানে মন মানসিকতার উন্নয়নের দিক। এ দুটো দিকের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন মানুষের জ্ঞান দক্ষতার মান ও মন মানসিকতার উন্নয়ন। শিক্ষার উপরই নির্ভর করে একটি দেশের উন্নয়নের মান। উন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য কেবল ঐ সব দেশের ধন সম্পদ দায়ী নয়। বরং দেশের জনগণের জ্ঞান দক্ষতা অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষার মানের অগ্রগতিই দায়ী। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতমানের শিক্ষাই উন্নত দেশের উন্নয়নের প্রধান কারণ।

শিক্ষাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির পথ সুগম করে। শিক্ষা মানুষকে তাঁর নিজ পরিবেশ ও সামর্থানুসারে উপযুক্ত পেশা ও বৃত্তির উপযোগী করে গড়ে তোলে।

একজন ভাস্করের কথা

মোঃ ময়নুল ইসলাম

সহকারী শিক্ষক

চারুকলা পাঠদানে আমরা দেশ ও দেশের বাইরের অনেক শিল্পীর নাম শুনে থাকি। বাইরের শিল্পীদের মধ্যে মাইক্যাল এঞ্জেলো, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি, ভ্যানগগ, হেনরী মাতিস হেনরী মুর, পাবলো পিকাসোসহ আরো অনেকের। দেশের শিল্পীদের মধ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, শিল্পী এস, এম, সুলতান ও শিল্পী কামরুল হাসানসহ আরো অনেকের। অবশ্য আরেকজনের নাম আমরা অনেকে জানি না। এই শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল, শিল্পী সুলতান বা কামরুলের সমসাময়িক না এদের একটু পরের সময়ের। এই শিল্পী গত এক দশকে পত্রিকার পাতায়, লেখকের লেখায়, সরকারী ও বেসরকারী মহলে যেভাবে আলোচিত হয়েছেন, তাতে করে তাঁর সৃষ্টিশীলতার চেয়ে ব্যক্তিগত জীবনের কল্পকাহিনী আবিষ্কৃত হয়েছে। শিল্পীর নাম নভেরা আহমেদ। তিনি ভাস্কর নভেরা আহমেদ নামে পরিচিত। তাঁর নামে জাতীয় যাদুঘরের একটি হল (মিলনায়তন) এর নামকরণ করা হয়েছে।

নভেরা আহমেদ ভাস্কর্য করতেন বলে তাকে ভাস্কর বলা হয়। ভাস্কর্য হলো ত্রিমাত্রিক রূপ যার মধ্যে থাকে। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের সমন্বয়ে ত্রিমাত্রিক রূপ। এভাবে দেখলে প্রায় সবকিছু ভাস্কর্যভূক্ত করা যায় কিন্তু ভাস্কর্যের ব্যাপারটা এমন না। ভাস্কর্যে ত্রিমাত্রিকতা আছে যা শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটা পাথর যখন রাস্তায় পড়ে থাকে তখন তা পাথরই মনে হবে যদিও পাথরটির ত্রিমাত্রিক রূপ থাকে। কিন্তু পাথর যদি নিজের মতো করে নিজের ভাবনা, নিজের কথা যুক্ত করে শূণ্য জায়গায় (স্পেস) উপস্থাপন করা হয় এবং এর ফলে পাথরটি উদ্দীপকের (দেখামাত্র যে মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়) ভূমিকা পালন করলে তখন তাকে ভাস্কর্য বলা হয়। এভাবে পাথর শিল্পের মর্যাদা পায়। এভাবে মাটি, কাঠ, সিমেন্ট, মেটাল, ও প্লাষ্টিকে প্রাকৃতিক নিয়মে ভাস্কর্যের বীজ অংকুরিত থাকে। ভাস্কর্য মুর্তিকলার অনুরূপ নয়। কখনো কখনো ত্রিমাত্রিক কারনে ভাস্কর্যকে মুর্তির সংজ্ঞায় ভাবা হয়, আসলে তা ঠিক নয়। মুর্তিতে যে বিশ্বাস থাকে ভাস্কর্যে তা থাকে না। মুর্তির কোন কিছু পরিবর্তন বা সংযোজন করা যায় না যেমন দূর্গা বোঝাতে দূর্গার দশ হাত দেখাতে হবে। একজন ভাস্কর দূর্গা নিয়ে কাজ করলেও এমন বাধ্যবাধকতা থাকে না। থাকে না কোন পূজার স্থান। ভাস্কর্যে থাকে নতুন বিষয় অনূভুতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস। যেমন ক'দিন আগে ঢাকা শহরের ধানমন্ডির ৪নং রোডে অবস্থিত অলিয়ঁজ ফ্রসেজেরলা গ্যালারিতে এক গ্রুপ ভাস্কর্য প্রদশনী হয় যেখানে কড়ই ও তাওয়া ভাস্কর্য নির্মানে কাঠামো হিসেবে দেখানো হয়েছে। ভাস্কর্য নির্মানে বাংলাদেশের মতো মুসলিম দেশগুলো পিছিয়ে নেই। এসব দেশের অগ্রবর্তী ভাস্করের মধ্যে ইরাকের বিখ্যাত ভাস্কক ইসমাইল ফাওাহ্ সৌদি আরবের আহমেদ আল দেহহাইস আলি এম আলতোখিস ও পাকিস্তানের শাহিদ সাজ্জাদের নাম উল্লেখ করার মতো।

ভাস্কর নভেরা আহমেদের জন্ম ১৯৩০ সালে কলকাতায়, তাঁর শৈশব ও কৈশোর সেখানেই কেটেছে। দেশ-বিভাগের পর কুমিল্লা চলে আসেন বাবা সাইদ আহমেদের সাথে। সেখানে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে লেখাপড়া করেন অত:পর ১৯৫১ সালে লন্ডন যান। লন্ডনে পরের বছর ভর্তি হন কেম্বারওয়েল স্কুল অফ আর্ট এন্ড ক্রাফটসে। সেখানে তিনি ডিপ্লোমা অর্জন করেন ভাস্কর্যে। তিনি ছিলেন বিংশ শতকের খ্যাতিমান ভাস্কর স্যার জ্যাকব এপস্টাইনের ছাত্রী। ১৯৫৫-৫৬ সালে ফ্রান্সের ফ্লোরেন্স একাদেমি দ্যো-বোজার্তে শিক্ষাশেষে দেশে ফিরেন। দেশে ফিরে ভাস্কর্য তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। ফার্মগেটের কাছে স্থপতি এফ, আর খানের বাসভবন প্রাঙ্গণে এদেশের প্রথম উম্মুক্ত ভাস্কর্য করেন। এই ভাস্কর্যটি বর্তমানে জাতীয় যাদুঘর প্রাঙ্গনে স্থাপন করা হয়েছে। ভাস্কর্যটির নাম 'কাউ এন্ড টু ফিগারস'। এই শিল্পকর্মটিতে ভাস্কর নভেরা

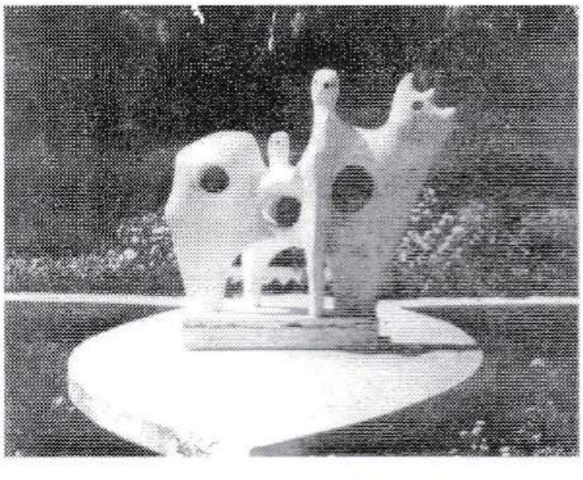

আহমেদ বাংলাদেশের গ্রামীন জীবনকে প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয় লোকজ কর্মের (গ্রামীন পুতুল) দ্বারা উৎসাহিত হয়েছেন। নামকরনেই বুঝা যায় ভাস্কর্যটিতে গরু ও মানুষকে দেখানো হয়েছে যা দেখে বাংলদেশকে চেনা যায়। এখানেই নভেরার কৃতিত্ব।

নভেরা আহমেদের আরেকটি শিল্পকর্ম যাকে ম্যুরাল ভাস্কর্য বলা হয়। এটি বাংলাদেশের প্রথম ম্যুরাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর বারান্দার দেওয়ালে স্থাপিত। যা এখন দেখা দুরূহ ব্যাপার কেননা বারান্দায় প্রাচীর তুলে যেভাবে দৃষ্টির বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে শিল্পকর্মটির মানও ক্ষুন্ন করা হয়েছে। এটিতেও ভাস্কর গ্রামীন জীবনকে প্রকাশ করেছেন। যেখানে হাতি, ঘোড়া, গরু ও মানুষ, দেখানো হয়েছে। ভাস্কর্য সৃষ্টিতে নভেরা সবসময় নিজেকে যুক্ত রাখতেন। যেখানেই যান না কেন ভাস্কর্য রচনা ছিল তার প্রধানতম কাজ। ১৯৫৯ সালে এই ভাস্কর বার্মা যান। ফিরে এসে করেন 'পিস' নামক ভাস্কর্য। ভাস্কর্যটিতে বুদ্ধকে পিরামিড

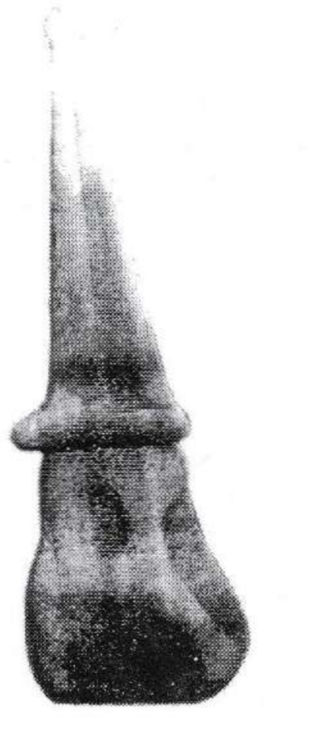

আকৃতির রূপ দেন। যেন বুদ্ধ অনেক বড়, মানুষের ধরাছোয়ার বাইরে। নভেরা এসব কাজ করেন সিমেন্টে। অথচ ইংল্যান্ডে তিনি মেটালে (ধাতু) কাজ করেছেন। আমাদের দেশে সে সময়ে মেটালের পদ্ধতিগত ব্যবহারে সমস্যার কারনে নভেরা আহমেদ দ্রুত সিমেন্টে ভাস্কর্য করতে থাকেন, এখানেও নভেরা অনন্য। এভাবে একের পর এক ভাস্কর্য করে ১৯৬০ সালে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে ৭৫টি ভাস্কর্য নিয়ে নভেরা করেন একক ভাস্কর্য প্রদশনী। যা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম একক ভাস্কর্য প্রদর্শনী।

১৯৬১ সালে পাকিস্তানের বিখ্যাত কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের আমন্ত্রনে লাহোর যান। সেখানে নভেরা "অল পাকিস্তান পেইন্টিং এন্ড স্পল্পচার" শিরোনাম প্রদশনীতে অংশগ্রহন করে 'চাইল্ড ফিলোসফার' নামক ভাস্কর্যের জন্য রাষ্ট্রপতি পদক পান। ১৯৬২ সাল থেকে নভেরা আহমেদ স্থায়ীভাবে শিল্পের শহর প্যারিসে অবস্থান করতে থাকেন। সেসময় থেকে আজ অবধি অর্থাৎ দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর দেশ ও দেশের মানুষের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখেন' এখানে বলা যায়, দীর্ঘ প্রবাস জীবন থাকার ফলে নভেরা আহমেদের অবস্থান সম্পর্কে নানারকম কল্পকথা তৈরি হয়। ফলে বাংলাদেশের শিল্পীসমাজে, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে, এমনকি সরকারী পর্যায়ে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ তাঁর বেঁচে থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। কথা শিল্পী হাসনাত আব্দুল হাই 'নভেরা' উপন্যাসের পুরো অংশ জুড়ে নভেরার সৃষ্টিশীলতার চেয়ে ব্যক্তি নভেরার জীবন আচরনকে প্রতিষ্ঠা করে জানান দেন নভেরা অসুস্থ ছিলেন, এখন বেঁচে থাকাটা রহস্যে ঘেরা।

অবশ্য সবরকম কল্পকথা ও রহস্যের অবসান ঘটে চারটি কারনে। প্রথমত ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের দেয়া 'একুশে' পদক। দ্বিতীয়ত, লেখক ইক্তিয়ার চৌধুরী (প্যারিসে বাংলাদেশ দুতাবাসের প্রাক্তন কাউন্সিলর) সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশ করেন, "নভেরা বেঁচে আছেন এবং এন্টিক দোকান মালিকের সাথে সংসার করছেন"।[১] তৃতীয়ত, জাতীয় যাদুঘর কর্তৃক প্রদর্শনীর উদ্যোগ। চতুর্থ প্রদর্শনী শেষে প্যারিস প্রবাসী লেখক আনা ইসলাম দৈনিক ভোরের কাগজে লেখেন "তবে ভাস্কর নভেরা সুস্থ আছেন, ভাল আছেন। কাজ করছেন ভাস্কর্য ও চিত্রকলা উভয় মাধ্যমেই, বড় আকার ও আয়তনে"। [২]

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আরও জানা যায় যে, ১৯৭০ সালে ব্যাংককে ও ১৯৭৩ সালে প্যারিসে নভেরা আহমেদের একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তবে তাঁর প্রবাস জীবনের কাজের সাথে আমরা এখনও অপরিচিত। বর্তমানে শহীদ মিনারের নকশাকার হিসেবে শিল্পী হামিদুর রহমানের সাথে নভেরার নামও চলে আসে। তাঁর কাজগুলো পাবলিক প্যালেস বা পার্কের জন্য। এই ভাবনার পরিপূরক প্রকাশ আমরা পাই যখন নভেরা নিজেই বলেন " নগর পরিকল্পনায় বা হাসপাতাল, ঘর-বাড়ি আর কারখানা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মানুষ যেখানে বসবাস বা কাজ করে তার প্রতিটি সুবিধা মতো জায়গায় আমাদের ভাস্করদের একটা ভূমিকা রাখতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যাতে শিল্পকর্মের সাথে সরাসরি আর ইতিবাচক প্রভাবে বেড়ে ওঠে, সে উদ্যোগ আমাদের নিতে হবে। পৃথিবীর মহতী নগরগুলো যেসব পরিকল্পনা ও উদ্দীপনায় গড়ে উঠেছিল, সেগুলোর কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে নতুন ব্যাখ্যাসমেত মানুষের মনে জীবনের সত্য, অর্থ আর অন্তর্দৃষ্টির প্রতি কৌতুহলের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া আমাদের কর্তব্য। নগর জীবনের সীমানার ভিতর শিল্পের স্থান করে দেয়ার মাধ্যমেই কেবল এটা সম্ভব"। [৩]

সবশেষে কৃতিমান এই ভাস্করের দীর্ঘ প্রবাস জীবন আমাদের বারংবার প্রশ্নের মুখোমুখি করে- নভেরার অভিমান না আমাদের অক্ষমতা ?

সূত্রপঞ্জী :

১. *ইক্তিয়ার চৌধুরী, "নভেরার ঠিকানা" সাপ্তাহিক বিচিত্রা-(ঢাকা ১৯৯৭) ২৬ বর্ষ, ২২ সংখ্যা , পৃ : ৪০-৪১।*

২. *আনা ইসলাম, "নভেরার বর্তমান দিনকাল" ভোরের কাগজ, (ঢাকা: ২৪ এপ্রিল, ১৯৯৮) পৃ : ১৩।*

৩. *লালারুখ সেলিম, "নভেরা আহমেদের ভাস্কর্যের আলোছায়া" ভোরের কাগজ, (ঢাকা: ২৪ এপ্রিল ১৯৯৮) পৃ : ১৫।*

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকের ভূমিকা

মোঃ শহিদ উল্লাহ

সহকারী শিক্ষক

একজন শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর কাছে অতি পরিচিত সদালাপী এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্নএকজন শিক্ষক। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ব্যক্তিগত অনেক সুবিধা অসুবিধার কথা তার কাছে নির্ভয়ে তুলে ধরতে পারে যা অন্যান্য শিক্ষকের কাছে পারেনা। এক্ষেত্রে একজন শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক প্রতিষ্ঠান, এলাকা এবং সমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকেন।

একজন শরীরিক শিক্ষা শিক্ষক শুধু অ্যাসেম্বলি খেলাধুলা, স্কাউটিং, দেশের সংকটকালে ছাত্রদের তথা সমাজের নেতৃত্ব দেন না তাকে আর পাঁচজন শিক্ষকের মত বিষয় ভিত্তিক ক্লাশ নিতে হয়। এদিক দিয়ে একজন শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক দুই ধরনের গুনের অধিকারী। তাই খেলাধুলার পাশাপাশি তাকে যখন শ্রেণী শিক্ষকের ভূমিকায় বিষয় ভিত্তিক পড়াশুনা করে ক্লাশে যেতে হয় তখন নিংসন্দেহে রীতিমত প্রস্তুতি নিয়েই যেতে হয় এবং তিনি একজন সফল শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। কারন তিনি একজন সাধারণ শিক্ষায় ডিগ্রীধারী ব্যক্তিত্ব বটে সেই সাথে পেশাগত ডিগ্রী তার রয়েছে।

বর্তমানে দেশের শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই প্রচেষ্টাকে বাস্তবতার নিরীখে এনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবেশকে উন্নত করে শিক্ষার মান বাড়াতে একজন শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকের ভূমিকা অবশ্যই কার্যকরী রূপ লাভ করে।

আমরা জানি যে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই উপযুক্ত খেলার মাঠ নেই এবং খেলার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অভাব ও রয়েছে। কিন্তু একজন শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক এইসব অসুবিধা অতিক্রম করে ও স্বীয় প্রেরণা বলে বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করে স্বল্প পরিসর স্থানেও শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। অপর পক্ষে একজন শরীরিক শিক্ষা শিক্ষক বিষয় ভিত্তিক ক্লাশ নিতে গিয়েও সফলতার হাত সম্প্রসারিত করে থাকেন। দেখা গোছে একজন প্রধান শিক্ষক তার প্রতিষ্ঠানের সবচাইতে নির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেবে এই শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকই বেছে নেন যিনি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় থেকে শুরু করে খেলাধুলার এমনকি প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধানে ও প্রধান শিক্ষককে সহযোগিতা করে থাকেন।

একজন ছাত্র যেমন খেলাধুলার পর ক্লান্তি কাটিয়ে খেলাপড়ায় মনোনিবেশ করতে পারে তেমনি কিন্তু একজন ছাত্র যে খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করে না, তার পক্ষে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করানো অনেক কষ্টকর হয়ে পড়ে। গ্রীক প্রবাদ অর্থাৎ "সুন্দর দেহে সুন্দর মন" না থাকলে লেখাপড়ায় আন্তরিক হওয়া যায় না। এইসব ছাত্রকে কেবল একজন শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকই পারেন মান সম্পন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত করে

তুলতে এবং খেলাধুলার মাধ্যমে আচরনে অনন্য হবার সহায়তা প্রদান করতে।

একজন শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয় প্রতিষ্ঠানের প্রায় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর

এক কথায় একজন শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক সার্বিকভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকেন বিধায় একজন প্রধান শিক্ষকের কাছে তার গুরুত্ব অতুলনীয়। বর্তমানে প্রায় গোটা

পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশ সমন্ধে জেনে নেয়া আর তাই তিনি তাদের সুখেদুঃখে সংকটে অংশীদার হতে পারেন এবং বখে যাওয়া ছেলেদের খেলাধুলার মাধ্যমেই সুপথে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেন।

মোট কথা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শুধুমাত্র ক্লাশের পরিবেশই যথেষ্ট নয় শিক্ষাঙ্গনে পুরো পরিবেশ সমন্বয়ে গড়ে উঠে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার মান যার চালক হতে পারেন একজন শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক। বস্তুত: শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, অভিভাবক, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদ এবং শিক্ষার বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একজন শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের মতই পারেন একটি প্রতিষ্ঠানকে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে।

পৃথিবীতেই সমস্ত পেশার মান ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে শারীরিক শিক্ষা শিক্ষককে একজন "ব্যতিক্রমী মানুষ" হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে এবং নিজ পেশার উন্নয়ন ঘটিয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আশার আলো বয়ে আনতে হবে।

তোমার কাজই তোমাকে পুরস্কার বা শাস্তির জন্য এমনভাবে নিয়ে যাবে, যেন এটা পূর্ব নির্ধারিত। আল-হাদীস

পরিবেশ বিপর্যয় ও বাংলাদেশ

মোঃ জামাল উদ্দিন বেপারী

সহকারী শিক্ষক

মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, প্রতিটি মানুষ সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে বাস করে এবং সেখানেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। পরিবেশের জীব ও জড়ের মাঝে গড়ে উঠে নিবিড় সম্পর্ক। তাদের অন্তঃক্রিয়ার ফলশ্রুতিকেই বলে প্রকৃতি। প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের নিয়মিত উপস্থিতিই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। এমনই সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, নদী মাতৃক এই রূপসী বাংলা। যার সূচনা লগ্ন থেকেই দুঃখ ও দৈন্যের সাথে নিবিড় পরিচয়। কেননা ভৌগলিকভাবে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও উত্তরে হিমালয় পর্বত দেশটিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবন করে রেখেছে। এরই মাঝে ১৪৪৫৭০ বর্গকিলোমিটারের মাঝে ১৩ কোটি জনতার আবাস। বিশাল জনসংখ্যার ভারে নুয়ে পরেছে এই আবাসনটি। জনসংখ্যার এই অপরিকল্পিত বিস্ফোরন দেশটির পরিবেশকে বিপুলভাবে বিপর্যস্ত করেছে। জনসংখ্যার শূণ্য বৃদ্ধির হার অর্জন করতে পারলে হয়ত রেহাই পেত লাঞ্ছিত নিপীড়িত হতভাগ্য এই পৃথিবী বিখ্যাত ব-দ্বীপটি। সর্বসাধারণের কর্ণকুহরে যদি পৌঁছানো যেত জন্মনিয়ন্ত্রণের সেই অমর বাণী- "একটি হলে দুটি নয়, দুটি হলে আর নয়।" তবেই হয়ত আশা করা যেত একে রক্ষার। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য আজ শহরায়ন, নগরায়ন হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে দোশের সুষ্ঠ পরিবেশের প্রয়োজনীয় ২৫% ভাগ বনভূমি উজার হচ্ছে ব্যাপকভাবে। চার দেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক মিলে ৯% বনভূমি আছে যা দেশের সুষ্ঠ পরিবেশ রক্ষায় নিতান্তই অপ্রতুল। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ও সরকারি সহায়তায় বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করানোর মাধ্যমে বিশাল জনতাকে সচেতন করে গড়ে তুলতে পারলে হয়ত রক্ষা পেত বনভূমি। ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যেত শতাব্দীর মেধা ও কৃষ্টি দিয়ে লালিত সভ্যতা। বৃক্ষের দিকে তাকালে মানব জীবনের উপলব্ধি যেমন সহজ হয় তেমনি সবুজ বনানী ছাড়া বেঁচে থাকা কোন প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব নয়। বৃক্ষ ছাড়া পরিবেশ বাঁচানোর কোন পথ খোলা নেই বলেইতো প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশ- " গাছ লাগাও পরিবেশ বাঁচাও"। এই শ্লোগান আজ গ্রাম বাংলার সর্বত্র। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে সারা বিশ্বের মানবজাতি এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন। প্রাকৃতিক শক্তির বিচিত্র ও ব্যাপক ব্যবহারে প্রকৃতি ও তার পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে পৃথিবী আজ এগিয়ে চলছে এক সর্বনাশা পরিনতির দিকে। এদেশের প্রকৃতির সাথে নিবীড়ভাবে সম্পর্কিত সেই ভয়াবহ সংকটের নাম হচ্ছে "গ্রীণহাউজ প্রতিক্রিয়া"। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কারনে বায়ু মন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস মিথেন নাইট্রিক অক্সাইড ও সি, এফ, সি, গ্যাস, বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ু মন্ডলের উত্তাপ বেড়ে গেছে। সি, এফ, সি, গ্যাস বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরে না ভেঙ্গে স্টেটোস্ফিয়ারের ওজোন স্তরে গিয়ে ওজোনকে ভেঙ্গে অক্সিজেন মুক্ত করে ওজোন স্তরে ফৌটার সৃষ্টি করে যার ফলশ্রুতিতে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে নেমে আসে বিপুল সমারোহে।

এই তাপ যে ফ্রিকোয়েন্সী নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে সেই ফ্রিকোয়েন্সী নিয়ে আবার আকাশে ফিরে যেতে পারে না ঐ গ্রীণহাউজ গ্যাস কর্তৃক সৃষ্ঠ বলয়ের কারণে। যার ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ক্রমশই বেড়ে চলছে। এ যাবৎ পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপ মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৫^{O} সে: যে হারে বেড়ে চলছে সে হারে বাড়তে থাকলে ২০১৫ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে ৪.৫^{O} সে: পর্যন্ত বেড়ে গিয়ে মানব ইতিহাসের এক অভাবনীয় ঘটনায় বিবেচিত হতে পারে বলে পবিবেশ বিজ্ঞনীদের ধারনা। গ্রীণহাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে মেরু প্রদেশের বরফ গলে নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে, সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে, উপকুল অঞ্চল ও নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে অধিক জায়গা বন্যা ও লবণাক্ততার কবলে পতিত হবে। সমুদ্রতলের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১/৬ ভূমি অথ্যাৎ ১৫.৮% ভাগ পানির নিচে তলিয়ে যাবে। এতে বাংলাদেশর ৬২টি উপজেলা ও ১৩টি জেলা চরম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ ছাড়া গ্রীণহাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে আবহাওয়াতে আসবে ব্যাপক পরিবর্তন প্রাকৃতিক দূর্যোগের পরিমান বাড়বে। ঝড় আর খরা একই সহোদয়া যখন স্ব-স্ব কর্তৃত্ব করে আসে নিপীড়িত এই বাংলায় একদিকে খড়ায় যেমন পানির অভাবে মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির হয় তখন চাতক পাখীর মত "ফারাক্কার" দিকে চেয়ে থাকতে হয় পানির ন্যায্য হিস্যায়। জালের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ২৫০টি ছোট, বড় নদীর এই দেশে পানির অভাব যেন চরম লজ্জা। অপরপক্ষে বন্যা যখন দুর্ভাগ্য নিয়ে বাংলায় আগমন করে তখনই শুরু হয় দেশের দক্ষিণ জনতার আহাজারি। বন্যার পানি যখন নদীর দুকূলছাপিয়ে মাঠ-ঘাট ভরে যায়, ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট ও জনপথ যখন পানির অতলতলে তলিয়ে যায়, গবাদিপশু ও মানুষসহ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায় দুর্যোগ প্রবণ এলাকা তখন পরিণত হয় মৃত্যু পুরীতে। আত্মীয়, স্বজনের গগণ বিদারী আহাজারিতে গ্রাম বাংলার আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠে। জলোচ্ছ্বাস আর বন্যার পানি সরে গেলে মৃত পশুপাখীর পঁচা-গলা দেহের দুর্গন্ধে সুন্দর পরিবেশ হয়ে উঠে দুষিত ফলে প্রবল আকারে দেখা দেয় মহামারী, ডায়েরিয়া ও কলেরা যার ফলে মৃত্যুর মুখে পতিত হয় অনেক মানুষ। পানির অপর নাম জীবন। এ কথা কার না জানা আছে। জীবনের বিকল্প হিসেবে পরিচিত পানি বিপুল মাত্রায় দুষিত হচ্ছে বিশাল জনতার অজ্ঞতার কারনে। সবুজ বিপ্লব ঘটাতে যখন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কীটনাশক এল এই বাংলায় তখন শস্য ক্ষেতে ব্যবহৃত কীটনাশক বৃষ্টির পানির সাথে গরিয়ে জলাভূমিতে পতিত হয়ে অভয়াশ্রমসহ ধ্বংস করে দিচ্ছে পানির অস্তিত্বকে। শহরের পাদ ঘেঁষে গড়ে উঠা শিল্প, কারখানাগুলোর বর্জ্যে শহর ও শহরতলীর জলাভূমির অবস্থা অত্যন্ত সূচনীয়। এতে জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে মারাত্বকভাবে ও হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে দেশ ও জাতি। একটি সুষ্ঠ শহরের জন্য চাই ২৫% ভাগ রাস্তা কিন্তু ঢাকায় ৮% ভাগ এর বেশী রাস্তা সর্বত্র দেখা যায় না। কাজের সন্ধানে সারা দেশের লোকজন ঢাকায় এসে ভীড় করায় শহরের এই অসহনীয় যানজট যা এখন রাষ্ট্রীয় ভাবনায় পরিণত হয়েছে। অব্যবহৃত জিনিসপত্রে গ্রাম বাংলার মাঠ-ঘাট যখন ভরে যায় তখনই শুরু হয় মাটি দুষণ। পরিবেশের অন্যতম বৈরী পলিথীন ব্যাগ এদেশের মাটি, পানিসহ সকল কিছু যখন গ্রাস করতে বসেছিল তখন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বনও পরিবেশ মন্ত্রি জনাব, শাহজাহান সিরাজ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপের মাধ্যমে রক্ষা করলেন মরণ ব্যাধির ন্যায় ঘিরে ধরা পলিথিনের কবল থেকে এই পরিবেশটিকে। বিশ বছরের পুরোনু গাড়ী ও টুস্ট্রোক থ্রি হুইলার যানবাহন বন্ধ ও সি.এন.জি চালানোর মাধ্যমে শহরের দুষণ কমানোর পদক্ষেপটি সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। রায়ুদুষণ, পানি দুষণ মাটিদুষণ, শব্দদুষণ ও

তেজস্ক্রিয় বিকীরণ দুষণ, এই সব প্রতিক্রিয়ায় পরিবেশের মরণ অবস্থা ঘনিয়ে এসেছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্রান্তিলগ্নে দেশ ও জাতি এখন দিশে হারা বলেই একে নব জাতকের বাসযোগ্য করে গড়ে তোলা এদেশের সর্বস্তরের জনতার তথা প্রতিটি সু-নাগরিকের পরিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। এবার গভীরভাবে ভাবা যাক কি ভাবে জনসংখ্যার ভারে নূয়ে পরা এই ছোট ভূখণ্ডটি রক্ষা করা যায়, এই সর্বনাশা বিপর্যযের কড়ালগ্রাস থেকে। নিম্মোক্ত পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়িত হলে হয়ত আশা করা যেত, একে বাঁচানোর।

১। পরিবেশ সম্পকির্ত অজ্ঞ জনতাকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

২। গ্রীণহাউজ প্রতিক্রিয়ার কবল থেকে দেশ তথা ধরণীকে রক্ষার উপায় খুঁজে বের করা।

৩। সীসামুক্ত জ্বালানী তৈল তথা এর বিকল্প শক্তির সন্ধান করা।

৪। পরিবেশদুষন আইন ও তার সফল বাস্তবায়ন করা।

৫। কলকারখানায় রাসায়নিক ছাকুনী ব্যবহার করা।

৬। বৃক্ষনিধন বন্ধ করে বনায়ন করা।

৭। সু-পরিকল্পিত ভাবে শহর, বন্দর ও নগরস্থাপন করা।

৮। জলাশয় গুলিকে সবর্নাশা কীট নাশকের কবল থেকে রক্ষা করা।

৯। পরিকল্পিত ভাবে বেড়ি বাঁধ নির্মান করে নদীর নাব্যতা সচল রাখা।

১০। যেখানে সেখানে নর্দমার পানি আটকে যাতে মশা মাছির উপদ্রব না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। সর্বোপরি পরিবেশ দূষনের মত ভয়াবহ সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে হলে বিচ্ছিন্ন উদ্দ্যোগে কাজ হবেনা, প্রয়োজন সর্বস্তরের জনতা ও বিভিন্ন মিডিয়ার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস, সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি সকল এন জি,ও , এবং স্বেচ্ছাসেবি প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে, সেবা ব্রত মন নিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ ও শিক্ষক সহ সবস্তরের জনতার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা উচিৎ "গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান"।

পরিশেষে মহান সৃষ্টি কর্তার কাছে কায়মনো বাক্যে মিনতি জানিয়ে সকলকে আহবান জানাচ্ছি আসুন না ভাই, বোন ও বন্ধুরা সবায় মিলে নিরলস শ্রম দিয়ে বাঁচিয়ে তুলি এই দেশ, তথা প্রকৃতিকে, নবজাতকের বাসযোগ্য করে গড়ে তুলি শ্রেষ্ঠতম গ্রহ নামক এই ধরণীটিকে।

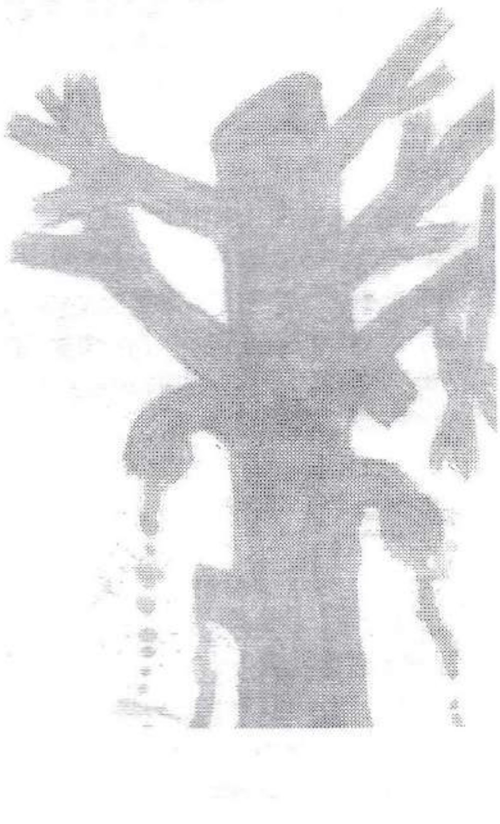

নারী ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

আনজুম আরা বেগম

সহকারী শিক্ষিকা

বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে যখন বাঙালি মুসলমান নারী ছিল অন্ধকারে, বাঙালি মুসলমান সমাজ-ই ছিল অন্ধকারের কালো পর্দার আড়ালে তখন সদ্য ভোরের আকাশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে প্রভাতের যে সূর্য উদিত হয়েছিল তিনি বাংলার সাহিত্যের আকাশে এক জলন্ত নক্ষত্র—'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন'। প্রভাতের অবগুণ্ঠন সরিয়ে নতুন অভিযাত্রিকের বেশে বাঙালি নারীজাগরনের মূর্ত প্রতীক, অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সত্য সুন্দর পথের পথিক—দেখা দিয়েছিলেন পথ প্রদর্শক হয়ে।

নারীরা এক সময় ছিল অবহেলিত, লাঞ্চিত, নির্যাতিত, মানসিক নিপীড়নে নিপীড়িত; 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না'—তথা কথিত প্রবাদ বাক্যের যথার্থ মূল্যায়নই এই নারীর ক্ষেত্রে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল নারীর অবমূল্যায়ন। পিতৃগৃহে শিশুকন্যার করুণা মিশ্রিত আবেগ স্নেহের বেড়াজাল কাটিয়ে যখন কিশোরী বয়সে উপনীত ঠিক তখনই দেখা দেয় পিতার স্নেহাশীর্ষ ও ভালবাসা মিশ্রিত আবেগে চিন্তার ছায়া। এই বিভাজন চিন্তা দূরীকরনের উপায় কন্যাকে সুপাত্রে পাত্রস্থ করা। তারপরও কিশোরী কন্যার নিস্তার নেই সমাজের কঠিন বাস্তবতার দাবানলে কিশোরী কন্যা হয়ে উঠে বধূ-মাতা এবং পরে শাশুড়ী। ক্লিষ্ট হতে থাকে কিশোরীর সমস্ত প্রতিভার অবগুণ্ঠন। নিষ্পেষিত হতে থাকে মানবিক গুনাবলী, সৌন্দর্য, সৃষ্টিশীল মনোভাব এবং মনন ও মেধাশক্তি। ভবিষ্যৎ এ বাস্তব রূপ রেখায় সামাজিক ও সাংসারিক চাপে পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম চাপের মুখে নিজস্ব সত্ত্বা ও বিচার শক্তি নারী হারিয়ে ফেলে। তখনই Colorless green ideas sleep furiously-বর্ণহীন সবুজ ভাবনাগুলো ভয়ঙ্করভাবে ঘুমাচ্ছে, কিংবা অপমৃত্যু ঘটছে। আর এ মুহূর্তেই যে কোন কাজে চাপের মুখে সমাজে লিঙ্গঁভিত্তিক গৃহাভ্যন্তরের কাজ নারীর জন্য বরাদ্দ হয়ে যায়। যার গুরুত্ব ও মূল্যায়ন কোনোটাই পুরুষের তথা সংসারে তথা সমাজে নেই। আর আবহমান কালের এই অন্ধকার কু-সংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব থেকে বর্তমান সমাজের স্বার্থান্বেষী পুরুষ শ্রেণী—'যারা নারীকে শুধু মনে করে সংসারের তেল, নুন, চাল, ডাল, কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রী কেনার মতই সহজ বা সস্তা উপকরণ। যা অতিব সহজলভ্য এই মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সমাজের এই কুটিল চক্রকে ভেদ করে বেগম রোকেয়া নারীর নবজাগরনের সূচনা করেছেন। পুরুষের পাশাপাশি আজ নারী জাগরনের লাল নিশান উড়িয়েছেন নব আঙ্গিঁকে, নবরূপে। সমাজের বুড়িয়ে যাওয়া শিকড়কে ধাক্কা দিয়েছেন-সচেতন করে তুলেছেন নারী সমাজকে-পর্দার অবগুণ্ঠন সরিয়ে ফেলে বেরিয়ে আসার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। দেশ, সমাজ ও কাল অসম্ভব কুশলী হয়ে উঠেছেন এই কঠিন ধাক্কায়। মানুষের সমস্ত বিশ্বাস একত্রে সঞ্চারিত করে প্রত্যেক স্বাধীনতা কামী নারী এগিয়ে আসেন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে। আর বাঙালি মুসলমান সমাজের আধুনিকতায় ও প্রবল ধাক্কা লাগে। শুরু হয় পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজের প্রতিযোগিতা। বাঙ্গালী সমাজে দেখা দেয় নতুন চমক। বাঙ্গলার মাঠে সমস্ত বিদ্রোহের লাল নিশান উপেক্ষা করে এগিয়ে চলে লাগামহীন প্রতিবাদ। বিকশিত হতে থাকে প্রভাত সূর্য-নারী মুক্তির আগমন বার্তা ।

আবহমান কালের সূচনা লগ্ন থেকে বর্তমান কালের এ মাত্রা পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পুরুষদের সঙ্গেঁ নারীরা সমান ভাবেই শ্রম বিনিয়োগ করছে। গ্রাম্য মহিলারা প্রতিদিন ১৪-১৬ ঘন্টা কাজ করে থাকে, এ কাজের একটা অংশ বেতনহীন পারিবারিক শ্রম অন্য অংশ হচ্ছে মহিলা শ্রমের সাথে অর্থ মূল্যের সংযোগহীনতা যার দরুন গ্রামের নারীরা ক্রমবর্ধমানভাবে অর্থনৈতিক

মন এবং মনের অস্বাভাবিকতা

শাহনাজ আক্তার

সহকারী শিক্ষক

আধুনিক সমাজ, পরিবেশ এবং নানা জেনেটিক জটিলতা ক্রমশ জন্ম দিচ্ছে নিত্য নতুন মনের অসুখের। মনের এই জগৎ যেমন জটিল, তেমনি ভয়ঙ্কর। কিন্তু আমরা কতটুকু জানি এই ভয়ঙ্কর জটিল মনের রোগ, তার প্রতিকার ও প্রতিরোধ সন্মন্ধে? শুধু আমরা কেন, সরকারি স্তরে, এমনকি চিকিৎসকরাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন নন! অবহেলা আর ঔদাসীন্য যত বাড়ছে ততই মনোরোগীদের সামাজিক অস্তিত্ব এক জটিল সমস্যা হয়ে উঠছে। আর তাই মনকে চিনুন। জেনে নিন মনের রোগের নানা উপসর্গ, কারণ ও তার প্রতিকার।

"Man are so inevitable mad that not to be mad would be to give a mad twist to madness."

এই অসাধারণ উক্তিটি ফরাসি চিন্তাবিদ ব্লেজ পাস্কালের। দুনিয়ার প্রতিটি মানুষই তাঁর কাছে অমোঘ ও অব্যর্থ উন্মাদ।

আমরা, সাধারণ মানুষও তো এ নিয়ে কতই না রসিকতা করি। কেউ টাকার জন্য পাগল। কেউ প্রেমের জন্য। কেউ বা বাড়ির জন্য। অফিস, কলকারখানাতেও যে কত 'কাজ পাগল' দেখা যায়! প্রতিটি মানুষই কোথাও না কোথাও একটু চন্দ্রাহত।

আর সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে মেধায়-মননে যাঁরা অসাধারণ, রহস্যময় ঐ চন্দ্রিমার সঙ্গে তাঁদের সকলেরই কোথায় যেন রয়ে যায় এক নিগুঢ় যোগাযোগ। গত শতকের অন্যতম লেখক জেমস জয়েসের সেই কথাটা মনে পড়ে। ডাবলিনের পানশালার ওয়েট্রেস নোরা বার্নাকলের সঙ্গে দাম্পত্য কাটিয়েছেন সারাজীবন এবং সেই দাম্পত্যের অন্যতম ফলশ্রুতি কন্যা লুসি। লুসি একদিন সত্যিই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। সুস্থ করে তোলার জন্য সুইজারল্যান্ডে পাঠাতে হয়েছিল লুসিকে এবং তারপরও বার বার দেখা যায় উন্মাদ এই কন্যাকে নিয়ে প্রতিভাবান পিতার চিন্তার তোলপাড়। "আমার প্রতিভা, মেধা সবই লুসিয়াকে সঁপে দিতে চেয়েছিলাম আর সেটাই যেন ওর মস্তিস্কে আগুন জ্বালিয়ে দিল," লিখেছেন জয়েস।

এই যে মস্তিস্কে প্রতিভার অগ্নিসংযোগ... সেটাই যেন মাঝে মাঝে বিপন্ন করে দেয় অস্তিত্বকে। এমনিভাবে চিত্রকলার পুরোধা ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ মাঝে মাঝেই স্কিজোফ্রেনিয়া বা উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হতেন। উন্মত্ততায় আক্রান্ত হয়ে একদিন তিনি নিজেই নিজের কান কেটে ফেলেছিলেন এবং শেষে এরকমভাবেই একদিন আত্মহত্যা। প্রতিভার সঙ্গে পাগলামি তা হলে সত্যিই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার এমন নয় যে প্রতিভা মাত্রই পাগল। কিন্তু প্রতিভা এবং

উন্মত্ততা-এই দুই রহস্যময়তা কারও কারও জীবনে কখনও এক হয়ে যায়। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জন ন্যাশের কথাই ধরা যাক। গেম থিওরির অন্যতম পুরধা ন্যাশের জীবন নিয়েই তৈরি হয়েছিল অস্কার জয়ী সেই ছবি 'আ বিউটিফুল মাইন্ড'। ছবিটিতে দেখা যায় তিরিশ বছর বয়সে কীভাবে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক নির্দিষ্ট চৌকাঠ পেরিয়ে গিয়েছিলেন ঐ গণিতবিদ। বন্ধুদের চিঠি লিখে জানাতেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া পদ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারন এখন তিনি এন্টার্কটিকার সম্রাট হবেন। আবার কখনও ভয়ে তিনি সিটিয়ে থাকতেন। এই বোধ হয় গোয়েন্দা পুলিশ এসে তাকে তুলে নিয়ে গেল। টানা তিরিশ বছর এভাবে বাড়ি, বিশ্ববিদ্যালয় আর মানসিক হাসপাতাল করতে করতে হঠাৎই সুস্থ্য হয়ে যান ন্যাশ। সাদা চুল চশমা পরা সেই গণিতবিদকে দেখলে কে বলবে, জীবনের কয়েকটা দশক তাকে মাঝে মাঝেই কাটাতে হয়েছে উন্মাদ রোগের হাসপাতালে। কী আশ্চর্য! প্রতিভা এবং উন্মত্ততা দুই 'ব্যাধি'ই লুকিয়ে আছে আমাদের মস্তিস্কে। আসলে উন্মাদ কি সত্যিই উন্মাদ? তাহলে উন্মাদনা ঠিক কী? স্বর্গীয় আলোকপ্রাপ্ত এক বিপন্নতা, নাকি সামাজিকভাবে বিপজ্জনক এক অস্তিত্ব।

মন আসলে কি ঃ মনের অসুখ বা মনোঃরোগ নিয়ে আলোচনার শুরুতেই প্রশ্ন উঠে মন কি? মনের অবস্থানটাই বা কোথায়? দার্শনিকদের কাছে মনের সংজ্ঞা যাই হোক না কেন? সাধারণভাবে সেই অর্থে মনের সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। কাজকে আমরা মূলতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করে থাকি। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর উলপব্ধি, কল্পনা, স্মৃতি, বিচার বিবেচনা, চিন্তা ইত্যাদির ধারনা হয় এর মাধ্যমে। আবেগ বা অনুভূতি যে কোন বস্তু বা বিষয়ের অনুভূতি। যেমন মা ও ছেলের সম্পর্ক।

মানসিক স্বাস্থ্য কি ঃ স্বাস্থ্য হলো শারীরিক এবং মানসিক সুস্থ্যতার সামগ্রী। শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিচ্যুতি বা অসুবিধার সৃষ্টি হলে তাকে আমরা অসুস্থ্যতা বলি। আসলে মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শারীরিক অসুস্থ্যতা দেখা দিলে মানসিক অসুস্থ্যতা দেখা দেয়। ডঃ জগদিস চন্দ্র বলেছিলেন, পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে যথাযথভাবে খাপখাইয়ে চলার ক্ষমতাই হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য।

মানসিক স্বাস্থ্যের উপাদান কি ঃ সেই ছেলেবেলা থেকে পড়ে এসেছি স্বাস্থ্যই সম্পদ। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে মন ভাল থাকেনা। আসলেই তাই, সুস্থ্য ব্যক্তিত্ব গঠনে সুস্থ্য দৈহিক স্বাস্থ্যের গঠন ও সংরক্ষণের দরকার হয়। যেমন—শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার সময় তার পুষ্টির দরকার। তা না হলে বিভিন্ন রোগে-শোকে আক্রান্ত হয়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কোন কাজে মন বসে না। আর মারাত্মকভাবে প্রভাব পড়ে মনের উপর মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকার পূর্ব লক্ষণ হচ্ছে যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপখাইয়ে চলতে পারা এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারার মাধ্যমে যথার্থ বিবেক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মনের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হলে বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে ধৈর্য ধারন করে বাস্তবকে মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। পরিবারের বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য পরিবারের সকল সদস্যদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া এবং প্রতিটি গঠনমূলক কাজে সকল সদস্যের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা। তবেই পারিবারিক সুস্থ্যতা বৃদ্ধি পায়, বন্ধন দৃঢ় হয়, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগে এবং পিতামাতা ও সন্তানের দূরত্ব কমে। পারিবারিক শৃঙ্খলা মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার পূর্বশর্ত। ব্যক্তির আত্মকল্যাণ, পারিবারিক কল্যাণ, গোষ্ঠী ও জাতীয় কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া মানে ব্যাপকভাবে কল্যাণ সম্প্রসারিত করা। একটি শিশু পরিবেশের মধ্য থেকে সামাজিকীকরনের বিভিন্ন বিষয় শেখে। Parents - Peer group - School.

সামাজিক, পারিবারিক সব পরিবেশের নিয়ামক মানসিক স্বাস্থ্য। একটি শিশু যদি পরিপূর্ণভাবে বেড়ে উঠে তবে সে পরিবার সুস্থ্য বলে বিবেচিত হয়। প্রতিটি সুস্থ্য মানুষ

আত্মনির্ভরশীল। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব আচার-আচরন ও মূল্যবোধ নীতি রয়েছে। সুস্থ্য মানুষ সমাজকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে চায়। আর সুস্থ্য মানসিকতা আত্মনির্ভরশীলতার মূল দর্শন। তবে একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর নির্ভরশীল হওয়া মানসিক অসুস্থ্যতার লক্ষণ নয়।

মনে রোগ হয় কেন ঃ শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকলে যেমন রোগ কম হয়, তেমনি মনের রোগও নির্ভর করে মনের স্বাস্থ্যের উপর। তবে মানসিক রোগের নানা কারনের মধ্যে ভয়, উৎকণ্ঠা, একাকিত্ব, ডিপ্রেশন খুবই সাধারণ কারন। এছাড়াও শরীরের কোন রোগ থেকেও মানসিক রোগের জন্ম হতে পারে। শারীরিক অসুখের সঙ্গে মনের অসুখের কতগুলো তফাৎ রয়েছে। অসুস্থ্য রোগীর শরীরে কিছু স্বাভাবিক পরিবর্তন হয় যেমন টিউমার, ক্ষত ইত্যাদি অথবা শরীরে জীবাণুর আক্রমন। মানসিক রোগের লক্ষণ বা মনঃবিকারের লক্ষনও প্রকাশ পায় তবে সেই প্রকাশ ভিন্ন মাত্রার। বুক ধড়ফড়, শ্বাসকষ্ট, অনিদ্রা, মাথা ধরা, ক্লান্তি, ক্ষুধা-মন্দা, হতাশা যেমন হয় তেমনি দেখা যায় বুদ্ধি বা স্মৃতিশক্তির অভাব, অকারন উৎকণ্ঠা, বিষাদ। আবার কখনও বা অশালীন আচরণ, আক্রমনাত্মকভাব, পোষাকের প্রতি অনাগ্রহ ইত্যাদি।

মানসিক রোগ কি কি প্রকারের হতে পারেঃ

ক) দৈহিক কারন জনিতঃ মস্তিস্কে প্রদাহ বা আঘাত জনিত, মৃগী রোগ, স্মৃতিভ্রংশতা।

খ) আভ্যন্তরীন বা পারিপার্শ্বিক কারনজনিতঃ নিউরোসিস, দুঃশ্চিন্তা, হিষ্টিরিয়া, ফোবিয়া, অবসেশন।

গ) সাইকোসিস ঃ স্কিজোফ্রেনিয়া, বিষন্নতা, অতি উত্তেজনা, বিষাদগ্রস্ততা।

ঘ) অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব।

ঙ) মনোদৈহিক রোগ ঃ হাপানী, বিভিন্ন চর্মরোগ, পেপটিক আলসার, আমাশয়।

চ) মাদক দ্রব্যে নির্ভরশীলতা।

ছ) অনিদ্রা, ব্যাথা, খিটখিটে মেজাজ ইত্যাদি।

মানসিক রোগের উপসর্গ ঃ অতিউত্তেজনা, চঞ্চলতা, প্রলাপ বকা, আক্রমনাত্মক আচরন, ঘন ঘন কথা বলা, বড় বড় কথা বলা, অস্থিরতা, উদাসীনতা, হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়া, কথা না বলা, অল্প কথায় উত্তর দেয়া, অনিয়মিত আহার, অনিদ্রা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকা, জীবন বোধ সম্পর্কে হতাশা, অকারনে হাসা, অনর্থক বিড় বিড় করে কথা বলা।

অশান্তি ঃ সর্বক্ষণ বিষন্ন থাকা, কোন কিছু ভালো না লাগা, অস্থিরতা, অতিরিক্ত ধীর হয়ে যাওয়া, অনিদ্রা, অরুচি, কাজে মন না লাগা, মন ছটফট করা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে জ্বালাপোড়া, অসহায় বোধ, মাথা ব্যাথা, হতাশা বোধ, আত্মনির্ভরশীলহীনতা, নিজেকে ছোট ভাবা, ঘন ঘন প্রস্রাব করা, ওজন কমে যাওয়া, আত্ম-হত্যার চিন্তা, প্রবনতা বা করে বসা।

অতি উদ্বেগ ঃ বুক ধড়ফড় করা, গলা শুকিয়ে যাওয়া, ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া, পেটে গ্যাস হওয়া, মাথার চারিদিকে চাপ বোধ হওয়া, অরুচি, অকারন ভীতি, মৃত্যু ভীতি, ঢেকুর তোলা, হাত-পা কাঁপা, অনিদ্রা, অতিচিন্তা, পড়াশুনায় অমনোযোগীতা, পড়া মনে না থাকা ইত্যাদি।

অন্যান্য উপসর্গ ঃ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, ঘন ঘন মত বদলানো, বিশ্বাসহীনতা, সন্দেহ করা, বাতিকগ্রস্থতা, উগ্রতা, ভুল বকা, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া, সামঞ্জস্যহীন কথা বলা, নিজের সাথে নিজে কথা বলা, এক ঘেঁয়েমী ইত্যাদি।

মনের কয়েকটি সাধারণ রোগের বিবরণঃ

ডিপ্রেশন বা বিষন্নতা ঃ মনের রোগগুলোর মধ্যে বেশি হতে দেখা যায় ডিপ্রেশন। ডিপ্রেশন চার-পাঁচ রকমের। সাধারণত এই রোগের কিছু লক্ষণ রয়েছে। কিন্তু সবগুলো লক্ষণ একসঙ্গে এক রোগীর মধ্যে থাকবে এমন কোন কথা নেই।

ডিপ্রেশনের লক্ষণ ঃ শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম হয় কিন্তু ভোরের দিকে একবার ঘুম ভেঙ্গে গেলে আর আসতে চায় না। যাকে আর্লি মর্নিং ওয়েকেনিংও বলা হয়। খিদে কমে যায়। দিনের

পর দিন প্রতি মুহূর্ত্ব দুঃখী বা অসুখী ভাব থাকে। সর্বদা নেগেটিভ চিন্তা বা হতাশা মনকে আচ্ছন্ন রাখে। কনফিডেন্স কমে যায়। কাজের উৎসাহ ও ক্ষমতা হারিয়ে যায়, কিছুই করতে পারিনি বা করতে পারবো না-এমন মনে হতে থাকে। আত্মহত্যার চিন্তা বা মৃত্যুচিন্তা মনের মধ্যে দানা বাঁধে। ৮০% ডিপ্রেসড রোগী আড়াই-তিন মাসের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। শুধুমাত্র ওষুধে ৬০%-৭০% ডিপ্রেশন মুক্ত হয়। ডিপ্রেশন ওষুধে সারে। তবে ওষুধ খাওয়ার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

এ্যাংজাইটি বা উৎকণ্ঠা ঃ সকলেই উৎকণ্ঠা করেন, তবে মাত্রাটা সব ক্ষেত্রে সমান থাকেনা। উৎকণ্ঠা আর ভয়ের মধ্যে তফাত আছে। বাস্তবিক কারনে আমাদের জীবনে যে বিপদের সম্ভাবনা, তা হল ভয়। কিন্তু উৎকণ্ঠা একটু অন্যরকম। পর্যাপ্ত কারন ছাড়া যখন শঙ্কিত হয় তখন তাকে উৎকণ্ঠা বলে। উৎকণ্ঠা দু'ভাবে প্রকাশ পায়। কোন বিশেষ ঘটনা পরিস্থিতি বা অবস্থার সম্মুখীন হলে যেমন উৎকণ্ঠা হয় তেমনি আবার ভিন্ন বিষয় নিয়ে, ভিন্ন সময়ে উৎকণ্ঠা হতে পারে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শরীরের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়, ফলে কিছু শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন বুকের ভেতর অস্বস্তিকর বেদনা, বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুত গতি বা নাড়ির দ্রুত গতি।

ফোবিয়া বা আতঙ্ক ঃ ফোবিয়া এক ধরনের নিউরোসিস। এ ক্ষেত্রে রোগী কোন বিশেষ অবস্থার মুখোমুখী হতে চায় না। এ ধরনের রোগী কোথাও যাওয়ার নামে আঁতকে উঠে। দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার বা জ্ঞান হারাবার ভয় এদের থেকেই যায়। এ ছাড়াও নানাবিধ আতঙ্ক রয়েছে যেমন—প্রাণী ভীতি, কোন বিশেষ বস্তুতে ভীতি, অহেতুক রোগ ভীতি ইত্যাদি।

মৃগী রোগ ঃ এই রোগে আক্রান্ত রোগীরা সাধারণত ভালো থাকলেও মাঝে মধ্যে রোগের আক্রমন দেখা দেয়। এই রোগের ফলে এক দুই মিনিটের জন্য ফিট বা জ্ঞানহীন হয়ে যায় রোগী। হাত-পা ও দেহ শক্ত হয়ে যায়, তারপর ঝাঁকুনি হতে থাকে এবং শেষে শিথিল হয়ে যায় শরীর। রোগী ঘুমের মধ্যেও ফিট হয়ে যেতে পারে। ঘুমের মধ্যে অসাড়ে প্রস্রাবও হয়ে যেতে পারে। মানসিক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ছাড়াও রোগী ফিট হয়ে যায়। মৃগী রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না, ওষুধ রোগটিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে।

হিষ্টিরিয়া ঃ হিষ্টিরিয়া হলেও রোগী ফিট হয়ে যায়। মনে চাঞ্চল্য আনে এমন ঘটনার পর, লোকজনের সামনে (এমনকি দীর্ঘক্ষণ) ফিট হয়ে যায় রোগী। একা থাকলে বা ঘুমের মধ্যে সচরাচর ফিট হয় না। শুধুমাত্র সাইকো থেরাপীতেই এই রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব।

সাইকোসিস বা ভ্রমবিকার ঃ এই ধরনের রোগীর ভুল ধারনার রকম অনুসারে তাদের আচরণ ভিন্ন হয়ে থাকে। রোগী মনে করে, তারা ষড়যন্ত্র বা শত্রুতার শিকার। রাগ ও আক্রমনাত্মক ভাবও দেখা যায় তাদের মধ্যে, আড়ম্বরমূলক ভ্রম বিকারের ক্ষেত্রে আবার হাম্বরা ভাব দেখা যায়। অনেক সময় রোগীদের মনে অবাস্তব ভুল ধারনা শিকড় গেড়ে বসে যায়। সে মনে করতে থাকে তার শরীরে দুরারোগ্য রোগ বাসা বেঁধেছে।

স্কিজোফেনিয়া ঃ স্কিজোফেনিয়া মানসিক রোগের ক্ষেত্রে সবচাইতে জটিল ব্যধি। এ ক্ষেত্রে রোগীর চিন্তা, আবেগ, অভিজ্ঞতা, ইচ্ছাশক্তি এবং আচার-আচরণ অসংগতিপূর্ণ হয়ে পড়ে। বয়ঃসন্ধি বা যৌবনের প্রারম্ভে এ রোগের সূচনা হয়। রোগী ক্রমশঃ বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মেলামেশা কমিয়ে দেয়। খাবার, গোসল বা পোশাকের দিকেও নজর দেয় না। আপনজনের প্রতি স্নেহ মায়া-মমতা বোধও কমে যায়। নানা রকম উদ্ভট চিন্তা মনে বাসা বাঁধে। শুধু তাই নয়, রোগী মনে করতে থাকে সবাই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। সবাই তার শত্রু। অনেক সময় রোগী এক বা একাধিক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। অর্থাৎ গায়েবী আওয়াজ শুনতে পায়। যখন তার চারপাশে কোন লোকই নেই, সেই রকম স্থান থেকেও রোগী বিভিন্ন লোকের কথা স্পষ্ট শুনতে পায়। এমনকি ঐ শোনা কথার সে উত্তরও দিতে পারে। আজ পর্যন্ত এ রোগের নিদির্ষ্ট কোন কারণ আবিস্কৃত হয়নি।

পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার বা আবেগের বীকার ঃ আবেগের বিকারের প্রধান লক্ষণ অকারন সুখ বা দুঃখের অনুভূতি। কারণ দুঃখের ভাবকে কেন্দ্র করে যে মনোবিকারের উদ্ভব হয় তাকে বলা হয় বিষন্নতা আর খুশীর ভাবকে কেন্দ্র করে যে মনোরোগ হয় তাকে বলা হয় মেনিয়া। বিমর্ষভাব, শরীরের লক্ষণ হলো জোরে এবং দ্রুতগতিতে কথা বলা, ঘুমের মাত্রা কমে যাওয়া, ক্ষিধে বেড়ে যাওয়া, কথাবলা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

অটিজম ঃ অটিজম একটি চাঞ্চল্যকর মনোরোগ। এই মনোরোগে আক্রান্ত অধুনা বিশ্বের বহু শিশু। টাইম ম্যাগাজিন পর্যন্ত শংকিত এই আশ্চর্য্য জটিল রোগটি নিয়ে। অটিস্টিক শিশুর সংখ্যা আজ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই এ রোগে আক্রান্ত প্রায় তিন লক্ষ শিশু। ভারতেও অটিষ্টিক শিশুর সংখ্যা বাড়ছে। আশ্চর্য্য এসকল বাচ্চাদের হাবভাব। জন্মগত রোগ না হলেও এ রোগে আক্রান্ত শিশু আস্তে আস্তে সমস্ত বিষয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে থাকে। কথা বলার সময় এইসব শিশু চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয় না, অন্যের সঙ্গে মেলামেশায় আগ্রহ থাকে না, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে থাকতে চায় না। কোন কিছুতেই আকর্ষন থাকে না এবং এরা একা থাকতে চায়। পারিপার্শ্বিকের যে কোন পরিবর্তনের ঘোর বিরোধী এ ধরনের রোগী। পরিবর্তন দেখলে এরা বিরক্ত হয়। অথচ যে কোন একটি বিষয় বা অধিগত বিদ্যায় এরা প্রবল পারদর্শী হয়, বিশেষত গণিত বা স্বগোত্রীয় বিষয়ে। যদিও এর কোন ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত মিলেনি। কোন কোন ক্ষেত্রে এদের মধ্যে জড়বুদ্ধি দেখা যায়। ওষুধ দিয়ে অস্বাভাবিক আচার-আচরণ কিছুটা কমানো সম্ভব হয়। তবে এখনও পর্যন্ত অটিজম এর প্রকৃত চিকিৎসা বের হয়নি।

মনের রোগের ক্ষেত্রে সমাজ কতটা দায়ীঃ আদৌও কি সমাজ দায়ী? মনোঃরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায় এর মতে— "সমাজ কোন রকমে দায়ী হতে পারে না। অন্যান্য রোগের মতোই এটিও একটি রোগ, যা হতে পারে আমার, আপনার বা যে কোন লোকের"। কিন্তু আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এদের প্রতি অবহেলা। অজ্ঞতার চেয়েও উদাসীন ভাবটাই বেশী। আবার অনেকের মতে সমাজে যারা প্রোডাক্টিভ নয়, সমাজে যাদের অবদান নেই তাদের সমাজের বাইরে আলাদা করে রাখা উচিত। তবে মূলকথা হচ্ছে সহযোগিতা ও সহমর্মীতাই এসব রোগীর রোগ মুক্তির প্রধান চাবিকাঠি।

মনের স্তর ও জোয়ার ভাটা ঃ মন এক বিচিত্র বহুমাত্রিকতা। তার অনেক স্তর। মন বলি, চেতন বলি, বুদ্ধিচালিত অনুভূতিই বলি, মন বলে সাধারণ মানুষ যা বুঝে তা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। যারা মনের কোন জটিল রোগে ভুগছে তাদের সব চিন্তাই যে বাতিলযোগ্য, অর্থহীন-তা নাও হতে পারে। তারা মাঝে মধ্যে সেরে যেতেই পারে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে ফিরে আসতেই পারে মনের জটিল রোগ। মানসিক রোগীর যে, সবসময় মানসিক ভারসাম্য ঠিক থাকবে না, এমন নয়। কোন এক সময় তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হলেও আবার সাধারনের সমতুল্য হয়ে যেতে পারে। মানসিক রোগের প্রতিকার সম্ভব। শুধু প্রয়োজন যথাযথ চিকিৎসা। কিন্তু ভাবলে শিউরে উঠতে হয় এই ভেবে যে, সমাজ তাদের সেয়ানা পাগল বলেও চিহ্নিত করে। এখনও কোন কোন বাড়িতে মানসিক রোগী থাকলে তাকে লুকিয়ে রাখা হয়। অনেক সময় বাড়ির লোকেরা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়েও যান না। এ সমস্যা তৃতীয় বিশ্বের তথা গরীব দুনিয়ায় আরও অনেক পরিব্যপ্ত ও ভয়াবহ।

মনের রোগ সম্পর্কে কতটা সচেতন আমরা ঃ আমরা এ রোগ সম্বন্ধে দু-আনা সচেতন হয়েছি ঠিকই কিন্তু তাই বলে তাদের সমাজ থেকে বহিঃস্কার করার পেছনে কোন যুক্তি নেই। বরং প্রয়োজন সহানুভূতি। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, স্কিজোফ্রেনিয়ার মত দুরূহ মানসিক রোগের ক্ষেত্রে পরিবারের মধ্যে রেখে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। কারন এই সব রোগের

ক্ষেত্রে, বাস্তব, অতি বাস্তব বা অবাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্যতা হারিয়ে যায়। তবে বারবার প্রশ্ন উঠে যে, আজকে যাদের আমরা ভিক্টিম বলে মনে করতে চাচ্ছি তাদের জায়গা থেকে যদি দেখা যায় তাহলে পৃথিবীটা অন্য রকম দেখাবে। আশ্চর্য এটাই যে, একজন মানসিক রোগী মনে করে সেই সুস্থ্য, অন্যেরা অসুস্থ্য, আবার আমাদের কাছে সে রোগী। আসলে কে সুস্থ্য? সুস্থ্যতার নির্ভুল কোন মাপকাঠি নেই। ডাক্তারের কাছে মানসিক রোগী হলো— A Person with a disorder Person suffering from schizophrenia, but primarily a social person. আবার সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি হলো সে যে চৈতন্যের মধ্যে বসবাস করে সেই চৈতন্যটা আমাদের কাছে সহজপ্রাপ্য নয়।

মনের জটিলতা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্নতা দূর করা কি আদৌ সম্ভব ঃ মন খারাপ নামে এই অসুখটির প্রান্তে দাড়িয়ে বিশ্বে স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানটি চমকপ্রদ। এশিয়া মহাদেশের প্রায় অধিকাংশ জনসংখ্যা তীব্র বিষন্নতায় আক্রান্ত। প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আত্মহত্যা করে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ। এর মধ্যে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় আত্মহত্যার ঘটনা ইদানিং মারাত্মক বেড়ে গিয়েছে। এবং আত্মহননকারীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশী। পরিসংখ্যানে আরও দেখা গিয়েছে বিষন্নতা রোগটিতে আক্রান্ত নারীর সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ। আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় পনের লক্ষ লোক জটিল মানসিক ব্যধিগ্রস্ত। আমাদের দেশে চিকিৎসা সুবিধা সবার জন্য সহজলভ্য নয়। একজন রোগী চট করে তার অসুখের জন্য চিকিৎসা প্রাপ্ত হয় না। মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরও জটিল এ কারনেই যে, বেশীর ভাগ মানসিক রোগী তাদের আসল মানসিক রোগী তাদের আসল মানসিক সমস্যা ব্যক্ত করতে না পারার দরুন সমস্যাসমূহকে শারীরিক সমস্যায় প্রকাশ করেন। ফলে আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা তাকে নিয়ে যান একজন শৈল্য চিকিৎসকের কাছে। তিনি চিকিৎসা করে হাল ছেড়ে দিলে আত্মীয় স্বজনরা তাকে নিয়ে যান আরও বড় চিকিৎসকের কাছে তিনি রোগের নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরে বলেন, তার কোন সমস্যা নেই সে ঠিকই আছে, বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। রোগী কিন্তু তার কষ্ট সহ্য করে যেতেই থাকে। যখন বড় বড় ডাক্তাররা তার হাল ছেড়ে দেন তখন রোগীর আত্মীয় স্বজন স্মরণাপন্ন হন পীর, ফকীর, দোয়া, তাবীজ, ঝাড়-ফোঁক ইত্যাদিতে। অথচ এতে সমস্যা বাড়ে বৈ কমে না।

মানসিক রোগ বনাম চিকিৎসা পদ্ধতি ঃ মনের রোগ সারাতে বর্তমান চিকিৎসা পদ্ধতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ! আদৌ কি এই চিকিৎসা পদ্ধতি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম? নাকি শুধুই মানসিক সান্ত্বনা। সব রকম মানসিক অসুস্থ্যতার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমনঃ শারীরিক উন্নয়ন, মনো বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন। এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে রোগ নিরাময়ে বর্তমান চিকিৎসা পদ্ধতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ডাক্তারী চিকিৎসা বা মেডিকেল থেরাপী, মনোঃ চিকিৎসা বা সাইকোথেরাপি, সামাজিক চিকিৎসা বা সোসিও থেরাপী। মনের রোগীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে সাইকো থেরাপী টনিক হিসাবে কাজ করে।

সাইকো থেরাপী কী এর প্রয়োজনই বা কীঃ সাইকো অর্থ মন থেরাপি অর্থ চিকিৎসা। অতএব সাইকো থেরাপি অর্থ মনের চিকিৎসা। শুধুমাত্র মনের যে কোন অসুস্থ্যতাকে সাইকোথেরাপি দিয়ে সুস্থ্য করা সম্ভব। মানুষের মনের দৃঢ়তা বা আত্মবল মজবুত হয় অভিজ্ঞতার দ্বারা। পরিবেশ থেকে আগত নানা ধরনের চাপ থেকে এই আত্নবল মানসিক ভাবে আমাদের সুস্থ্য রাখে। এই সুস্থ্য থাকার প্রক্রিয়াকে বলে ডিফেন্স মেকানিজম। যেমন এ্যাকসিডেন্ট দেখে কেউ পীড়িত হয়, আবার কেউ হয় না। পীড়িত না হওয়ার কারন পূর্বে এ্যাকসিডেন্ট দেখার অভিজ্ঞতা ও অভ্যস্ততা। যারা পীড়িত হয় তাদের মধ্যে দুঃস্বপ্ন, অরুচি, নিদ্রাহীনতা, ভয়ে সিটকানো, বুক ধড়ফড়ানো, মাথা ব্যথা প্রভৃতি

উপসর্গ দেখা দেয। এই ধরনের উপসর্গ উপশমের জন্য প্রয়োজন হয় সাইকোথেরাপীর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের উপসর্গে ঔষধে কাজ হয় না, বরং ক্ষতি হয়। সাইকোথেরাপী শুরু হয় কথাবার্তা, বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততার মধ্য দিয়ে। এরপর রিলাক্সেশন ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। সাধারনত অনেকেই ধারনা করেন সাইকোথেরাপী বা কাউন্সেলিং হলো সাজেশান, উপদেশ, অনুরোধ, মোটিভেশন বা কোন রেডিমেড সমাধান। ধারনাটি ঠিক নয়। সাইকো থেরাপিষ্ট প্রথমত ধৈর্য্য ও সময় দিয়ে সাইকোথেরাপী কৌশলের মাধ্যমে সমস্যা নিয়ে আসা ব্যক্তির সমস্যা সংক্রান্ত মনকে হালকা করে। এরপর তিনি সাইকো থেরাপী কৌশলের মাধ্যমে ব্যক্তির জ্ঞান ও আত্মবল উন্নয়নে সাহায্য করেন যা ব্যক্তিকে তার সমস্যা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে।

সাইকো থেরাপী যেসব সমস্যার জন্য ঃ

হতাশা ঃ বিয়ে, চাকুরী বা যে কোন বিষয়ে হতাশা।

ঘুম সমস্যা ঃ ঘুম হয় না, ঘুমালেও হালকা ঘুম হয়, নানা ধরনের চিন্তা মনে গিজ গিজ করে।

সুচিবাই ঃ বার বার হাত ধোওয়া, দরজার তালা চেক করা, ছোঁয়াছুঁয়িতে সমস্যা।

মানসিক অশান্তি ঃ নির্যাতনের কারণে মনে নানা ধরনের অশান্তি তৈরী হয়।

ব্যথা ঃ কোন ঘটনা বা টেনশনের কারনে মাথা ব্যথা বা বুক ব্যথা।

ভীতি ঃ যে কোন প্রকার ভয়।

অস্থিরতা ঃ কারো জন্য বা কোন কাজের জন্য বা অতিরিক্ত চিন্তার কারনে অস্থিরতা বা বুক ধড়ফড় করা।

জড়তা ঃ ষ্টেজে বক্তৃতা, গান নাটক বা ইন্টারভিউ দিতে ঘেমে যাওয়া, জড়তা বা কাপাকাপি।

টেনশন ঃ যে কোন প্রকার বিষন্নতা।

মানসিক আঘাত ঃ প্রিয়জনের মৃত্যু, এ্যাকসিডেন্ট, হঠাৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা কোন ঘটনার কারণে প্রাপ্ত মানসিক আঘাত।

গ্যাষ্ট্রিক ঃ গলা জ্বালা পোড়া, এসিডিটি।

শিশুদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে ঃ অমনোযোগী, স্কুল পালানো, স্কুল ভীতি, লিখতে না পারা।

শিশুদের আচরণগত সমস্যা ঃ অত্যাধিক বেয়ারা, বেয়াদপ, অস্বাভাবিক আচরণ, অতিচঞ্চলতা, খাবার খেতে না চাওয়া। উপরোক্ত যে কোন সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য যে কোন ব্যক্তি সাইকোথেরাপীর সাহায্য নিতে পারেন।

সাইকো থেরাপী কিভাবে আপনাকে সাহায্য করবে ঃ যারা সাইকো থেরাপী প্রয়োগ করেন তাদের বলা হয় সাইকোথেরাপিষ্ট। সাইকোথেরাপী সেশন সাধারণত ৪৫ মিনিট থেকে ১ঘন্টা হয়। এটা নির্ভর করে ক্লায়েন্ট বা রোগীর সমস্যার গভীরতার উপর। কেবল এক ঘন্টা সেশন দিয়েই সাইকো থেরাপিস্টের কাজ শেষ হয় না। ক্লায়েন্টের দেয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে তাদের নানা ধরনের গবেষণা করতে হয়। যেহেতু বিভিন্ন মানুষের সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন ফলে কারো মাত্র একটি বা দুটি সেশনই যথেষ্ট আবার কারো কয়েকটি সেশনের প্রয়োজন হয়। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল বয়সের ব্যক্তিদেরকে এরা সাহায্য করতে পারেন। সাইকো থেরাপীর সেশন চলাকালে সাইকোথেরাপিষ্ট ব্যক্তির সমস্যা ভালোভাবে বোঝেন, সমস্যার কারন এবং এর সমাধান কী হতে পারে তার তালিকা তৈরী করেন। এরপর মনোবৈজ্ঞানিক কৌশল দ্বারা সমস্যার মূল কারন বের করেন। অতঃপর নানা ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক প্রসেসের সাহায্যে মূল সমস্যার সমাধান করেন।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব কতটুকু ঃ বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের শতকরা ৫২ ভাগ লোক চরম দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মত মৌলিক চাহিদা পূরনে তারা অক্ষম। চিকিৎসা একটি মৌলিক চাহিদা হলেও দেশের ৮০% লোক সুচিকিৎসার সুযোগ হতে বঞ্চিত। এখানে ৩২৮৬ জন লোকের জন্য হাসপাতালে একটি বেড এবং

৪৯৯৫ জন লোকের জন্য একজন ডাক্তার রয়েছে। যা চিকিৎসার মত মৌলিক চাহিদা পূরনের জন্য অত্যন্ত সীমিত।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় শুধুমাত্র দৈহিক চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে ডাক্তার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা তাদের স্বীয় ভূমিকা পালনে ব্যস্ত ও তৎপর থাকেন। রোগের সাথে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত সামাজিক, মানসিক বা অন্যান্য কারণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এজন্য চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে চিকিৎসা ও মনঃচিকিৎসা সমাজকর্মী রোগের সাথে রোগীর বিভিন্ন দিক যেমন— দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি অনুসন্ধানপূর্বক চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত করে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বাস্তবমূখী ও কল্যাণকর রূপ দিতে পারে।

বাংলাদেশ গণদারিদ্রের শিকার। ৮৭% লোক জীবন ধারনের নূন্যতম মৌলিক চাহিদা পূরনে অক্ষম। চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধ-পথ্য, রক্ত প্রভৃতির ব্যয় বহনে অক্ষম বৃহৎ জনগোষ্ঠি চিকিৎসাবিহীন অবস্থায় দেহে রোগ বহন করে জীবন যাপন করছে। চিকিৎসা সমাজকর্ম এমন অবস্থায় বিভিন্ন সাহায্যকারী ব্যক্তি ও সংস্থা অনুকুলে দল তহবিল গঠন করে দরিদ্র রোগীদের অর্থ, ঔষধ-পথ্য সরবরাহ ও নিশ্চিত করতে পারে। দারিদ্র পীড়িত দেশে দরিদ্র রোগীদের রোগ নিরাময়ে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান ব্যতীত চিকিৎসা ব্যবস্থা ফলপ্রসু করা সম্ভব নয়।

নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের প্রভাব বাংলাদেশের জনগনকে চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে উদাসীন ও অক্ষম করে রেখেছে। তারা চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে যেমন অজ্ঞ তেমনি চিকিসা সুযোগ সুবিধা গ্রহনেও উদাসীন। এক্ষেত্রে ডাক্তার ও নার্সকে অধিকতর সফলতার সাথে দায়িত্ব পালনে সহযোগীতা করতে এবং রোগীকে স্বাভাবিক ও ইতিবাচক করে তুলতে মেডিকেল কাউন্সেলিং খুবই জরুরী একটি বিষয়।

মানসিক ও নানা ধরনের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীদের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে তথ্যের প্রয়োজন অপরিসীম। এ সম্পর্কে চিকিৎসা সমাজকর্মী তথ্য সংগ্রহ করে ডাক্তারকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সহায়ক প্রদান করে থাকে।

রোগীকে সুস্থ্য, স্বাভাবিক এবং কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তার মনোদৈহিক সমস্যা সমাধানের জন্য চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং রোগ সংক্রান্ত তথ্য জেনে রোগীর সাথে হাসপাতাল, চিকিৎসক এবং নার্সদের মধ্যে যোগসূত্র তথা সমন্বয় সাধন করা হয়। যা চিকিৎসা প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসু ও কার্যকরী করে তুলতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। সত্যি কথা বলতে কী, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে চিকিৎসা ও মনঃ চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নাই।

Refferences

1. *Readings in the theory and practice of medical Social Work.* —*Dora Goldstine*
2. *Developmental Psychology: A life Span Approach* — *E.B. Herlock*
3. *Journal of Genetic Psychology*
4. *Psychology and Mental Health* —*Hadfield J.A*
5. *Abnormal Psychology* —*Coleman*

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম

সহকারী শিক্ষক

সূচনা ঃ মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সমাজে একাধিক সম্পর্কের সাথে পরিচিত। এর মধ্যে এমন কিছু মানবিক সম্পর্ক আছে যে গুলো স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদির মাধুর্যে মন্ডিত। শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক সেরকম একটি। এ সম্পর্কটা সর্বাপেক্ষা খাঁটি ও উত্তম সম্পর্ক এটি অন্যান্য সম্পর্ক অপেক্ষা স্বতন্ত্র এবং পবিত্র। এ সম্পর্ক অনাবিল মধুর ও প্রশান্তিপূর্ণ। মনের মনিকোঠায় ও অন্তরের গহীন গহবরে এ সম্পর্কের স্থান। এ সম্পর্ক পিতা পুত্রের সম্পর্কতুল্য। আবার বন্ধুর মত। শাসন ও প্রীতির ডোরে বাধা। এ সম্পর্ক একাধিক রূপের দাবিদার হলেও এর নিজস্ব মত। শাসন ও প্রীতির ডোরে বাধা। এ সম্পর্ক একাধিক রূপের দাবিদার হলেও এর নিজস্ব একটা রূপ বা প্রকৃতি রয়েছে।

শিক্ষকের ভূমিকা ঃ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের রূপরেখাটি সাধারনত দাতা ও গ্রহীতার রূপরেখারই নামান্তর। এই পরম পবিত্র সম্পর্কের স্বতন্ত্র রূপরেখাটি পারস্পরিক যোগ্যতা ও আন্তরিকতার উপর নির্ভরশীল। সামগ্রিকভাবে শিক্ষকের উপরই এর উন্নতি অবনতি ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। কারণ শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। আর একজন শিক্ষকের পক্ষেই সম্ভব ছাত্রকে সর্বতোভাবে ঢেলে সাজিয়ে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলা। সমাজে একটা প্রচলিত কথা রয়েছে,-"পিতা জন্মদেয় ভূত আর শিক্ষক বানায় পুত্র"। অর্থাৎ ছাত্রের উজ্জল ভবিষ্যত গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব অপরিসীম। আর একজন আদর্শ শিক্ষকই এই গুরু দায়িত্ব বহনের যোগ্য পাত্র। সুতরাং একজন আদর্শ শিক্ষক থেকেই একটি আদর্শ ভবিষ্যত আশা করা যায়। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতার আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগরণে আদর্শ শিক্ষকের বিকল্প নেই।

জনগণের কল্যাণ সাধন এবং সমাজে সর্বজনস্বীকৃত ও সমাদৃত আচার-আচরণ ও কর্ম তৎপরতারই পূর্নাঙ্গ আদর্শের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যে গুণগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতা বিকাশ সাধনে একান্ত সহায়ক। শিক্ষকদের জন্য অপরিহার্য বিশেষ গুনগুলোর মধ্যে দায়িত্ববোধ নম্রতা, ভদ্রতা, সৌজন্যমূলক ব্যবহার, স্নেহ মায়ামমতা, দূরদর্শিতা, সহিষ্ণুতা, সততা, সহনশীলতা, বিচক্ষনতা, আত্নবোধ, বিশ্লেষণ ক্ষমতা বিশেষ করে বিষয় ভিত্তিক যোগ্যতা উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখিত গুণগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক তখনই সমাজে বরনীয় ব্যক্তিত্বে পরিচিত যখন শিক্ষার্থীদের পক্ষে তার আদর্শ ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে যার মধ্যে কৃত্রিমতার কোন অবকাশ থাকেনা এবং এই অকৃত্রিম সম্পর্কের সংস্পর্শেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতার আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগরিত হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে একজন আদর্শ শিক্ষকের শিক্ষকতার সফলতার জন্যে সর্বোপরি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা একান্তভাবেই পূর্বশর্ত। পক্ষান্তরে শিক্ষকের শিক্ষকতাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতার আদর্শ ও নৈতিক মুল্যবোধ জাগরিত করে। এখানে প্রনিধানযোগ্য যে, ছাত্র

ও শিক্ষকের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত অপরিহার্য। কোন শিক্ষক যদি দায়িত্ব পালনে কোনরূপ অবহেলা করে থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যই শিক্ষক নামের কলঙ্ক। এতে ভিন্ন মতের অপেক্ষা রাখেনা। অপরপক্ষে স্বীয় দায়িত্ব পালনে তৎপর নিষ্ঠাবান শিক্ষক নিঃসন্দেহে সমাজের চোখে প্রশংসিত। এই দায়িত্বশীল নিঃস্বার্থ যোগ্যতম শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই মানবতার আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধের অধিকারী হয়ে ওঠে।

ছাত্র ও শিক্ষকের কর্তব্য ও দায়িত্বের সমন্বয়ে পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেই সম্পর্কটাই হচ্ছে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে নিষ্কলুষ কাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক। আর এই সম্পর্কের পরম পরশেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিঃসন্দেহে জাগরিত হয় মানবতার আদর্শ ও মূল্যাবোধ। ছাত্র শিক্ষকের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের আন্তরিকতা ও তৎপরতা দ্বারাই ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক মধুময় ও প্রশান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং ছাত্র শিক্ষকের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক কলুষিত হতে বাধ্য যা মানব সমাজের কাম্য নয়। পিতার পর ছাত্রদের স্নেহ করার যদি কেহ থাকেন তবে তিনি হচ্ছেন শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের আচার আচরণ, স্বভাব-চরিত্র সমস্ত কিছুই শিক্ষকের উপদেশ ও অনুকরনেই গড়ে ওঠে। কাজেই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত জীবন গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব অনস্বীকার্য।

পিতা হিসাবে শিক্ষক ঃ অনেক সময় শিক্ষককে পিতার ভূমিকায় অবতীর্ন হতে হয়। কারণ এটা ভুলে গেলে চলবেনা যে শিক্ষক শুধু একজন শিক্ষকই নন তিনি একজন পিতাও বটে। শিক্ষক যখন পিতার আসনে আসীন হবেন তখন এই ছাত্র রূপ সন্তানটি ভবিষ্যত জীবন গঠনে পিতৃস্নেহের পরশ দ্বারা তাকে স্বীয় ঔরসজাত সন্তানের মত স্নেহ সক্ত মায়াঘেরা একাগ্রতার মাধ্যমে শিক্ষাদান করবেন। যে শিক্ষক ছাত্রদেরকে স্বীয় সন্তান সদৃশ স্নেহ মায়া ও যত্নদানে ব্যর্থ, সে শিক্ষক তার শিক্ষকতা ক্ষেত্রেও সফলতা অর্জনে ব্যর্থ। এই ব্যর্থ শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা নিতান্তই বিষাক্ত। সুতরাং, এই বিষাক্ত সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতার মূল্যবোধ ও মানবতার আদর্শ জাগরণে যারপর নেই ব্যর্থ।

বন্ধু হিসাবে শিক্ষক ঃ ছাত্রদের উজ্জল ভবিষ্যত গঠনে বন্ধুত্বের ভূমিকাও অস্বীকার করা যায়না অর্থাৎ শিক্ষক ছাত্রের জন্য একজন বন্ধুও বটে। কারণ অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি মেলা মেশায় কেমন যেন একটু ইতস্তত ও লজ্জাবোধ করে থাকে। এমতাবস্থায় শিক্ষকের উচিত শিক্ষাদানের ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রদের জন্য এমন সুযোগ করে দেয়া যাতে করে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে বন্ধুর ন্যায় আচরণের মাধ্যমে নিজেকে স্বীয় শিক্ষকের নিকট প্রকাশ করতে পারে। আর শিক্ষক তার এই ছাত্র রূপ বন্ধুটিকে এমনভাবে গ্রহণ করবেন যাতে তার এই পবিত্রতম বন্ধুত্বে কোনরূপ কৃত্রিমতা প্রকাশ না পায়। এইরূপ অকৃত্রিম বন্ধুত্বের মাধ্যমেই ছাত্ররা খুঁজে পেতে পারে তাদের উজ্জল আদর্শ ভবিষ্যত। সুতরাং ছাত্র শিক্ষকের এই পবিত্রতম সম্পর্কটাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতার আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগরনে সমর্থ।

বন্ধুত্বের বৈশিষ্ট্য ঃ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ছাত্র শিক্ষকের বন্ধুত্বের প্রতি খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ শালীনতা বিবর্জিত বন্ধুত্বের সমধিক বিচ্যুতির আশংকা বিদ্যমান। এ বন্ধুত্বের সম্পর্কটা হবে স্ব স্ব অবস্থান বজায় রেখে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি না দিয়ে।

ছাত্র শিক্ষকের বন্ধুত্ব যদি চরিত্র অবক্ষয়কারী সমাজের তথাকথিত প্রচলিত বন্ধুত্বের রূপ রেখায় হয় তাহলে অবশ্যই এটা সমাজের চোখে ঘৃনিত সম্পর্ক হিসাবে চিহ্নিত হতে বাধ্য। তাই আদর্শ বিবর্জিত বন্ধুত্ব ত্যাগ করে সর্বজন সমাদৃত আদর্শের মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে উঠলেই কেবল শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতার আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হতে পারে।

মাইল ফলক হিসাবে শিক্ষকের গুণ ঃ

শিক্ষকের প্রতিটি গুনই শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাইল ফলকের ন্যায় কাজ করে থাকে। বিশেষ করে চারিত্রিক গুণাবলীর স্থান সর্বোপরি, বলাবাহুল্য যদি কোন শিক্ষকের চরিত্রের কোন ক্রুটি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ধীরে ধীরে ছাত্রদের অন্তর থেকে ঐ শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বিদায় নিতে বাধ্য হয়। কেননা, চরিত্রহীন শিক্ষক অবশ্যই শিক্ষক সমাজের কলংক।

ডাক্তার হিসাবে শিক্ষক ঃ অনেক সময় শিক্ষককে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ভূমিকাও পালন করতে হয়। কারণ নির্ভূল রোগ নির্নয় করে যে ডাক্তার ঔষধের ব্যবস্থা করে থাকেন তিনি অবশ্যই রোগ নির্মূলেরও পরিচিতি লাভ করেন। শিক্ষককে ছাত্রদের লেখা পড়ার অমনোযোগীতার মূল কারণ নির্নয় করে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় শিক্ষকতার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তাকে গ্লানির বোঝাই বহণ করতে হবে। এরূপ শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদর্শের সারা জাগানো এবং নৈতিকতার মূল্যবোধ সৃষ্টির কোন আশাই করা যায় না। এমতাবস্থায় ছাত্রদের অমনোযোগীতার মূল কারণ নির্নয় করতে হলে শিক্ষককে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসাবে ভূমিকার কোন বিকল্প নেই। লেখা পড়ার ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষন করতে না পারলে শিক্ষকের শিক্ষকতা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ।

পারস্পারিক বিনিময়ে সম্পর্ক ঃ স্নেহ, মায়া মমতা, যত্ন ও বন্ধুত্বের বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে শিক্ষক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকেন। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতার আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ জেগে ওঠে যার ফলে এই সর্বজন সমাদৃত সম্পর্কটাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতার আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগরণের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

পারস্পারিক দেনা-পাওনার সম্পর্কঃ ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কটা দাতা ও গ্রহিতার সম্পর্কেরই বিশেষ রূপ। অর্থাৎ ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক দেনা পাওনার ভূমিকাও অনস্বীকার্য। এটা দিবা লোকের মত সত্য যে, শিক্ষক শিক্ষাদান করেন। অপরপক্ষে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহন করে থাকে। এতে শিক্ষকরূপ দাতার দান এবং ছাত্ররূপ গ্রহীতার গ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের মধুরতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। এতে কোন ব্যতিক্রম পরিনতি হয় না। কিন্তু বর্তমানে প্রাইভেট টিউশনিতেও ছাত্র শিক্ষক পারস্পরিক বিনিময়ের একটা ক্ষেত্র বিদ্যমান। এক্ষেত্রে কিন্তু ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি ঘটা বিশেষভাবে সক্রিয়, তাই এক্ষেত্রে বিশেষ সতকর্তা অবলম্বন না করলে হিতে বিপরিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ মানুষ সাধারনত সম্পদ পিপাসু, স্বার্থপর স্বভাবের হয়ে থাকে। সে নিজে বেশী পেতে চায়, অথচ নিঃস্বার্থে কিছু ব্যয় করতে নারাজ। যেখানেই স্বার্থ সেখানেই সংঘাত। সম্পর্কের অবনতি অবধারিত। এমতবস্থায় শিক্ষক নিঃস্বার্থ স্বভাবের অধিকারী না হলে ছাত্রদের সংগে যে সম্পর্ক তৈরি হবে তা হবে মানবতা আদর্শ ও নৈতিক বোধের সম্পূর্ন পরিপন্থী।

পারস্পরিক সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক ঃ আগেই বলা হয়েছে যে, ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কটা মধুস্বরূপ। উভয়েরই সহানুভূতিশীল হতে হবে। বন্ধু প্রীতি এবং পিতার স্নেহ দিয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদের শিক্ষা দিবেন। ছাত্ররা ঠিক তেমনিভাবে শিক্ষককে শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিয়ে সম্পর্কটা মধুময় করে তুলবে। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের যে কর্তব্য রয়েছে তা তারা নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। ছাত্ররা হবে বিনয়, নম্র। আর শিক্ষকগণ হবেন ছাত্রদের প্রতি উদার ও স্নেহশীল। এইরূপ পারস্পরিক সহানুভূতির উপরই ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক নির্ভরশীল।

শিক্ষকের মহত্ত্ব ঃ শিক্ষকের মহত্ত্ব নির্ভর করে তার ঐকান্তিক একাগ্রতা ও সৎ উদ্দেশ্যের উপর। কেননা, শিক্ষার্থী হবে শিক্ষকের জীবনের একমাত্র ব্রত। শিক্ষক স্বীয় সঞ্চিত জ্ঞান ভান্ডার থেকে অকাতরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানদান করবেন এবং সমস্ত প্রকার সাহায্য, সহানুভূতি

দিয়ে তাদেরকে সঠিক মানুষ হিসাবে গড়ে তুলে নিজেকে ধন্য করবেন। শিক্ষক যদি আদর্শবান সৎ নীতি, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও কর্মঠ হন তাহলে অবশ্যই ছাত্ররা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করবে এবং তার জীবনাদর্শ অনুকরণ করে ভবিষ্যতে মানুষের মত মানুষ হতে পারবে। অপর পক্ষে অর্থ উপার্জনই যদি শিক্ষকের একমাত্র লক্ষ্য হয় তাহলে সে শিক্ষক নামের সম্পূর্ন অযোগ্য।

দক্ষ নেতৃত্ব উপহার ঃ একজন যোগ্য শিক্ষক তার যোগ্যতা দ্বারাই জাতিকে যোগ্যতর, দক্ষ নেতৃত্ব উপহার দিতে পারেন। অপর পক্ষে সুবিচার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় অযোগ্য শিক্ষকের কোন মূল্য নেই। সুন্দর জাতি গড়তে সুশিক্ষার দ্বারা চারিত্রিক গুনাবলী ও যোগ্যতা অজির্ত হতে পারে ছাত্র শিক্ষকের সুসম্পর্কের মাধ্যমে। সুতরাং ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কটাই শিক্ষার্থীদের জীবনে সফলতা বয়ে আনতে সক্ষম।

বদ মেজাজের কুপ্রভাব ঃ অনেক সময় শিক্ষকের বদ মেজাজ দ্বারা ছাত্রদের অপূরনীয় ক্ষতিসাধিত হয়, কারণ মেজাজের তাড়নায় শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি যত্নবান হতে পারেন না। ফলে ক্লাশে ছাত্ররা শিক্ষকের প্রতি বিরক্তি মনোভাব পোষন করে থাকে। এতে ছাত্ররা অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য নৈতিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে শিক্ষককে অবশ্যই নৈতিকতার উদাহরণ পেশ করতে হবে।

জবাবদিহিতার সুফল ঃ স্বীয় বিবেকের কাছে জবাবদিহিতার ভিত্তিতে যে শিক্ষক তার শিক্ষকতা জীবনে আত্মনিয়োগ করেন তার পক্ষেই সম্ভব ছাত্রদের জন্য একটা নির্ভেজাল সম্পর্ক উপহার দেওয়া। যার সিঁড়ি বেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতার আর্দশ ও নৈতিক মূল্যবোধের আগমন ঘটে।

শিক্ষার্থীদের নির্ভরশীল আশ্রয় ঃ এটি দিবালোকের মত সত্য যে, শিশু সন্তানটি যেমন পিতামাতার উপর নির্ভরশীল তেমনি একজন ছাত্রও শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। শিশু সন্তানটি যেমন মাতা পিতা থেকে তার শিশু জীবনের যাত্রা পথের প্রয়োজনীয় অজানা জ্ঞান সন্ধানে মাতা পিতা ছাড়া অন্য কাউকে সে মেনে নিতে পারেনা এবং মাতা পিতার আচার আচরণই তার মধ্যে ভবিষ্যত জীবনের জন্য সক্রিয় ভাবে কাজ করে থাকে তেমনি একজন শিক্ষার্থীও তার অজানা জ্ঞানের সন্ধানে শিক্ষক ছাড়া আর কাউকে মেনে নিতে প্রস্তত নয়। এমতাবস্থায় শিক্ষক যদি সত্যিকার শিক্ষক না হন তা হলে ছাত্রদের যাত্রাপথ হয় কন্টকপূর্ন। সুতরাং শিক্ষার্থীদের মানবতার আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগরনে সত্যিকার শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম।

শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ঃ ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের পূনাঙ্গ রূপদানে শিক্ষর্থীদের ভূমিকা একান্ত আপরিহার্য। শুধু শিক্ষকের একতরফা ভূমিকার উপর নির্ভরশীল সম্পর্ক অবশ্য অর্ধাঙ্গ সম্পর্কের নামান্তর। সুতরাং সম্পর্ক পূনাঙ্গ ও অর্থবহ করতে হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বিশেষ কতগুলো গুণের প্রযোজনীয়তা রয়েছে। তার মধ্যে শৃংখলাবোধ, মূল্যায়ন ক্ষমতা ও জ্ঞান ধারা শক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার ঃ পরিশেষে বলা যায় ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক মানেই মানবতার আদর্শ ও নৈতিক বিকাশের একমাত্র প্রতিশ্রুতি। এ সম্পর্ক যে মানুষের অন্য সম্পর্কের তুলনায় বিশেষ তাৎপর্যমন্ডিত তা বলাই বাহুল্য। শুধু শিক্ষায় তনের চৌহদ্দির মধ্যে এই সম্পর্ক সীমাবদ্ধ থাকেনা। এ সম্পর্ক জীবন ব্যাপী বজায় থাকে। যতদিন ছাত্র জীবিত থাকে ততদিন আদর্শ শিক্ষকের কথা তার মনে পড়বে। পূর্ব কালে শিষ্য গুরুকে জগৎ গুরুর স্থলাভিষিক্ত মনে করত আর গুরু শিষ্যকে নিজের প্রতিনিধি মনে করত। বর্তমান ব্যক্তি স্বতন্ত্রের যুগেও আদর্শ শিক্ষক ছাত্র সেই প্রাচীনকালের গুরু শিষ্যের উপযুক্ত উত্তরাধীকার রুপে পৃথিবীর বুকে মূর্তিমান এবং পবিত্র মধুর স্নেহ প্রীতির সুকোমল দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ আছে।

বিশ্বজুড়ে নারীদের কীর্তি গাঁথা

আসমা জাহান

সহকারী শিক্ষক

সমাজ জীবনের সর্বত্র নারীর অংশ গ্রহণ ব্যতীত সভ্যতার চরম বিকাশ সম্ভব নয়। বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। কোন দেশের প্রায় অর্ধেক লোককে বাদ দিয়ে সেই দেশ কখনো উন্নতি সাধন করতে পারে না। তাইতো যথার্থই কবি বলেছেন ঃ—

" বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ কর,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু হতে নারীরা সভ্যতার বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাদের অনবদ্য কীর্তির জন্য তারা কালের ইতিহাসে ভাস্কর হয়ে আছেন। নীচে কতিপয় বিখ্যাত নারীদের নিয়ে আলোচনা করা হল।

মাদার তেরেসা ঃ বিশ্বের মহীয়সী নারীদের মধ্যে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব মাদার তেরেসা ১৯৯০ সালের ২৭ শে আগষ্ট আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহন করেন। তার আসল নাম Agnes gonxho Bejaxhiu তিনি আর্তমানবতা ও দুঃস্তদের সেবা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত। মাদার তেরেসা ১৮ বছর বয়সে থরেটোর স্কুলে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এ স্কুলে শিক্ষাদান করেন। এরপর তিনি ভারতের দুঃস্থ, গরীব অসহায় মানুষের কল্যাণের লক্ষে মট ত্যাগ করে ভারতের পথে রওনা হন। এ জন্য তিনি পোপের নিকট অনুমতি লাভ করেন। কলকাতার রাস্তায় পড়ে থাকা কুষ্ঠ রোগী, দুঃস্থ, গরীবদের গৃহে সেবা শুশ্রুষা প্রদান করেন। যাতে করে তারা সম্মানের সাথে জীবনযাপন করতে পারে। তিনি কলকাতায় একটি এতিমখানা স্থাপন করেন। আরো কয়েকজন সন্নাসী মহিলা তার সাথে যোগদান করে। ১৯৫০ সালে মিশনারীজ অব চ্যারিটি নামে একটি সংঘ স্থাপন করেন। এ সংঘ পৃথিবীর সর্বত্র সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। মাদার তেরেসার এই মহান কাজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। মাদার তেরেসা তার সর্বক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৯৭ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানে মিশনারীজ অব চ্যারিটি এর ১২০০ শাখা রয়েছে। এই সেবাময়ী নারী ১৯৯৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার এই অবদান পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

মার্গারেট থ্যাচার ঃ ব্রিটেনের ১ম মহিলা প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহন করেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে রসায়নে বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি হাউজ অব কমন্সের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে রক্ষণশীল পার্টি জয়লাভ করলে শিক্ষা ও বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা লাভ করেন। ১৯৭৯ সালের ৩মে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল পার্টি জয়লাভ করে এবং মার্গারেট থ্যাচার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি রোডেশিয়ার সংঘর্ষ নিরসন করে কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন করেন। তার সময়ে ফলল্যান্ড যুদ্ধ সংগঠিত হয়। তাকে 'লৌহ মানবী' (Iron Lady) উপাধি দেয়া হয়েছে। তিনি ১১ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন।

মাদাম কুরী ঃ বিখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানী মাদার কুরী ১৮৬৭ সালে ওয়ারসে জন্মগ্রহন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ফ্রান্সে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজ করার জন্য জগদ্বিখ্যাত। তিনি দুবার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৩ সালে হিনরী বিবারেল এবং স্বামী পিয়েরে কুরীর সংগে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি রেডিয়াম নামক মৌলিক পদার্থ আবিস্কার করেছেন। ১৯১১ সালে পদার্থ বিদ্যায় এককভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মাদামকুরী তার আবিস্কারের জন্য বিজ্ঞানের আকাশে উজ্জল নক্ষত্র হিসাবে চিরকাল বিদ্যমান থাকবেন।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলঃ ইংরেজ সেবিকা ফ্লোরেন্স ১৮২০ সালে জন্মগ্রহন করেন। তিনি যুদ্ধাহতদের সেবা, আধুনিক নার্সিং ব্যবস্থার প্রবর্তন, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং আধুনিক স্যানিটারী ব্যবস্থার জন্য স্মরণীয়। ১৮৫০ সালের দিকে তিনি নার্স হিসেবে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় তিনি একদল সেবিকা নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং যুদ্ধে আহত বৃটেন সৈন্যদের সেবা প্রদান করেন। ১৮৬০ সালে নার্সিং বিষয়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা বর্তমানে নার্সদের প্রশিক্ষণের জন্য মডেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তিনি প্রথম মহিলা যিনি প্রথম ব্রিটিশ অর্ডার অব মেরিট পদে ভূযিত হন। তিনি তার সেবামূলক কাজের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ইসাবেলা পেরন ঃ ইসাবেলা পেরন ১৯৩১ সালে আর্জেন্টিনায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তার স্বামী জোয়ান পেরনের মৃত্যুর পরে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করেন। জুয়ান পেরন যখন স্পেনে নির্বাসিত ছিলেন তখন তিনি তার সচিব হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬১ সালে তারা দুজন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। যখন জুয়ান পেরন আর্জেন্টিনায় ফিরে আসেন তখন তিনি প্রেসিডেন্ট এবং ইসাবেলা ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি দেশের প্রকট অর্থনৈতিক সমস্যা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশের মুখোমুখি হন। ১৯৭৬ সালে সামরিক জান্তা জেনারেল জর্জ রাফাম্পেল ভিদেলা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং গৃহবন্দী রাখেন। ১৯৮১ সালে তিনি মুক্তি পান। তারপর স্পেনে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন।

ইন্দিরা গান্ধী ঃ ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি তার জীবনের শুরুর দিক হতেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর তিনি তার বাবা প্রধান মন্ত্রী জহুহর লাল নেহেরুর ব্যক্তিগত সহকারী নিযুক্ত হয়ে কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে কার্যকরী কমিটির সদস্য হন এবং ১৯৫৮ সালে দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। তার পিতার মৃত্যুর পর তিনি লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মন্ত্রণালয়ের তথ্যমন্ত্রী পদ গ্রহন করেন। শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর ১৯ জানুয়ারী ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে জয় লাভ করে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি তার পিতার সমাজতন্ত্র এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন থেকে সরে যাবার জন্য সমালোচিত হন। ১৯৬৯ সালে কংগেস খন্ড বিখন্ড হয়ে গেলে তিনি তার দল নিয়ে ১৯৭১ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তিনি পাকিস্তান সমস্যাকে দক্ষতার সাথে মোকাবেলার জন্য প্রশংসা অর্জন করেন এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। দুর্নীতি এবং দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ইন্দিরা গান্ধী সবার প্রশংসা অর্জন করেন। তিনি উৎপাদনের উপর জোর প্রদান করেন। তিনি আমেরিকা থেকে খাদ্য সাহায্য এবং আরব

বিশ্ব হতে তেল আনয়নে সাফল্য অর্জন করেন। ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময়ের ইন্দিরা গান্ধী ভারতের জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন।গণতান্ত্রিক ধারাকে লংঘন করার জন্য তিনি সমালোচিত হন। গান্ধী ১৯৭৭ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন করেন এবং পিপল এ্যালায়েন্সের নেতা মোরারজি দেশাইর নিকট পরজিত হন। ১৯৮০ সালে পুনরায় ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করেন। পাঞ্জাবের অমৃতসরে স্বর্ণমন্দিরে আক্রমনের জন্য পরবর্তীতে দুই শিখ দেহরক্ষীর দ্বারা নিহত হন।

হেলেন কিলার ঃ এই মহিয়সী নারী ১৮৮০ সালের জুন মাসে আমেরিকায় জন্মগ্রহন করেন। তিনি একাধারে, লেখিকা শিক্ষিকা, মানবহিতৈষী ছিলেন। তিনি ১৯ মাস বয়সে অন্ধ এবং বধির হয়ে যান। তার মস্তিস্কে ক্ষতির ফলে জর হয়ে তিনি এ ক্ষমতা হারান। তিনি শুধুমাত্র মূর্ছারোগ গ্রস্ত হাসি এবং প্রচন্ড শব্দের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারতেন। তথাপি তিনি তার শিক্ষিকা এ্যামী ম্যানসফিল্ড মুলিভানের সহায়তায় ব্রেইলী পদ্ধতিতে পড়তে শিখেন এবং বিশেষ ধরনের টাইপ রাইটার ব্যবহার করে লিখতে পারেন। তাদের দুজনের ওপর ভিত্তি করে হেলেন কিলার মিরাকল ওয়ার্কার নামে একটি বই লিখেন। ১৯৬০ সালে এই বই পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করে। ১৯০৪ সালে তিনি রগডক্লিফ কলেজ হতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এরং লেখিকা ও শিক্ষিকা হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন। তিনি প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য বিশ্বব্যাপী হতবিল যোগাড় করেন। বহুঘুণে গুনান্বিতা এই নারী মানব ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। হেলেন কিলার ১৯৬৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

শ্রী মাভোবন্দর নায়েক ঃ বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভোবন্দর নায়েক ১৯১৬ সালে সিংহলে জন্ম গ্রহন করেন। ১৯৬০ সালে সাধারণ নির্বাচনে তার দল জয়লাভ করলে তিনি প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন। তার স্বামী ওঘৌউ বন্দরনায়ক ১৯৫৬ সালে প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৯৫৯ সালে গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হন। ১৯৬০ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করলে তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি তার স্বামীর মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমাজতন্ত্র, জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম, সিংহরীজ ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করেন। তিনি ১৯৭০ সালে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তখন তিনি সকল প্রকার শিল্পকে জাতীয় করণ করেন। তিনি তার দেশের অর্থনৈতিক মন্দা অপসারণ করতে পারেনি। এক সময় তার সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা হরন করা হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট জয়াবর্ধনে আবার তার রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করেন। এই রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান নারী ২০০১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তারা মেয়ে চন্দ্রিকা কুমারাতুংগা বর্তমানে শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট।

বেগম রোকেয়া ঃ বাংলাদেশে নারী শিক্ষার পথিকৃত বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। উপ-মহাদেশে নারী শিক্ষার বিস্তারের অগ্রদূত হিসেবে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি প্রথম নারীদের কুসংস্কারমুক্ত, স্বাবলম্বী করে তোলার প্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি নারীদের শিক্ষাদানের জন্য সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি প্রবন্ধ, ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে নারী শিক্ষার উপযোগিতার প্রচার-চালিয়েছেন। তিনি কিছু বিখ্যাত বই রচনা করেন। তার মধ্যে অবরোধ বাসিনী মতিচুর সুলতানার স্বপ্ন অন্যতম। এই মহিয়সী নারী ১৯৩২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

বেনজীর ভুট্রো ঃ বেনজীর ভুট্রো পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলীর ভুট্রোর কন্যা। তিনি মুসলিম বিশ্বের মধ্যে প্রথম মহিলা প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন। বেনজীর বুট্রোর

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন এবং অক্সফোর্ড দর্শন, অর্থনীতি ও রাষ্টবিজ্ঞানের উপর পড়াশুনা করেন। ১৯৭৯ সালে তার বাবার ফাঁসির পর সামরিক শাসক মোহাম্মদ জিয়াউল হকের সময় তিনি তার পিতার রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপস্তান পিপলস পার্টির প্রধান নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সাল হতে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত মাঝে মাঝেই গৃহবন্দী অবস্থায় থাকেন। ১৯৮৪ সালে পাকিস্তান ত্যাগ করেন। ১৯৮৬ সালে সামরিক শাসন উঠিয়ে নেয়ার পর জিয়ার বিপরীতে প্রাধান নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৯৮৮ সালে বিমান দুর্ঘটনায় জিয়াউল হকের সহস্যময় মৃত্যুর পর পাকিস্তানের রাজনীতিতে শুন্যতার সৃষ্টি হয় এবং তার দল পার্লাওে দারিদ্র, দুর্নীতি এবং ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত অপরাধ নিরোধ করতে পারেননি। ১৯৯০ সালে রাষ্ট্রপতি গোলাম ইসহাক দুর্নীতির অভিযোগ এনে তার সরকারকে ভেঙ্গে দেয়, পরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি নওয়াজ শরীফের নিকট পরাজিত হন। তিনি ১৯৯৩ সালে পুনরায় কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি স্বৈরশাসক মোশারফের সময় ইংল্যান্ডে অবস্থান করছেন। তিনি সামরিক শাসন বিরোধী জনমত তৈরির চেষ্টা করছেন। বেনজীর ভুট্টোকে ডটার অব দ্য ইষ্ট' বলা হয়।

শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহের চেয়েও, স্বীয় সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর দয়া বেশি।-আল হাদীস

শিক্ষা, শিক্ষার্থীর বর্তমান পরিবেশ ও করণীয়

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

সহকারী শিক্ষক

"Education is the backbone of a nation" শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, এটা আমরা সবাই জানি। একটা জাতিকে সকল দিক থেকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা, তথা শিক্ষা ব্যবস্থা সরকার পরিবর্তনের সাথে সংগতি বিধান করে চালিত। যা একটি চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই আমাদের শিক্ষাকে এই চক্রের আবর্তন থেকে বের করে আনা উচিত। কিভাবে তা করা সমম্ভব এই নিয়েই আজকের আলোচনা।

প্রথমেই আলোচনা করা যাক শিক্ষা কি শিক্ষার আভিধানিক অর্থ অভ্যাশ শেখা, অধ্যয়ন এবং চরিত্রোন্নতি। White Head তার "Aims of Education" এ শিক্ষার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা'হল জ্ঞান বিজ্ঞান সদ্ব্যহারের কলা কৌশল অর্জন করা। অন্যভাবে বলা যায় আচরনের কাংখিত পরিবর্তনই শিক্ষা। শিক্ষার সংজ্ঞানুযায়ী বর্তমানে কোনটাই অর্জন হচ্ছে না।

এবার আলোচনা করা যায় শিক্ষার্থী কারা ঃ

সাধারণ অর্থে যারা শিক্ষা গ্রহণ করে তারাই শিক্ষার্থী যাকে ইংরেজীতে বলা হয় "Student" Student শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

S = Sincere বা সরল, সাধু।
T = Tactful বা কৌশলী।
U = Unity বা একতা।
D=Discipline বা শৃংখলা, সময়ানুবর্তিতা।
E = Equality বা সমতা
N = Noble বা বিনয়ী
T = Truthfulness বা সত্যবাদী

কিন্তু এর কোনটিই বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেই বললেই চলে। এগুলো না থাকার মূল কারণ বর্তমান পরিবেশ। শিক্ষার উপর যে সকল পরিবেশ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছে এদের মধ্যে প্রধান প্রধান হলঃ—

(ক) রাজনৈতিক পরিবেশ।
(খ) সামাজিক পরিবেশ।
(গ) প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক পরিবেশ।

এদের মধ্যে শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে চলছে রাজনৈতিক পরিবেশ, আমাদের দেশে বর্তমানে প্রচলিত রাজনীতি সুস্থ চিন্তা ধারা বিকাশের পরিবেশকে বাধাগ্রস্থ করছে।

একজন শিক্ষার্থীর প্রধান কাজ হল শিক্ষা গ্রহন করা সেই শিক্ষা গ্রহন করতে হলে তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। বর্তমানের চিত্র ভিন্ন, একজন শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি না মেনে বাহিরের পরিবেশ দ্বারা বেশীভাগ ক্ষেত্রে প্রভাবিত হচ্ছে। কিন্তু এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে বর্তমান শিক্ষার্থীকে উদ্বারের প্রধান দায়িত্ব মা-বাবা বা অভিভাবকের

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে শিক্ষাকের কি কোন দায় দায়িত্ব নেই। নেই বলছিনা ভাবতে হবে শিক্ষক এর সামর্থ ও সীমাবদ্ধতার কথা, অর্থাৎ কিভাবে শিক্ষকগন ব্যবহৃত বা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন।

তারপর ও বলা হয়, শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর কিন্তু এই কারিগরের নিকট একজন শিক্ষার্থী কত সময় থাকে, বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৫২ দিন সাপ্তাহিক ছুটি। ৮৫ দিন সরকারী ছুটি বাদ দিলে থাকে ২৮৮দিন। এছাড়া বিভিন্ন সরকারী কার্যক্রম ও পরীক্ষার জন্য বন্ধ থাকে প্রায় ৮০ দিন তাহলে বাকী থাকে ১৪৮ দিন। এই ১৪৮ দিনে গড়ে ১ শিফ্‌টের স্কুলে অবস্থান করে (১৪৮

দিন×৫ঘন্টা)=৭৪০ ঘন্টা মাত্র। অপরদিকে মা-বাবা অভিভাবকের নিকট থাকে (২১৭দিন×১৯ঘন্টা) =৪১২৩ ঘন্টা এর ২ শিফ্টের স্কুলে শিক্ষার্থী অবস্থান করে (১৪৮দিন×৪ঘন্টা)=৫৯২ ঘন্টা।

অপরদিকে অভিভাবকের নিকট থাকে (২১৭দিন×২০)=৪৩৪০ঘন্টা। তাছাড়াও বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ৭৪০ ঘন্টা ও ৫৯২ ঘন্টা অবস্থানের বাকী সময় (১৪.৪৪×১৯)=২৮১২ ঘন্টা এবং (১৪৮×২০)=২৯৬০ ঘন্টা সর্বমোট (২৮১২+২৯৬০)=৫৭৭২ ঘন্টা অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে অবস্থন কালে সে কি করে, কোথায় যায়, কার সাথে মিশে তা দেখার দায়িত্ব সম্পূর্ণ অভিভাবকের। স্কুলে অবস্থান কালীন সময় শিক্ষার্থী কোন প্রকার অপরাধ মূলক কাজ করতে পারেনা, করলেও তার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু বাকী সময়ের দায়িত্ব নিশ্চয়ই শিক্ষককের নয়। মাতা-পিতা সন্তানের সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু সে হিসেবে তাকে সঠিক পথে চালনা করা মাতা-পিতার প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিৎ।

বর্তমান পরিবেশে শিক্ষার্থী এই দীর্ঘ সময় যখন অভিভাবকের নিকট থাকে তখন তাকে সময়ের সঠিক ব্যবহার এবং সঠিক পথে চলতে অধিকাংশ অভিভাবকগণই সময়োচিত ভূমিকা রাখতে পারি না।

তা ছাড়া একজন শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষক বিশেষ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ভাল ভাবেই চিনেন ও জানেন, অথচ শিক্ষার্থীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকের মতামত গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় ছাত্রর মতামতের, একজন ছাত্র কোন বিষয়ে এ পড়বে তা নিধারণ করেন ছাত্র বা অভিভাবক। এখানেই শেষ নয় কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রের সামনেই অপমান করা হয় শিক্ষককে। যা একজন শিক্ষকের জন্য যে কতটুকু কষ্ঠের তা হয়তো অভিভাবকগণ অনুমান করতে পারেন না। তবে শিক্ষাকের ভুল থাকতে পারে কারণ একজন শিক্ষকও মানুষ। কোন শিক্ষেকের ভুল হলে অভিভাবকগণ ছাত্রের সাথে নয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সাথে আলাপ করতে পারেন। আবার অনেক অভিভাবক মনে করেন ছাত্রের শিক্ষার চেয়ে বেশী প্রয়োজন ক্লাশ প্রমোশনের, কেউ কেউ পরীক্ষায় পাশ না করলে শিক্ষকের সাথে পরামর্শ না করে তদ্বির নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

তাহলে ভেবে দেখুন সে সব অভিভাবকগণ জোর করে কোন বিদ্যা শিক্ষা অর্জন সম্ভব কিনা? শিক্ষার্থীর জীবনে পরীক্ষা হল তার শিক্ষার মূল্যায়নের চাবিকাঠি। সে পরীক্ষায় যদি শিক্ষার্থীকে তদ্বির বা নকল করার সুযোগ দিয়ে পাশ করানুর চেষ্টা করা হয় তবে তাকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে বৈকি।

এমন অবস্থা থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মকার তথা শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন ঃ—

প্রথমত ঃ ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকের সুম্পর্ক। অনেক শিক্ষার্থী বলে থাকে স্কুলে ক্লাশ হয় না, যে স্কুলে আসেনা সে কি করে জানে স্কুলে ক্লাশ হয় না। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের তার কথায় বিশ্বাস না করে তাকে স্কুলে পাঠাতে হবে এবং এর সত্যতা যাচাই করার জন্য অভিভাবকের নিজের খোজ নিতে হবে তা হলেই শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ অভিভাবককে তার সন্তানের ভর্তির ক্ষেত্রে তদ্বির বাদ দিয়ে মেধার দিকে নজর দেয়া উচিৎ, তানাহলে ঐ সন্তানের সর্বনাশ ছাড়া কিছুই হবে না।

যে সকল অভিভাবক এসব করে থাকেন তাদের ছেলে মেয়েরা মাতা -পিতা কিংবা শিক্ষক কাউকেই সম্মান করেনা কারণ তারা জানে পড়া লেখা না করলেও পরীক্ষায় পাশ করা যায়।

তাই শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য এবং সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব শিক্ষক অভিভাবক এবং সমাজের সকলের। কেননা শিক্ষার্থীরা এই বয়; সন্ধিকালে ভিন্ন পথে যেতে পারে তাছাড়া আমাদের চার পাশে বিষাক্ত নাগিনীরা ফনাতুলে আছে অশ্লিল ছবি, নেশাজাতীয় দ্রব্যের ছড়া ছড়ি ভিডিও গেমস ইত্যাদি কোমল মতি শিক্ষার্থীদের জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

আসুন, আমরা ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সুসম্পর্ক গড়ে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলি আর এই হোক আমাদের নিত্যদিনের অঙ্গিকার।

বাংলা ভাষার লিপির ইতিহাস

আনজুম আরা বেগম

সহকারী শিক্ষিকা

মানুষের হৃদয়ের একান্ত অনুভূতিগুলো যখন জমাট বেঁধে থাকে ঠিক তখনই তার আচার আচরণের মধ্য দিয়ে আনন্দ-বেদনার বহি:প্রকাশের ভঙ্গি বা মাধ্যম হলো ভাষা। এই ভাষা অঞ্চল বা এলাকা কিংবা বৃহত্তর পরিবেশে ধর্ম-নির্বিশেষে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে আপন গতিতে প্রত্যেকের মাঝে ছড়িয়ে দেয় এক অনাবিল নির্মল ভাল লাগা।

কবে, কখন মানুষ নিজের মাঝে মনের ভাব প্রকাশের জন্য ধ্বনির আওয়াজকেই তার মানস জগতে উচ্চতম আসনে বসিয়ে কালের বিবর্তনে জন সমাজের বাহক বা মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তার সঠিক হিসেব যেমন কেউ জানে না ঠিক তেমনি বাংলা ভাষা বা বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তির সঠিক হিসেব এও সম্ভব হয়নি। হাজার বছরের ও বেশী সময় অতিক্রান্ত বা অতিবাহিত হয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতির ফলে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও বাঙালি জনগোষ্ঠি ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙালী সংস্কৃতির ঐতিহ্য স্রোত ধারার ভাঙ্গা-গড়ার রূপটি গভীর মমতায় তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন। পালি, ব্রজবুলী, সংস্কৃত, তৎসম, অর্ধতৎসম, প্রাঞ্জল ভাষার বিবর্তনে প্রকৃত ভাষা থেকে ভাষাগত রূপ বদলালেও মূল স্রোত ধারার কোন পরিবর্তন ঘটেনি মোটেও, বরং তা ক্রমাগতভাবে নদীর স্রোত ধারার মত আপন গতিতে নিজের প্রেক্ষাপট খুঁজে নিয়েছে পট-পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারাকে। নদীর স্রোতের মতোই ভাষার ভাষাও গতিশীল নানা বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান আধুনিক যুগের সাহিত্যে প্রগতিবাদী রূপ ও বৈশিষ্ট্যেই বাংলা ভাষা আজ শক্তিশালী লেখা সাহিত্যিক ভাষায় উন্নতি হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবেত প্রচেষ্টায় নদীয়া জেলার শান্তিনগর, কৃষ্ণনগর, কলকাতা ইত্যাদি ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের ভদ্র ও শিষ্টজনের মুখের ভাষা রীতিকে সাহিত্যে বিস্তার করার ফলে এদেশের পূর্বী লিপি (অর্থাৎ বাংলা) রাজকীয় প্রভাবে কিছু কোণ ঠাসা হয়ে পড়েছিল এবং রাজভাষা ও রাজলিপি বাংলাদেশে পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছিল। অবশ্য দেশেই পরের লিপি দীর্ঘকাল দস্যুবৃত্তি করতে পারে না-পশ্চিমা নাগরী লিপি ও পারেনি। খ্রী: দশম-একাদশ শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিমা লিপির স্থলে বাংলার অক্ষর আবার নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। তারপর থেকে বাংলাদেশ এবং তার প্রান্তীয় অঞ্চলে লিপি লেখন ও পুঁথিপত্রে বঙ্গলিপিরই একচ্ছত্র অধিকার স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সংস্কৃত গ্রন্থে ও বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হত। বাংলাদেশের সংস্কৃত গ্রন্থে বাংলা লিপি ব্যবহৃত হওয়া উচিত, ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে তাই-ই ছিল সাধারণ রীতি। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা সংস্কৃত গ্রন্থ এদেশের জলবায়ুতে জন্মেছে এবং এদেশেই বিকাশ লাভ করেছে। ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তনগত আকার দেখলে বোঝা যায়, ভারতের তাব্য লিপির মূল রহস্য ব্রাহ্মী লিপিতেই নিহিত আছে।

ভারতের সমস্ত লিপি অক্ষরের আদি জননী ব্রাহ্মী-লিপি। অশোকের অনুশাসনগুলি সুগঠিত ব্রাহ্মী অক্ষরেরই উৎকীর্ণ হয়ে পর্বত গাত্রে কালজয়ী হয়ে এখনও বেঁচে আছে। ব্রাহ্মী অক্ষরের এই হল আদিম নিদর্শন। বিদেশী পণ্ডিতদের কেউ কেউ ব্রাহ্মী লিপির চমৎকার গঠন কৌশল দেখে মনে করেন, এগুলি বোধ হয় গ্রীক বা ফিনিশীয় লিপি থেকে এসেছে। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রাচীন ভারতীয়েরা ব্যাকরণ ও শব্দ শাস্ত্রে যে রকম তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁরা যে সেই ধ্বনি রূপকে রেখার আসরে বন্দী করতে চাইবেন। এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? বাংলা লিপির উৎপত্তি, বিবর্তন ও পরিণতির ইতিহাস ও কম বিস্ময়কর নয়। বাংলা ভাষা যেমন হাজার বছরের বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে, তেমনি বাংলা অক্ষরও বহুদিন ধরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বর্তমান সুগঠিত রূপ লাভ করেছে। পুঁথি পত্রের লিপি স্থায়ীরূপ লাভ করল ছাপার অক্ষরে-অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে।

পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষার মহিমা অব্যাহত থাকলেও কুটচক্রী রাষ্ট্র শাসকদের সঙ্কেতে তাতে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে উর্দু-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য সম্প্রতি সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থেকে নিছক ধর্মীয় সংকীর্ণতা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ওদেশে বাংলা অক্ষরের কোন বদল হয়নি, যদি ও ঢাকায় বাংলা বানান নিয়ে নানা রকম সরলী করণের গবেষণা চলছে। প্রায় দু'শতাব্দী আগে ছাপার অক্ষরে ব্যবহৃত হওয়ার পর বাংলা লিপির বিশেষ কোন বৈ-প্লবিক পরিবর্তন হয় নি।

সূত্র ঃ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত-শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশ স্কাউটস ও ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল

মোঃ জামাল উদ্দিন বেপারী

সহকারী শিক্ষক

সুন্দর পৃথিবী গড়ার মানসে মূলত মানব সেবার মহান আদর্শকে সামনে রেখেই রর্বাট স্টিফেনশন স্মিথ স্যার লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল ১৯০৭ সালে ইংল্যান্ডের ডরসেট উপকূলের কাছে ব্রাউন দ্বীপে ২৪জন সদস্য নিয়ে সুসংগঠিত স্কাউটের সূচনা করলেও কালের চক্রে ভারতবর্ষে আসে ১৯১৬ সালে এবং বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ৯ই এপ্রিল স্কাউটিং শুরু হয়।

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন একজন স্কাউটকে নির্ভীক, সৎ, পরোপকারী, ধর্মের প্রতি অনুরক্ত, দেশপ্রেমিক যুগোপযোগী সবশেষে নেতৃত্বদানকারী হিসেবে গড়ে তুলে। ছাত্ররাই জাতির ও দেশের কর্ণধার। তারাই প্রনয়ন করবে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা এবং তা বাস্তাবয়নের ভারও তাদেরই। তাই আজকের ছাত্র সমাজ যদি সততায়, কর্তব্য পরায়নতায়, নির্ভীকতায়, নেতৃত্বদানে ও দেশ প্রেমিকতায় উদ্ভব্ব না হয় তবে দেশ সঠিক ও আদর্শ নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। কাজেই স্কাউট দেশ ও জাতির জন্য। ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে ও দক্ষপরিচালনায় স্কাউটদল আজ বাংলাদেশ স্কাউটদের মধ্যে অন্যতম। স্কাউটারদের প্রতিকূল পরিবেশে খাপখাওয়ানের প্রয়োজনে আয়োজিত জাম্বুরিতে অংশ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। স্কাউট আন্দোলন একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন। সমগ্র বিশ্বের স্কাউট আন্দোলনের সাথে তাল রেখে বাংলাদেশে ও প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর জাম্বরি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে সাধারণত গাজীপুরের "মৌচাকে" জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জাম্বুরির অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বিদ্যালয় সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে সেবামূলক মনোবৃত্তি গড়ে তোলার জন স্কাউট কার্যক্রম চালু রয়েছে। ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলের স্কাউটদল ৬ষ্ঠ ঢাকা মেট্রো পলিট্রন স্কাউটস ও ৩৩৯তম ঢাকা মেট্রো পলিট্রন কাব স্কাউটস, বাংলাদেশের স্কাউটস অঙ্গনে তার নিজস্ব গতিধারা ও সফলতা বজায় রেখেছে। আমাদের বিদ্যালয়ের ধারাবাহিক সফলতা সত্যিই প্রশংসনীয়। বর্তমানে দুটি ধারায় বয়েজ স্কাউট ও কাব স্কাউট সমান তালে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে বয়েজ স্কাউট শাখায় প্রশিক্ষণরত স্কাউটসংখ্যা ৩৬ জন। যারা অত্যন্ত দক্ষ স্কাউট লিভার জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন বেপারী ও মোঃ শহিদুল্লার নেতৃত্বে অত্যন্ত সুসংবদ্ধ। আমাদের দলে বর্তমান গ্রুপ সভাপতি ও বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক মিসেস নাজমুন নাহার শাহীন বিদ্যালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই স্কাউটে যুক্ত করেন নতুন মাত্রা। তিনি নিজে ১৯৯৯ সালে মৌচাকে অনুষ্ঠিত গ্রুপ সভাপতি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর অত্যন্ত দক্ষ পরিচালনায় নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে গ্রুপ প্রশিক্ষণ। তাঁর সদ্ ইচ্ছা, সুদৃষ্টি ও আন্তরিকতার জন্যই আমাদের স্কাউটদল ঢাকা মেট্রো পলিট্রন স্কাউটস ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিটি প্রোগ্রামেই অংশ গ্রহণ করছে।

দলের কিছু উল্লেখযোগ্য বিবরণী দেয়া হলো ঃ —

১) বার্ষিক প্রশিক্ষণ তাঁবুবাস, ৮৮ (ঢাকা মেট্রোঃ মৌচাক ও বার্ষিক প্রশিক্ষণ তাঁবুবাস "৮৯ (ঢাকা মেট্রোঃ মৌচাক এ অত্র বিদ্যাল্যয়ের স্কাউটদল অংশ গ্রহণ করেও সফলতা লাভ করে।

২) চতুর্থ বাংলাদেশ স্কাউটস জাম্বুরি '৮৯' প্রশিক্ষণ তাঁবুবাস '৯৩' ও পঞ্চম বাংলাদেশ জাতীয় /১৪শ এশিয়া দল স্পেসিফিক স্কাউট জাম্বুরি '৯৪-এ ও এবিদ্যালয়ের স্কাউটদল সফলতার ধারা বজায় রেখেছে। চতুর্থ স্কাউট জাম্বুরিতে আমাদের স্কাউটদলের প্রত্যেকেই ২৮টি করে স্টিকার পেয়ে প্রত্যেকে মডেল অর্জন করেছে।

৩) ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরিতে এবিদ্যালয়ের স্কাউটদল ও কাব স্কাউটদল এ যোগে অংশ গ্রহণ করে স্কাউটগন -স্ব-স্ব-দক্ষতায় প্রত্যেকে মডেল স্টিকার অর্জন করে।

৪) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ও আমাদের স্কাউটদল তাদের অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৮ সালে ০৭-১০ই সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ার কোদা-বেন্ডজ এ এশিয়া স্পেসিফিক স্কাউট জাম্বুরিতে অংশ গ্রহণ করে আমাদের আমিরুল আজিজ যার ফলে আমাদের বিদ্যালয়ের সুনাম ও গৌরব বর্হিবিশ্বে ও ছড়িয়ে পড়ে।

৫) ১২-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০ মৌচাকে অনুষ্ঠিত ৫ম কাব ক্যাম্পুরীতে আমাদের স্কুলের কাবেরা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই ১২টি অভিযানের ১২টিতে স্টিকার লাভ করে মডেল অর্জনের মাধ্যমে সুনামের সাথে জাম্বুরির সম্পন্ন করে।

৬) ১৯৮৮, ৯৭, ও ৯৮ সালের সর্বনাশা বন্যায় কাব ও স্কাউটদল বন্যাদুর্গত ও দুস্থদের সাহায্যার্থে ত্রান বিতরন, বস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরন, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবায় অংশ গ্রহণ করে, সর্বোপরি তাদের থাকার ব্যবস্থা করন ইত্যাদি কার্যে রুটিন অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেছে।

৭) ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত ১২তম আঞ্চলিক সমাবেশ মৌচাক গাজীপুর জনাব বশির আহম্মেদ ভূঞার নেতৃত্বে অত্র বিদ্যালয় স্কাউটদল সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সুনামের সাথে সমাবেশ সম্পন্ন করে

৮) ২০০২ সালে জনাব গোলাম মোস্তাফার নেতৃত্বে নবম বার্ষিক প্রশিক্ষণ তাঁরবাস মৌচাক গাজীপুরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সফলতার সাথে সমাবেশ সম্পন্ন করে।

৯) ২০০৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এডিস মশা নিধন কার্যক্রমে আমাদের স্কাউটগণ অংশ গ্রহণ করে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সর্বোপরি স্কাউটস দেশ ও জাতীর কর্নধার হিসেবে বলিষ্ট নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলা রোধে এগিয়ে আসবে সেবাব্রত মন নিয়ে সেই প্রত্যাশায় শেষ করার পূর্বক্ষনে মহান আল্লাহ রাব্বুলের দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাচ্ছি —"ঐতিহ্য বাহী ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলের" সার্বিক ঐতিহ্য রক্ষার।

শিক্ষার শেকড়ের স্বাদ তিক্ত হলেও এর ফল মধুর।-এরিস্টটল

বিদ্যালয়ের ইতিবৃত্ত

মোঃ আবুল বাসার ভূঁইয়া

সহকারী শিক্ষক

ঢাকা আজ একটি মর্যাদাসম্পন্ন মহানগরী। আজ এ মহানগরীতে অসংখ্য হাই স্কুল আগামী দিনের জন্য উপযুক্ত নাগরিক তৈরীর কাজে ব্যাপৃত। ইহাদের মধ্যে ২৪টি সরকারী স্কুল। ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল মহানগরীর স্কুলগুলির মধ্যে অনন্য।

আজ থেকে প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্বে যখন হৃতরাজ্য ভারতীয় মুসলমানগণ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় উৎকণ্ঠিত ছিলেন তখন তদানীন্তন মুসলিম মনীষী ওবায়দুল্লাহ্-আল্-ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। এই মনীষী ছিলেন জাতীয় নেতা মরহুম হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাতামহ।

তদানীন্তন মুসলিম মনীষীগণ লক্ষ্য করলেন যে বঙ্গীয় মুসলমানদের শিক্ষার জন্য নির্ধারিত মুষ্টিমেয় যে, কয়টি মাদ্রাসা চালু ছিল উহাদের শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী নয়। তাই তাহারা জোর দাবী উত্থাপন করিলে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনীকিকরনের দাবী মানিয়া নেয়। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকা মাদ্রাসার সঙ্গে এ্যাংলো পার্শিয়ান ডিপার্টমেন্ট সংযোজন করা হয়। মূলত ঃ এই এ্যাংলো পার্শিয়ান ডিপার্টমেন্ট ছিল একটি হাই স্কুল।

একই অঙ্গনে নূতন ও পুরাতন দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহাবস্থান তাৎক্ষণিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। ঢাকা মাদ্রাসার তদানীন্তন অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব আবু নাসের ওয়াহিদ এই সমস্যা নিরসনের জন্য কতিপয় পদক্ষেপ সুপারিশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুপারিশগুলির মধ্যে ছিল–

(১) সংযোজিত হাই স্কুলগুলিকে পৃথক সত্ত্বা প্রদান করিয়া পৃথক প্রধান শিক্ষকগণের হাতে উহাদের দায়িত্ব ভার অর্পন করা,

(২) স্কুলগুলি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ স্কুল রূপে নির্ধারিত থাকিবে,

(৩) স্কুলগুলি বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকিবে এবং

(৪) এই সব স্কুলের চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করিবে সংশ্লিষ্ট বোর্ড।

তদানীন্তন সরকার এই সকল পদক্ষেপ গ্রহণে রাজি হইলেও আর্থিক বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বসিলেন। এই পর্যায়ে 'মহসীন ট্রাষ্ট কমিটি' শতকরা ৫০ ভাগ আর্থিক দায় গ্রহণে সম্মত হইলে উক্ত প্রশ্নের সমাধান হয়। এই সময় ঢাকা মাদ্‌রাসা পরিবর্তিত নামকরণ করা হয় ঢাকা গভর্ণমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল এবং প্রথম প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয় স্কুলের প্রবীণতম শিক্ষক জনাব কাজী জহিরুল হক সাহেবকে।

ঢাকা মাদ্রাসা এবং পরবর্তীকালে ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল তদানীন্তন বৃটিশ ডাক বাংলা এবং বর্তমান কলেজিয়েট স্কুলের অঙ্গনে অবস্থিত ছিল। কাজী জহিরুল হক সাহেব স্কুলটিকে হিন্দু অধ্যুসিত এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কেন্দ্র বিন্দু হইতে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত স্থানাভাবে করিতে পারেন নাই।

নওবেলাল

সাবেক ভিক্টোরিয়া পার্ক, বর্তমানে বাহাদুর শাহ পার্কের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত প্রায় ৩১৩ বৎসর পূর্বে ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পর্তুগীজ দূর্গ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সময় এ. আর. পি. ব্রিগেড দখল করিয়া নেয়। যুদ্ধ শেষে ব্রিগেড ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর অঙ্গন ও ভবন দখল মুক্ত হয়। এই সুযোগে সেই পর্তুগীজ দূর্গটিতে ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুলকে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল উত্তরাধিকার সূত্রে যাহা পাইয়াছে তাহাতে রহিয়াছে প্রচুর পরিমাণের শিক্ষা উপকরণ, বিপুল পরিমাণের আসবাবপত্র এবং দুর্লভ ও দুর্মূল্য গ্রন্থাবলী! ছাত্রাবাস হিসাবে পাইয়াছিল ডাফরিন মুসলিম হোস্টেল। পরবর্তীকালে সুষ্ঠু সংরক্ষণের অভাবে সবই অবক্ষয়ের পথে। ইতিমধ্যে ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া ছাত্রাবাসের একটি ভবন অপসারণ করা হইয়াছে। এক্ষণে ছাত্রাবাসে ১০/১২ জনের বেশী ছাত্র থাকিবার ব্যবস্থা নাই। ছাত্রাবাস অঙ্গনে যে পরিমাণ ভুমি আছে, মহানগরীর অনেক বিদ্যালয়ের ও সে পরিমাণ ভূমি নাই। এই ভূমিতে সুপরিকল্পিতভাবে ভবনাদি নির্মাণ করা হইলে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের আবাসিক সমস্যা সম্পূর্ণরূপে সমাধান হইতে পারে।

বিদ্যালয় অঙ্গণের পশ্চিম বেষ্টনী দেওয়াল বরাবর উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত একটি বহুতল ভবন নির্মান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে খেলার মাঠের স্থানাভাব হইবে না বরং একই সময়ে বহু ছাত্র অধ্যয়নের সুযোগ পাইবে। ফলে ঘনবসতিপূর্ণ এই অঞ্চলের শিশু-কিশোরদের লেখাপড়ার সুযোগের সম্প্রসারণ হইবে। আদিতে এই স্কুল ছিল একটি দ্বি-ভাষী স্কুল। সেই সময়ে স্কুলে আটটি শ্রেণীতে মাত্র আটটিই শাখা ছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষকের পদ ছিল মাত্র ষোলটি। বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ২৫ জন এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে শাখার সংখ্যা মোট ১২টি অধিকন্তু নবম ও দশম শ্রেণীতে ২টি করিয়া বিভাগও রহিয়াছে। মোট কথা বর্তমান চাহিদার তুলনায় শিক্ষক ও শাখার সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। বিকল্প ও সম্প্রসারিত ভবনাদি নির্মাণ সাপেক্ষে শিক্ষক নিয়োগ ও প্রভাতী শাখা চালু করিয়া আশু সমস্যার কতকটা নিরসন করা যাইতে পারে।

সূচনা লগ্ন হইতে এই স্কুলের সুনাম ছিল দেশ জোড়া। এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রগণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মানবতার খেদমত করিয়া যাইতেছেন। এ্যানট্রান্স, ম্যাট্রিকুলেশন ও এস, এস, সি পরীক্ষার মেধা তালিকায় প্রায়শই এই স্কুলের ছাত্রদের নাম থাকে। এমন কি সর্বশেষ গৃহীত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর ১৯৯১ এর ফলাফলে এই স্কুলের একজন ছাত্র সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৮তম স্থান অধিকার করিয়াছে।

ঐতিহ্য আছে, সম্পদ আছে, শুধু সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিশ্চিত করিয়া স্কুলটিকে জাতিগঠনে একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত করা সম্ভব।

উৎস ঃ নওবেলাল, পুনর্মিলন-১৯৮২ থেকে (সংকলিত ও পরিমার্জিত)

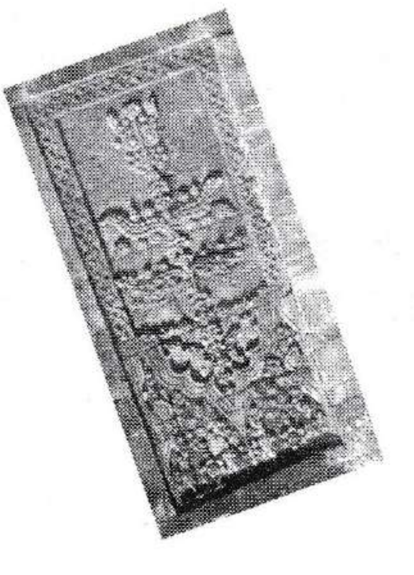

Educational Problem in Bangladesh

Md. Rubaiat Hossain

Class : 10, Section : B, Roll No : 1, Group : Science

Education is the backbone of a nation. No nation can progress without education. Ignorance is similar to darkness. So, everyone should enlight their heart with the light of education. But in Bangladesh students face a lot of problems to acquire education. It is necessary to take proper steps to remove the problems. Some of the educational problems are discussed here.

Bangladesh is a poor country having a huge population and limited land. Most of the people live below the poverty line. It is difficult for them to earn their bread and butter. They can not afford to educate their children. Though the government is giving some facilities for the poor children, the poor people are failed to utilize those opportunities. Now a days in the villages many poor children go to primary school and complete the primary education. But when they are grown up they do not go to school because they need to work to earn their livelihood. On the other hand many children specially girls are dropped out of school and simply do not go to school because of their poverty. Poor parents depend on their children for earning money. The students also spend much of their time to work for their family. They can not study properly. As a result, our education may become substandard day by day.

Ours is an over populated country. Population is increasing very fast. But the educational facilities failed to keep steps with the population. The number of educational institutions, teachers and educational instruments are not sufficient. So all the schools and colleges are over crowded. On the other hand, authority of the educational institutions can not maintain proper standard of education. There are few high standard educational institutions situated in the metropolitan area having very limited number of seats. So the students have to face a huge competition to get themselves admitted into those educational institutions. It can be called admission war. In the rural areas all the schools and colleges can not maintain a minimum standard because of poverty and other facility. Good teachers don't want to stay at the schools and colleges situated in the rural areas. Government and non-government schools and colleges also can not maintain same standard. The schools and colleges at the metropoliton area collect more tution fees than the schools and colleges of the rural area.

The educational system is not modern and full of problems and limitations. The students only depend on the text books authorized from the board of education. The text books are not sufficient for the students. In our country we just want certificate to get a job of hand some salary. We don't give any importance to the knowledge of the students. So the students try to get a certificate at any cost, As a result, They adopt unfair means in the examination hall. The government is trying to prevent unfair means in the examination but the students are not enough conscious to stop unfair means.

A teacher plays an important role to educate the people properly. A good teacher makes student confident and proves them clever. But unfortunately the number of good and effective teacher is not sufficient. Most of the teachers advice students to memorize the answer of the questions from the text books and the notes given by them. Without understanding if students memorize any answer, he or she will forget it very soon. Only memorizing spoils the talent and capacity of the students. The relationship between students and teachers is also a problem in our country. Students generally fear the teachers. The can not share knowledge with the teachers.

The recreation opportunity of the students is decreasing day by day. Parents give to much pressure on the students. They want their children to study all the time. That make the students dull. Students are not allowed to read any other books beside their text books, which is necessary for them. Playing, traveling, watching T.V. are also a part of education. In the school students don't get enough facility to show their extra talent or creativeness hidden in them.

University level is full of anxiety. The number of seats is very restricted. The expense of study is also high. Session jam is also a problem for the students. Students politics is just like a curse for university. The poor and general students can not even dream of studying at university.

Students can not depend on the teaching in the class because of sufficient facilities and time at the educational institutions. They have to take private tuitions and special coaching to do well in the examination. The poor parents can not afford to bare any extra educational expenses. As a result, poor students can not do well in the examinations.

Though we have a lot of problem, we have to find solution to develop our country. The solution of this problem is an ongoing process. Here I am giving some solutions.

1. *The growth rate of population should be decreased.*
2. *We should remove poverty from our country and give financial support to the poor children of rural areas.*
3. *"Food for educations" programmes should be continued.*
4. *The number of educational institutions should be increased.*
5. *The total educational system should be reorganised and developed.*
6. *The number of teachers and educational instruments should be inouased.*
7. *All the teachers should be trained.*
8. *Students should be provided with much entertainment facilities.*
9. *Students should be given freeness to study more books.*
10. *Unfair means in the examination should be stopped.*
11. *Universities and colleges should be kept free from student polities.*
12. *Government must increase financial facility to develop the system of education.*
13. *The poor people should be motivated to let their children study.*
14. *The difference of standard among the schools and colleges should be decreased.*

The overall development of the country depends on educational developments of the country. Without education the nation will not able to keep step with the development of the world. It is high time to take necessary steps for the overall development of the total educational system of the country. Otherwise the next generation will be thrown in the darkness.

Dhaka Govt. Muslim High School

At a Glance

Nazmun Nahar Shaheen

Headmaster

School is the holy place where the young learners come to acquire knowledge. For a successful life of a student, school plays a prime role. A good school depends on qualified, active and efficient teachers. Dhaka Government Muslim High School is one of the oldest and famous schools. I am proud to be the Head of this well-known institute. It was established in 1874 A.D. At that time it was the Anglo Persian Department of the Dhaka Madrasha. In 1916 it was separated from the Madrasha and converted as Dhaka Government Muslim High School. It was specially established for the interest of the Muslims. Because at that time the Muslim were backward in education. At the same time the two other Muslim Schools were founded one in Chittagong and the other in Rajshahi.

From the beginning the result of these schools were very excellent. Many distinguishable personality of Indian sub continent were the students of this school. Among them scientist, author and Ex-Secretary Dr. Abdullah-Al-Muti Sharfuddin, National professor Abdur Razzaque Ex-Minister and Ex.-Secretary, Molla Abdul Mazid, Ex-Secretary Habibur Rahman, Lt. General Khaja Wasiuddin, Educationist A.N.M Bazlur Rahman. Dr. Ekhlas Uddin Ahmed. Mohammed Hossain and Dr. Borhan Uddin Khan Jahangir are few of the mentionable names.

The school has six classes from class five to ten and every class has two sections. At present there are about six hundred students. The school hour is from 10 a.m. to 4. p.m. Students assembly is organized every morning before the class starts. There are twenty-five skilled teachers who are helpful to the students and devoted to teach them. The environment of the school is calm and quiet. The school has a hostel for the distant students named "Dafrin Muslim Hostel" which was established in 1906. School library is

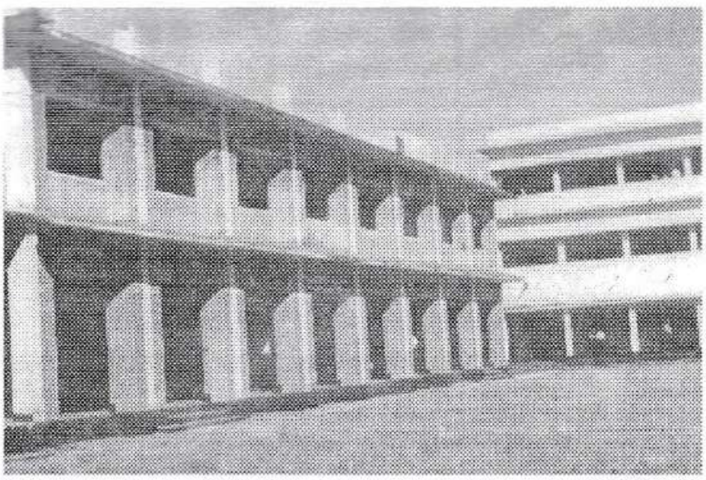

very important for the students to exercise their creativity. This school has a very old and rich school library. It contains a vast collection of old, rare and precious books.

The school is well furnished and spacious. The school has also a well equipped science laboratory and modern computer laboratory. All the information of the students and their result are stored and maintained by the computer. Three examinations are conducted in a year for the proper evaluation of the development of the students. Other than these terminal examinations, teachers conduct class tests and spot tests. Students and teachers maintain school diary where they keep note of homework and day wise development of study. The diary is called "Dainik pather Biboroni." The result of all the examinations are published in front of the parents. The result publishing day is called "Parents' Day". On that day parents can openly discuss with the teachers about the development of their children. Parents can always communicate with the relevant subject teachers to solve the problems of their children. For the better preparation teachers arrange extra classes for intensive guidance before Scholarship and Board examination. Every year a good number of students take part in the Primary and Junior Scholarship Examination. The result of the S.S.C examination is satisfactory. Here is the chart of result of last three S. S. C examinations.

Year of examination	Group	No. of students appear	No. of students passed	No. of students failed	% of passing
2001	Science Business Studies	27 35	25 35	02 -	96.29
2002	Science Business Studies	25 36	25 32	- 04	93.44
2003	Science Business Studies	35 45	35 40	- 05	93.75

A good student not only good in study but also good in cultural and sports activities. This school always encourage all-round performance of the students. For this reason, this school arranges different cultural competition, debate, sports competition, annual study tour etc. The students of this school brought a lot of glory by taking place in different inter school competition. To hold up the Muslim tradition all the teachers and students of the school say their Johor Prayer together at the school prayar room. As a Muslim Govt. School, we always give special importance to the religious practice of the students. At last we can assure all the students and their parents that we are giving our maximum effort for the bright future of the students.

Education and learning materials

M. A. Awal

Asstt. Teacher

Education means the change of behavior of human nature Materials are the helper to acquire something. We suffer from contradictions of many types is clear from the state policy of increasing opportunities for education in the country on the one hand, while raising prices of learning materials on the other hand, particularly writing paper which is essential items for learning.

The importance of paper, ink and pencils in aiding learning cannot be over emphasized. While we speak of all out effort for in creasing enrollment and universalization of primary education in the rural areas, we firmly forget to create conditions which might help achieve the state objectives. Any one can say that the present price of papers, Pencils and ink and other learning materials is working as a strong position against the increasing of enrollment in the rural primary schools. It has been set as a target date for reaching universal primary education in Bangladesh.

Education is one of the basic needs of a human being and is essential for any kind of development. There are many classification of education. We can be educated by learning academic books. So in this case learning material is very effective. When are get the academic education, teachers try to use the learning materials for effective process. So learning materials is a part and parcel for education.

Because it is a matter of sad that our planners fail to comprehend how the poverty stricken people in the village with the lowest per capita income in the world can maintain to pay for the education of this children. Such as, 24 small sheets of white paper sell at TK. 12, The same number of low quality newsprint sheets sell for Tk-6, a wood pencil costs TK. 3 a piece, a local made pot of ink sells at Tk-5 to 6.

It is not difficult to realize why it is impossible for a day labourer earning less than Tk 50 a day to send his children to school. But there is no denying that at least education up to the primary level for all citizens is very vital for our survival as a nation.

It is surprising that we talk of universal enrollment for the augmentation of primary education and at the same time we can not ensure the availability of the learning materials at a reasonable price which the poor parents can afford. Now the question of textbook prices may be raised. One may recall that

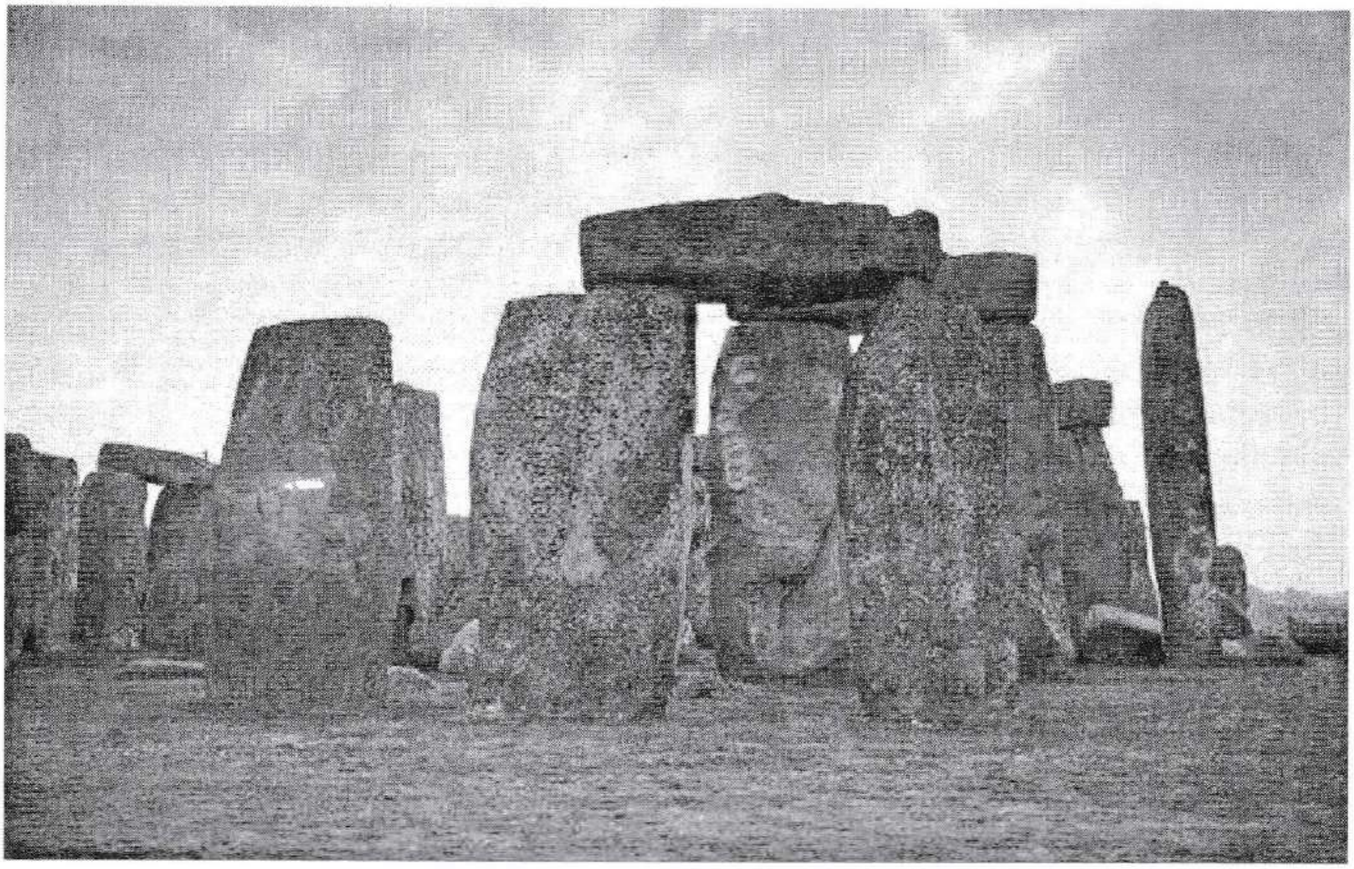

immediately after liberation, the price of primary and secondary schools textbook were substantially reduced for the justified reason to give relief to the poor parents. But the prices of textbooks have been increased from five to ten time from that of the post liberation period.

If we really think that education must be assigned, priority we must show this by our section. I advise that for the spread and progress of primary education, the following steps should be taken for malling available essential learning materials to the children of poor parents in the rural schools.

1. *Textbook should be supplied to the poor pupils free of cost.*
2. *Legal price shops should be opened on the school campus for supply of writing papers, pencils, pens and ink.*
3. *Those who are very poor, they should be supplied these materials free of cost.*

If these steps are implemented it is going to cost the Government heavily no doubt but the ultimate benefit will be gained by making a literate nation.

English Language Learning Situation and Communicative English in Bangladesh

Md. Abul Bashar Bhuiyan

Asst. Teacher

English is an international Language. It is the Second Language to us and a living Language all over the world. In the Shakespeare's Time English was spoken by only a few million people. English is now the most widespread language of the world, second only to Mandarin Chinese in the number of people who speak it. Besides, once England, The land of English, colonized almost all the countries of the world including America. That is why, this Language was deeply rested since then almost everywhere even in our country. English is now taught as a foreign language in schools and colleges with the status of a compulsory subject.

The liberation movement of Bangladesh was struggle against not only the oppressors but also their language(s). As a result, Bangladesh dawned with an over whelming love for the mother tongue and the motherland. Bangla as a language and Bengali culture were both a guiding force in people's social and political behaviour for quite sometime.

English suffered a serious set back in the early years of Bangladesh. It no longer enjoyed the position of a second language in the country and we did not need it either in that role. Broadly speaking Bangladesh is a monolingual country where almost every body speaks Bangla. Bangladesh does not require English as a linguafranca for communication within the country.

English is required in Bangladesh for communication with the world outside and with foreigners and foreign Organizations within the country. It has thus lost its position from a second language to a foreign language depending on the purpose for which it is used. English is therefore, a foreign language in Bangladesh, but is enjoys a special position in our curriculum, higher- studies and in society.

After the serious set back suffered by English in the early years of Bangladesh, the intellectuals and politicians realized the blunder of neglecting it. Therefore it is mandatory for all students to study it from class 1 to class 10 in the primary and secondary schools. At the higher levels from class 11 to class 12 and in the graduate level English is a compulsory subject.

The questions, why do we need to teach English again at the graduate level when it has been taught in schools and colleges for such a long time? That is because the type of English students need to learn, and the methodology teachers need to follow are both missing in the English classroom.

In an ideal situation, an English classroom is supposed to be a fairly noisy room. Students are supposed to interact with each other, in pairs and in groups, helping and learning from each other. A non-threatening and friendly environment should prevail in the classroom, and students should be involved in practising the target language. Teacher talk is highly reduced while student talk occupies a large portion of the total class time.

But in an English classroom in Bangladesh the scenario is quite different.

The teacher does most of the talking in Bangla, while students listen to the teacher, sometimes attentively and sometimes not. What they listen to is not in English but Bangla. Where as for learning a language one must practice using all four skills listening, speaking, Reading and writing. The students are thus deprived of the opportunity of listening to the target language. Not only that, as the classroom environment in not warm and friendly, the students feel threatened to ask questions, let alone practicing speaking in class.

As for reading the teacher does most of the work. She reads the text herself, or sometimes asks a few students to read it aloud. She then translates it for them. For writing too students are given notes, answers and essays all written out for them by the teacher or their private tutors or coaching centers.

Under such circumstances, where is the challenge. Students need to stretch their minds and to pull their knowledge a little forward. How much learning can take place with out any challenge? It is time, we thought of these issues.

Grammar is taught in our schools and colleges in an isolated manner. Students are asked to memorize rules and then to work out a few exercises. As a result we find students who are good in the rules of grammar, but very poor in the application of these rules. That means students are given the tool for communication but not shown how to apply those. Therefore, they learn about English, but not English. They learn language forms, but how much do they know about language functions?

Communicative Language Teaching:

a) Towards an understanding of communicative language teaching :

Communicative language teaching helps a learner develop communication skills or communicative ability. This involves paying systematic attention to structural as well as functional aspects of language, combining these two into a more fully communicative view. *(Little wood, 1981)*

Communicative activities provide the learners with the opportunity of whole task practice. The teacher design tasks for the practice of certain part-skills like listening or scanning in reading, or design tasks for the practice of total skills. These activates are structured in order to suit the level of the learners and motivates the learners in cognitive learning.

These activates a allow natural learning in class. Since learner are involved in using the language for communication, and as the use of the mother tongue is discouraged in class, the learners feel a natural tendency to express themselves in English and the development of personal relationship between learners themselves and between a learner and the teacher. This relationship helps the learners to learn the language in a warn and friendly environment.*(Little wood 19981)*.

(b) What then is Communication?

Communication is an exchange between two or more people and it is in complete without a feedback reaction (La-Forge 1983 : 3) Successful communication is an accomplishment jointly achieved and acknowledged by members of the group (Richards and Rogers 1986 : 77)

(c) Learner roles

The emphasis in CLT is on the processes of communication, rather then on processes of language forms. This leads to different roles for the learners to play in class. They are negotiators firstly, negotiating between themselves, the learning process and the object of learning. Then they are teachers for themselves for learners learn from each other and this is where the concept of peer teaching comes in. Next, learners are actors in the classroom for they enact roles assigned to them by the teacher or by peers in the group. Finally, learners are contributors for

they contribute as much as they receive language in the learning process.

d) Teacher Roles :

The teacher in a CLT class has a number of roles to play. Firstly, she is a facilitator of learning. Learners take the responsibility of learning and the teacher is there just to give them support.

Secondly, the teacher is to act a participant in various group activities. Thirdly, the teacher plays is that of an organizer of resources and activities in class. The teacher is also a researcher and learner herself. She is a need analyst, counselor and group process manager. *(Richards and Rogers 1986 : 77)*

(e) The role of instructional materials:

A wide variety of materials are used in the language classroom to support communicative activities. Teacher here are quite free to choose their own materials starting form a brochure/leaflet to sign board ads, pictures, books and journals, Teacher in the CLT class rooms are however free from the big question, "Are teachers slaves to textbooks?" The primary role of the materials is to promote communicative language use.

Required steps :

Communicative language teaching is a demanding job for which teachers of English particularly at the secondary and tertiary levels need to be trained. They have to teach English as a tool for communication a means for expression and not as an end in itself. Only a trained teacher would know how to use single sentence on the bill board or a set of pictures from a calendar as teaching materials.

Teachers should be ready to take challenges and develop a positive attitude towards changes in the teaching of English as a language for communication. Then only will they be able to help learners fulfill specific objectives of their courses.

The school authorities can also play a vital role in increasing English. Proficiency and language skills of the students. This can be done by encouraging them to use English in and outside the classroom.

The authority can also restrict the use of mother tongue (Bangla), in the English class. Mother tongue can be used only when and where it is absolutely necessary.

The authorities also have to take all the necessary steps to train the new and old teachers in English in home and abroad.

English in new taught as a foreign language in schools and colleges with the status of a compulsory subject to teach English as a tool for communication teachers need to adapt this teaching methodologies to suit the needs of the hour. It is time they move from the traditional method to communicative Language Teaching.

For this the teachers of English at the secondary and tertiary levels need to be trained properly. When these trained teachers become a part of the management, English language teaching and learning situations in Bangladesh will certainly improve. The nation is looking forward to days when the a administration, for example, would be able to negotiate deals with donor agencies better, when doctors and nurses, engineers, defense services personnel, teachers and students will be able to use the English they require with competence.

References :

* *ELT Teaching/Learning in Bangladesh (Unite-Three)*
* *Little wood, W. 1981, Communicative Language Teaching, An introduction, Cambridge, CUP.*
* *Richards, J. C. and Theodore S. Rodgers, 1986. Approaches and Methods in Language Teaching Cambridge, CUP.*
* *Meher Aftab, NAME, Communicative English : The Need of the Hour.*

INFLUENCE OF SATELLITE CULTURE ON THE ROLE OF URBAN FAMILIES

Shahnaz Akhter

Asst. Teacher

In this century all the development of human civilization has taken place basing on unbelievable power of science. In a word modern civilization and culture is the blessings of science. Science is a special knowledge acquired on a particular subject depending on experiment logic and experience. The men have controlled the nature with the help of science. The improved communication system has made the world small. In the modern world mass media has a vital importance. Mass media and cordless communication is a complex system by which information, news and views can be exchanged very easily. In this age of modern technology and science there are many effective mass media like Newspaper, Television, Radio, Fax, Phone, Internet etc. These medias can carry the news to the every corner of the world with in a moment. So, people can keep touch with the world very easily. These medias not only broadcast news but also programs of entertainment, education economics, sports, science & technology etc. Now a day these medias have created a great influence on human life. They can even change the life style and thoughts of the people. Among all the mass media television is the most popular and affective media. It has taken a new dimension and become a part and parcel of our daily life. The latest development that has given the television a renaissance is satellite television. The satellite television has broken all the boundaries and limitation of human culture and thoughts. Satellite means the heavenly body that moves round a planet. But artificial satellite is a device that reflects the signal transmitted from various TV stations. It has given a new dimension to the transmission system of television. Now a day almost all the people of the world are familiar with the satellite television. In our country the satellite television was introduced in 1992. Since then the attraction of satellite is increasing day by day. Satellite television has taken a large portion of entertainment of general people. In a word it is the prime source of entertainment. It is also influencing our day-to-day life. On some occasions it is also spreading bad influence. On the other hand the debates on its effect, good or bad side, necessity, justification, legal or illegal etc. are developing. Almost all the countries of the world are being influenced by the satellite culture. They can't keep themselves out of the satellite culture. The countries are not getting any way without becoming the idle, inactive, thoughtless tired consumer of satellite television. In the modern life the flow of news plays a very important role. Beside news and views different entertaining programs help the people in their growth. In this age of

science the satellite television is playing a very effective role in the rapid development of civilization and standard of human life.

The influence of satellite television on a developing country like Bangladesh is a matter of discussion. Bangladesh was introduced to the satellite culture in 1992. Almost all the educated and conscious people are familiar to the satellite culture. The socially conscious people have accepted the satellite entertainment cordially. But there is a great difference between our Bengali culture and the satellite culture that is almost occupied by western culture. Satellite television is seen commonly in urban area and it is also spreading over rural area rapidly. Around 50 channels are broadcasting their programs in our country. The programs include sports, drama, movie, dance, comic programs, education, economics, news etc. The reasons of attraction to these programs are difference at taste, free entertainmented, and priority of live telecast, element of nude entertainment etc. But the influence of satellite culture on the family life of the city is a matter of thinking. The aim of the following study is revel the fact about the influence of satellite culture on our Bengali life.

According to the opinion of the specialists, satellite television is exerting influence on the culture, economy, social and political life of the developing countries. Gradual experience of the satellite television is changing the opinion, thoughts and views of the people of the developing countries and they are being attracted to the western culture. Both good and bad side of the developed and rich countries are spreading over the under developed societies and countries. The condition is such that sovereignty of the national culture is almost lost. Dependence on the technology of the first world is increasing day by day. The third world countries are becoming the cultural slave. It is not possible to deny that satellite television is broadcasting some programs, which are leaving very harmful effect on the society. The programs with sexual appeal, fighting, crimes, restlessness and low standard are encouraging the pollution of culture. The satellite television is making the world in one nation and the entire small and under developed nations are loosing their own characteristics.

The introduction of satellite television to countries like Bangladesh is increasing the distance between the new and old culture. The difference between the choices of the parents and the children are seen. The difference of neediness and taste is a bad signal for our society. Dish culture and changed choice of the families are making our own culture distinct. The Dish culture doesn't have only bad impression, but it has a lot of good sides. It helps the development of our technology, education, standard of life, social and political life, economy, culture etc. Dish culture helps us to leave our old thoughts and technologies and to be introduced to the modern technologies.

The young generation is being strongly attracted, to the dish culture. These are some reasons behind it: restlessness of the youth, attraction of the programs, attractive sports show, programs of flexibility and the relevant to the modern age, difference in taste etc. The matter is such that, in spite of our poverty, our mind is becoming rich. The improvement also has some bad influence. The young generation may become restless, unlawful, principle less.

The unknown foreign culture is giving pressure on them. In many cases they are avoiding our own social systems and customs and showing angry attitude. The viewers of under developed countries are facing many odd situations. Showing guts one of the hosts of a talk show of star television called Gandhi as a bustard miser in 1995. In fact, beside social and moral demerits there is an economical demerit. A lot of money is spent to take the connection of Dish Antenna. As a result economical activities are hampered. The producer of the Dish Antenna and the channels takes a lot of money to broadcast programs. This is

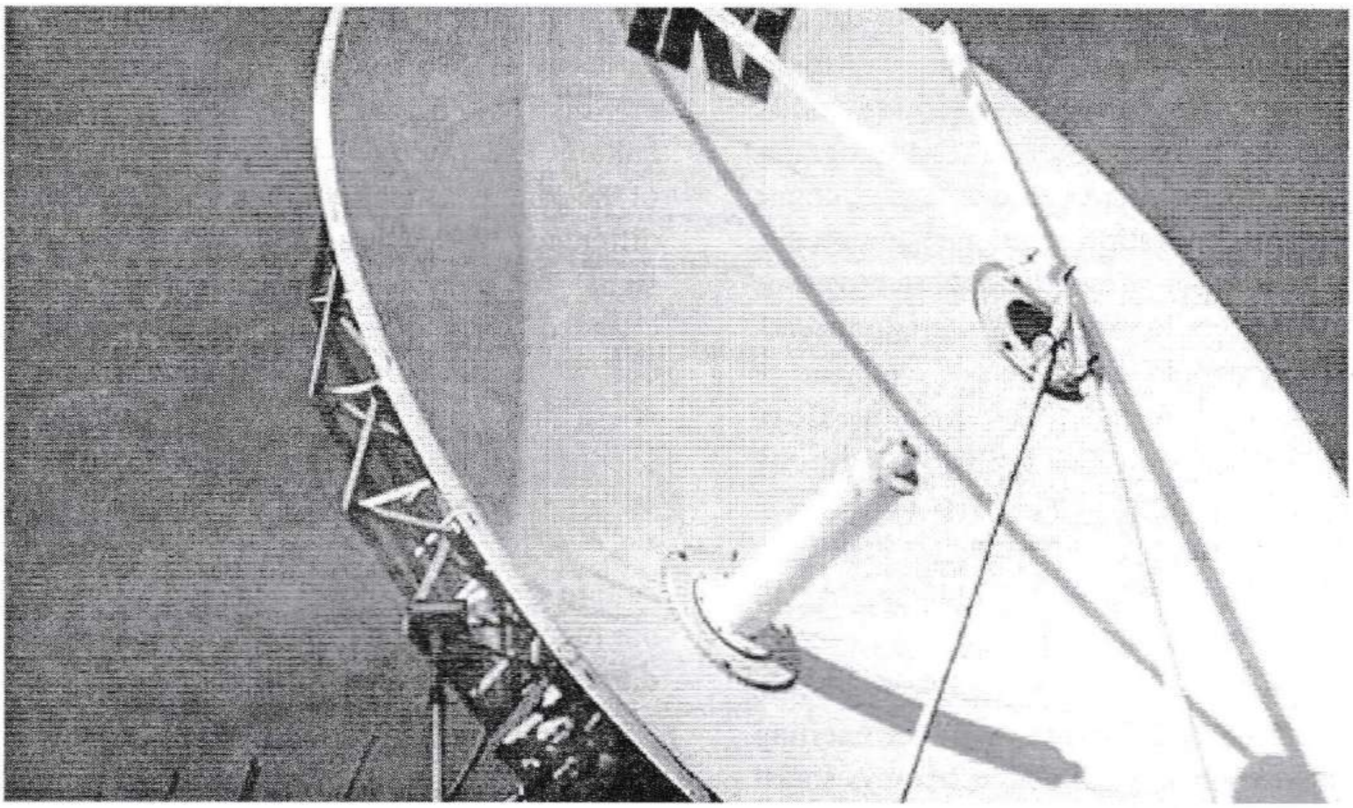

also an unproductive source. But in some cases it plays a role in the world business through advertisement.

If satellite television is used properly, it many change the total life of the people of the poor countries. The influence of satellite might be good and affective. But in our country the families are misusing their time, energy and money behind dish antenna. It is also exerting a harmful influence on the young generation of the country. The students are becoming the prime victim of it.

Cable and Satellite Transmission:

In 1992 over 55 million American TV households wired for CABLE TV and subscribed to one f the 8,700 cable systems that span the country.

In 1975, RCA orbited the first COMMUNICATION SATELLITE designed for the relaying of TV signals, allowing producers and a seller of TV programs to market their products to any cable company with a satellite-receiving dish. Today, 65 satellite transmitted cable networks offer an enormous range of program types, from all-sports systems to religious programs to programs designed for special audiences and various language groups. Most cable networks are supported

primarily by advertisers, but the "pay" networks earn their revenues from those home viewers who are willing to pay additional fees to their cable system for the privilege of watching special sports events, first-run movies, or programs produced by the pay networks themselves. Both types of networks also receive fees for each subscriber from the cable systems.

Because of the initial heavy expense of wiring a community with cable-an expense the cable company itself undertakes most cable systems operate under exclusive franchises made with each municipality. Congress's Cable Communications Policy Act of 1984 allowed cable companies for the first time to raise their fees after two years of a franchise agreement, and substantial rate increases followed throughout the cable realm. Local city governments on longer have any power over the companies to which they have granted franchises and, in effect, a cable company now acts as an unregulated monopoly within its broadcast area. (In 1992, the U. S. Congress- under threat of a presidential veto-began work on legislation that would deregulate cable). In addition, the largest cable system operators own all of, or substantial interests in, most of the smaller systems. Two of the largest cable corporations control almost one-third of all subscribers.

The "must carry" rule that required cable systems to carry all local broadcast channels within a certain radius of their transmitter was struck down in 1985, although the ramifications of that case are still being argued. If cable operators have their way, local stations might vanish from cable offerings or pay heavily for being carried on cable: One possible solution is the use of an "A/B" switch, which allows subscribers to switch between cable and broadcast signals. The switch is available now on some new television sets, but it would have to be installed on older sets. To avoid paying the monthly subscription fee (of, to gain signal reception in remote areas where cable had not penetrated), many people chose to buy backyard dish antennas, smaller versions of the "earth stations" used by cable operators to capture satellite signals. Some television programmers considered the use of home dishes a theft of their product. In 1986 several satellite programmers began to scramble their signals so that only cable earth stations could receive them. However, many U.S. backyard antennas are now equipped with decoders, and some 3 million were in use in the early 1990s.

On the other hand, some programmers see the backyard dishes as a positive omen, a sign of the time when every house will own a small receiving dish and, for a fee, receive programs directly off a satellite. Direct Broadcast Satellite (DBS) systems have the advantage to the programmer of cutting out the need for cable. All the fees involved would go directly to the broadcaster, increasing profits by at least 50%; but the presently available DBS technology 46 to 61 cm (18 to 24 in) home receiving dishes and indoor DBS receiver requires more powerful communications satellites than the United States now operates.

Social Concerns and Effects of Satellite Culture:

Newton Minnow, then chairman of the FCC, in 1961 described "the vast

wasteland" of TV as game shows, violence... sadism, murder, western badmen, western good men, private eyes, gangsters, move violence and cartoons." Most television criticism echoes themes that Minnow sounded.

In 1972 report of the surgeon general and the National Institute of Mental Health, claimed that exposure to television violence encouraged aggression in children. The industry responded in 1975 by instituting "family viewing time" between 7 and 9 PM, when the programs shown to be suitable for all ages. At the same time, however, commercial television's offerings designed specifically for small children dwindled and almost disappeared, replaced by still more standard cartoon fare, with its super muscled heroes and its violence.

TV's "docudramas" are also frequently a subject of controversy. They are often heavily promoted "specials", in which historical personages are presented in dramatic situations that may add interest to the narrative but may be essentially fictitious. On the other hand, the networks have attempted to confront such major social issues as drug abuse, AIDS, battered wives, rape, and homosexuality by presenting dramas that honestly elucidate the problems involved.

Artificial Satellite :

An artificial satellite is an object placed into orbit around the Earth for the purpose of scientific research, Earth applications, or military reconnaissance. Orbit is achieved when the object is given a horizontal velocity of approximately 28,500 km/h (17,500 mph) at sea level. At this velocity the Earth's surface curves away from the horizontal as fast as gravity pulls the object downward. As the altitude of the satellite increases, its velocity decreases, and its period-the time the satellite takes to circle the Earth-increases. A satellite 275 km (170 mi) above the Earth's surface will have a period of 1.5 hours and a velocity of 27,860 km/h (17,300 mph), but the same object 35,840 km (22,300 mi) above the Earth would have a period of 24 hours (the same as the Earth's rotation) and a velocity of only 11,050 km/h (6,850 mph). A satellite in the latter orbit is called a synchronous satellite; if such a satellite orbits in the equatorial plane, it is termed geostationary because it will remain at the same point above the Earth's.

References

1. *Lealie, G. R., and korman, S. K., The Family in Social Context (1985)*
2. *Stephens, W. N., The Family in Cross-Cultural Perspective (1982).*
3. *Chetty, P. R., Satellite Technology and Its Applications, 2d ed. (1991).*
4. *Hoard, S. L., and Consultants, Satellite Services Sourcebook (1985)*
5. *Payne, Silvano, International Satellite Directory (annual)*
6. *The New Grolier Multimedia Encyclopedia*
7. *The Daily Janakantha (10-5-1998)*
8. *Thoughts On Economics-The Quarterly Journal Of Islamic Economic Research Bureau.*

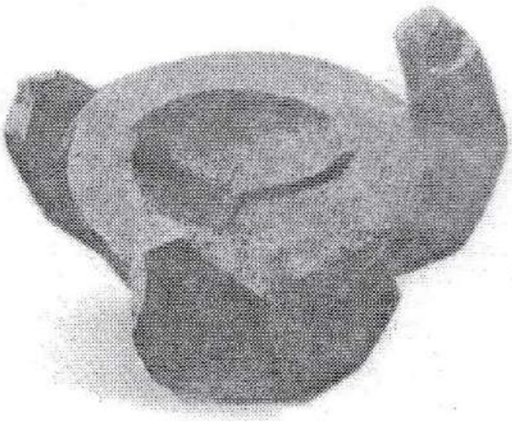

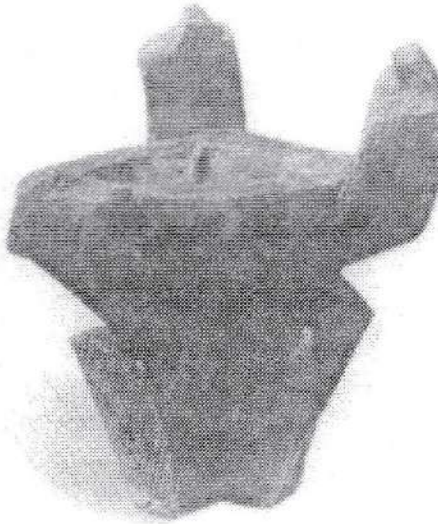

গল্প

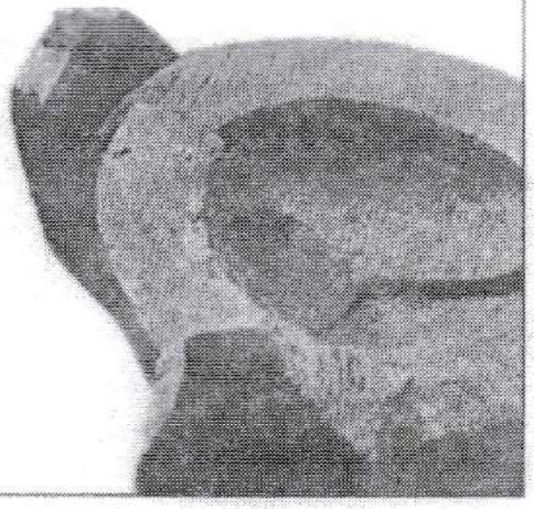

একটা কথা মনে রেখো, গল্প ফটোগ্রাফ নয়। যা দেখেছি, যা জেনেছি, তা যতক্ষণ না মরে গিয়ে ভূত হয়, একটার সঙ্গে আর একটা মিশে গিয়ে পাঁচটায় পঞ্চত্ব পায়, ততক্ষণ গল্পে তাদের স্থান হয় না।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অস্পষ্ট বেদনা

এস, এম, ইমরান হোসেন

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১, বিভাগ ঃ বাণিজ্য

রিমঝিম রিমঝিম বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। আজ সকালের দিকে আকাশ পরিষ্কার থাকলেও দুপুরের দিকে আকাশের এক পাশ কালো মেঘে ঢাকা ছিল এবং সেই মেঘই বিকেলের শুরুতে সারা আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় তীব্র বাতাসের পর বৃষ্টি নামতে শুরু করে। গল্পের বই পড়ার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও হাতে নিয়ে রেখে দিলাম। বিদ্যুৎ চমকানোর কিছুক্ষণ পরই একটি বজ্রপাতের শব্দ হল। শব্দ শুনে জানালার কাছে এসে দাড়ালাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হল সমস্ত আকাশটা যেন একটা কালো পাহাড় আর তারই মধ্যে দিয়ে ঝর্ণার পানি প্রবাহিত হয়ে পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে পৃথিবীর বুকে ছিটকে পড়ছে। ঠিক এ সময়টিতে দু'বছর আগের একটি অস্পষ্ট বেদনা বিদূঢ় ঘটনা আমার বুকের ভিতর নাড়া দিয়ে ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে একেক বারে চোখের সামনে ভেসে উঠলো—

সে দিনটি ছিল বুধবার। মাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। মার শরীরটা বেশ কদিন ধরেই খারাপ যাচ্ছে। তাই ঠিক করলাম, সে দিনই মাকে নিয়ে ঢাকা যাব। আমাদের বাড়িটা ছিল ঢাকা শহর থেকে বেশ দূরে। তাই সকালের দিকেই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সে দিনের আকাশটাও মেঘলা ছিল। আমাদের ফিরে আসতে বিকেল হয়ে গেল। বাস থেকে নেমে যখন বাড়ির দিকে রওনা দিলাম, ঠিক তখনই বজ্রপাত হয়ে বৃষ্টি নামতে শুরু করল। ঘন অন্ধকারে এবং প্রচন্ড বৃষ্টিতে রাস্তার দোকান পাটগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। একটি রিক্সাও নেই যে, আমার অসুস্থ মাকে নিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব। এরই মধ্যে আর একটা বজ্রপাতের আওয়াজ হল। আমি মাকে ভয়ে জড়িয়ে ধরলাম। অনেকক্ষণ হাঁটার পর সামনে একটি খোলা দোকান দেখতে পেয়ে সেখানে এসে দাড়াঁলাম। কিন্তু দোকানে কাউকে দেখতে পেলাম না। কিছুক্ষণ পর একটি লোক এসে আমাদের দোকানের বাইরে দাড়াতে বলল। কারণ সে দোকানটা বন্ধ করে দেবে। লোকটার কথাবার্তা এবং আচরনে এমন একটি রুক্ষভাব প্রকাশ পেল যে, আমাদের আর সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করল না, আমরা আবার পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম, হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে পায়ের স্পর্শে একটি গর্ত অনুভব করলাম। আমি খুব সাবধানে সেটা অতিক্রম করে যেই মায়ের হাত ধরতে যাই মাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। অন্ধকারে তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমি চিৎকার করে উঠলাম কিন্তু বৃষ্টির আওয়াজ আর বাতাসের শব্দে আমার কণ্ঠস্বর একাকার হয়ে গেল। তবুও শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললাম, মাগো একবার শুধু তোমার হাত দুটো বাড়িয়ে দাও। আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে টেনে তুলব। কখন যে একটা দমকা হাওয়া এসে আমাকে গাছের সাথে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, তারপর কিছু মনে নেই। দু'দিন পর জ্ঞান ফিরলে, জানতে পারলাম যে গর্তটি অতিক্রম করে আমি এসেছি,তার কিছু দূরেই একটি কাঁঠাল গাছের তলায় আমাকে অচেতন অবস্থায় সেখানকার লোকেরা উদ্ধার করেছিল। আর আমার মাকে গর্তটার পাশেই একটি ডোবা থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

আজ রোববার। আর দু'দিন পর আমার মায়ের মৃত্যুর দু'বছর পুরো হবে। এত দিন হয়ে গেল আমার এসব কথা কিছুই মনে পড়েনি। অথচ আজ যেন আমার মনস্পটে সব কিছু সুস্পষ্ট হয়ে জেগে উঠছে। ভাবতে ভাবতে কখন যেন বৃষ্টি থেমে গিয়ে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দূর থেকে আযানের সুমধুর আওয়াজ ভেসে আসছে। আমি আমার অস্পষ্ট বেদনায় ভারাক্রান্ত মনকে আযানের সুমধুর আওয়াজের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

ভয়ঙ্কর এক রাতের কাহিনী

শেখ মোঃ জাহেদুজ্জামান

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ১৮, বিভাগ ঃ বিজ্ঞান

আমি তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র সালটা ছিল ২০০১ সময়টা ছিল শীতকাল। আমার দুই বন্ধু ছিল। আমরা একই স্কুলে একই ক্লাশে ছোট বেলা থেকে পড়াশুনা করতাম। আমার দুই বন্ধুর নাম ছিল সিয়াম ও রনি, সিয়ামের বাবা ঢাকায় চাকুরি করতেন। আমার ও রনির বাবা করতেন ব্যবসা। আমরা বন্ধুরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাসায় যেতাম। আমাদের প্রত্যেকের মাঝে এক সময় পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠল, হঠাৎ একদিন শুনলাম সিয়ামরা রাঙ্গামাটি চলে যাচ্ছে, ওর বাবাকে বদলি করা হয়েছে। আগামী মাসের ১৪ তারিখে ওরা রাঙামাটি যাচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকের মন খারাপ। আস্তে আস্তে ওদের সেই চলে যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এল। ওর মা-বাবা ভাইবোনসহ আমার ও রনির পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে গেল।

আমি ও রনি নির্ধারিত দিন সকাল ৭টার সময় সিয়ামদের বাসায় উপস্থিত হই। আমি একটি সুন্দর ডায়েরি ও কলম এবং রনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস ও লাল গোলাপ উপহার দেই সিয়ামকে। আমাদেরকে সিয়াম ও তার পরিবারের সবাই রাঙামাটি যেতে বলে। সিয়াম বলল আমি যেয়ে চিঠি লিখব ঠিকানা পাঠাব, তোরা চিঠি লিখিস। আর বেড়াতে যাবি। আমরা ওকে কথা দেই যে, সময় ও সুযোগমত বেড়াতে যাব। কথা বলতে বলতে আমরা বাস ষ্টেশনে চলে আসি। রওনা হবার আগে সিয়ামদের বাড়ির সকলে বিদায় নিয়ে বাসে উঠে। সিয়াম বিদায় জানাতে যেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আমি ও রনি ওকে অনেক বুঝিয়ে বাসে তুলে দেই। বাস ছেড়ে দেয় আমরা দুজন বাসায় চলে আসি। তার কিছুদিন পর সিয়াম যেয়ে চিঠি পাঠায়। ওর ঠিকানা দেয় আমাদের কাছে। আমাদের সঙ্গে সিয়ামের চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ হয়। সিয়াম লিখছে রাঙামাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে। ও ওখানে গিয়ে মুগ্ধ। আমাদের কাছে চিঠি লিখেছে শীতের প্রথমে ক্লাশের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে রাঙামাটি যেতে। শীতকালে নাকি আরও সুন্দর লাগে রাঙামাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য। আমি ফোন করে রনিকে বাসায় আতে বলি। রনি বিকালে আমাদের বাসায় আসে। আমি ও রনি ঠিক করি, আমাদের এবার নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে আমরা রাঙামাটি বেড়াতে যাব।

আমরা আমাদের মা-বাবাকে রাজি করিয়ে ফেলি। এক সময় পরীক্ষা শেষ হয়। এর মধ্যে সিয়ামকে ঠিঠি লিখে জানিয়ে দিই আমরা রাঙামাটি আসছি। আমাদের যাবার দিন ঠিক হয় ৬ ডিসেম্বর। যথারীতি ঐদিন সকালে আমি ও রনি ঢাকা থেকে রাঙামাটি যাবার গাড়িতে উঠি। সকাল আটটায় গাড়ি ঢাকা ছাড়ে। আমি জানালার পাশে বসি আর রনি আমার পাশে। রাঙামাটির বিলাশ বহুল হিনোগাড়ি ছুটে চলছে হু হু করে। আমরা চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এক সময় পৌঁছে গেলাম চট্রগ্রামে, চট্রগ্রামের ভিতর দিয়ে রাঙামাটির

রাস্তায় পরলাম, হঠাৎ বাস বিকট শব্দ করে দাড়িয়ে গেল। আমরা ড্রাইভারের পাশের সিটে বসা ছিলাম। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার ভাই, গাড়ির সমস্যা হলো? ড্রাইভার বলল চেক না করে বলা যাবে না। ড্রাইভার দেখে শুনে বলল ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে। সারা রাতে ৩/৪ ঘন্টা সময় লাগবে। এ কথা শুনে যাত্রীরা গাড়ী থেকে নেমে পরল। আমি ও রনি নামলাম বাস থেকে। পাহাড়ী রাস্তার পাশে গাড়ি দাড়িয়ে আছে। ড্রাইভার সকলকে বলল কেউ বেশি দূরে যাবেন না। আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি ইঞ্জিন সেরে রওনা দেব। আমরা পাহাড়ের রাস্তা বেয়ে অল্প উপরে উঠি, ঘন জঙ্গলে ভরা পাহাড়ের সৌন্দর্য আমাদের আকৃষ্ট করে। আমি ও রনি মুগ্ধ হয়ে পাহাড়ী জঙ্গলে হাটতে থাকি। কতক্ষণ হেঁটেছি জানিনা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বিকাল পাঁচটা বেজে গেছে। আমি রনিকে বলি চল ফিরে যাই, বলেই ফিরতি পথ ধরি। কিন্তু দশ মিনিট পথ না চলতেই পথ হারিয়ে ফেলি। এবার দুজনই পড়লাম বিপাকে। এদিকে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পাহাড়ী জঙ্গলে আমরা দুটি প্রাণী। কাছে কাপড়ের ব্যাগ ও যৎসামান্য খাবার ছাড়া কিছুই নেই। আমরা মরিয়া হয়ে রাস্তা খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু কিছুই হলো না। রাস্তা খুজে পেলাম না। দুই বন্ধু পড়লাম মহা চিন্তায় রাত কাটাব কি করে এ গহীন জঙ্গলে। দুজন মিলে ঠিক করলাম যে কোন গাছের উপরে উঠে রাত কাটাব। কিন্তু সমস্যা হল আমি গাছে উঠতে জানি না আর রনি অল্প পারে। আমরা বইতে পড়েছি এসব পাহাড়ী জঙ্গলে সাপ, বানর, বাঘ, ভাল্লুক ও নানা রকম কীট পতঙ্গ থাকে। ভয়ে আমাদের প্রাণ যায় যায়।

যা হোক রনি আমাকে অনেক চেষ্টা করে একটি গাছের ডালে উঠাল এবং ও নিজে ও উঠে পড়ল। বেছে বেছে একটা দুইটা ডালের ফাঁকে দুইজন বসে পড়লাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে ব্যাগে যে সামান্য রুটি, কলা, পানি ছিল দু'জনে ভাগ করে খেয়ে নিলাম। তারপর দুজন চুপচাপ বসে গল্প করতে লাগলাম। একটু পরে আমার পিঠে কি বেয়ে উঠছিল। আমি ভীষন ভয় পাই। রনিকে দেখতে বলি। রনি দেখে একটা বিছা। ও আমাকে না বলে একটা লাঠি দিয়ে ফেলে দেয় আমার পিঠ থেকে। এদিকে গাছের মাথায় বানর কিচ কিচ করছে। আমরা দুজন তো ভয়ে মারা যাবার উপক্রম। অল্প কিছুক্ষণ পরেই দেখি আমাদের গাছ বেয়ে বিরাট এক অজগর উঠছে। আমি আর রনি তখন ভয়ে বরফের মত জমে গেছি। আমি রনিকে বললাম যে রনি একটা ডাল ভাঙ্গ। রনি একটা ভাল ডাল ভাঙ্গল। আমি ডালটি হাতে নিয়ে জোরে জোরে অজগর সাপের গায়ে আঘাত করতে থাকি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে অজগরটি গাছ থেকে সরে জঙ্গলে হারিয়ে গেল। আমরা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। তারপর সারা রাত আমরা দু'জনে ভয়ে ভয়ে থাকলাম। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে এরপর সারারাত আর কোন দূর্ঘটনাই ঘটল না। অনেক উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে রাত কাটালাম।

ভোরের আকাশে সূর্য দেখা দিলে আমরা গাছ থেকে নামলাম। সারারাত আমাদের শীতের কথা মনে ছিল না। কিন্তু সূর্য উঠার পর গাছ থেকে নেমে আসলে শীত ঝেঁকে বসে। পাহাড়ী জঙ্গল ভেঙ্গে প্রায় আড়াই ঘন্টা পর আমরা রাঙামাটি যাবার মূল রাস্তা খুঁজে পাই। আমরা মূল রাস্তার পাশেই বসে থাকি। অল্প কিছুক্ষন পর আমরা একটা প্রাইভেট কার পাই। সেটি ভাড়া করে আমরা সিয়ামদের দেয়া ঠিকানা অনুযায়ী ওদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। তবে তার আগের দিন রাতের কথা আমি ও রনি জীবনেও ভুলবনা। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন আমাদের এ বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা মনে থাকবে।

মুরগি ব্যবসায়ী

মোঃ ইমরান আহম্মেদ

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৩৫

অনেক অনেক দিন আগে একটি ছোট গ্রামে বাস করত এক মুরগি ব্যবসায়ী। সে গ্রামে গ্রামে মুরগি বিক্রি করত। গ্রামে মুরগি বিক্রি করে বেশি লাভ হত না। তাই সে শহরে চলে আসে। আসার সময় প্রতিজ্ঞা করে যে তার ব্যবসার লাভ থেকে পাঁচশত টাকা একজন অন্ধ লোককে দেবে। সে শহরে এসে মুরগি বিক্রি করে সাড়ে দশহাজার টাকা পায়। তার মোট খরচ দশ হাজার টাকা বাদ দিয়ে সে দেখতে পায় যে তার মোট লাভ হয়েছে পাঁচশত টাকা। তারপর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য পাঁচশত টাকা একজন অন্ধ ভিক্ষুককে দিয়ে দিল। ভিক্ষুক এতগুলো টাকা পেয়ে ব্যবসায়ীকে বলল, এত টাকা দিয়েছেন কেন? এখানে কত টাকা আছে ? ব্যবসায়ী বলল পাঁচশত টাকা অন্ধ ভাবল যে কখন ও দশ টাকার ওপর পায়নি, এখন সে পাঁচশত টাকা পেয়েছে। অন্ধ ব্যবসায়ীকে বলল, আপনার কাছে কত টাকা আছে ? ব্যবসায়ী বলল, "দশ হাজার টাকা" অন্ধ তখন মনে মনে ফন্দি আটল এবং বলল, আমি কখন ও দশ হাজার টাকা হাতে নিই নি আপনি যদি টাকাটা আমার হাতে দিতেন তবে একটু ছুয়ে দেখতাম। ব্যবসায়ী সরল মনে অন্ধকে টাকা দিলে অন্ধ চিৎকার করে লোক ডেকে বলল " এই লোকটি আমার টাকা ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে।" তখন লোকজন ব্যবসায়ীকে মারধোর করে অন্ধকে টাকাটা দিয়ে দেয়। ব্যবসায়ী তখন মনে মনে বুদ্ধি বের করল। সে ভাবল অন্ধ যখন বাসায় যাবে তখন সে অন্ধের কাছ থেকে তার টাকা নিয়ে নেবে। এরপর রাত হলে অন্ধ লোকটি বাসায় গেল। তার সাথে থাকত আরও দুই অন্ধ। তখন ১ম অন্ধ লোকটি জিজ্ঞেস করল, কিরে তোরা আজ কত টাকা পেয়েছিস? তখন অপর দুই অন্ধের একজন বলল আমি চল্লিশ টাকা পেয়েছি। অন্য একজন বলল, আমি সত্তর টাকা পেয়েছি। তখন সেই অন্ধ লোকটি বলল, আমি সাড়ে দশ হাজার টাকা পেয়েছি। তখন সেই দুই অন্ধ বুদ্ধি করল যে তারা ১ম অন্ধ লোকটিকে মেরে সেই টাকা নিয়ে যাবে। তখন তারা তিন অন্ধ মিলে মারামারি শুরু করল, তারপর তারা মারামারি করতে গিয়ে তিন জনই মারা গেল। ব্যবসায়ী তখন মহা ঝামেলায় পড়ে যায়। সে তখন তাদের সবটাকা নিয়ে লাশ তিনটি গুম করার জন্য মানুষ খুঁজতে থাকে। তখন সেই রাস্তা দিয়ে একজন পাগল যাচ্ছিল। ব্যবসায়ী তখন দুইটি লাশ ঢেকে রেখে পাগলকে ডাক দিয়ে বলে এই লাশটাকে অনেক দূরে ফেলে আসলে তোমাকে পাঁচশত টাকা দেব। পাগল তখন রাজি হয়ে লাশটাকে অনেক দূরে ফেলে দিয়ে আসে। এসে ব্যবসায়ীকে বলে আমার টাকা দাও। ব্যবসায়ী তখন পাগলকে বলল, কি আবোল তাবোল বকছ, লাশতো এখানে পড়ে আছে। তখন সে পাগলকে অন্য একটা লাশ বের করে দেখাল। পাগল ভাবল হয়ত লাশ তার আগেই এখানে এসে পরেছে। তখন সে আবার লাশটিকে অনেক দূরে ফেলে দিয়ে এসে টাকা চায়। তখন ব্যবসায়ী বাকি একটি লাশ বের করে বলে লাশ কোথায় ফেলেছ। লাশতো এখানে। তখন পাগল লাশটিকে বস্তায় ভরে ব্রিজের উপর থেকে নদীতে ফেলে দেয়। তখন নদীতে মাছ ধরছিল এক জেলে। জেলেটি বস্তা দেখে ভয়ে দৌড়ে পালায়। ব্রিজের উপর থেকে জেলেকে পালাতে দেখে পাগল ভাবল লাশ পালিয়ে যাচ্ছে। এই ভেবে সে জেলের পেছনে দৌড়াতে লাগল। টাকা নেয়ার কথা তার মনে থাকল না। এরপর ব্যবসায়ী তার টাকা নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে এবং সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

বন্ধু

মোঃ রিয়াজ উদ্দিন

এস, এস, সি পরীক্ষার্থী (বাণিজ্য বিভাগ)

আজ সকাল থেকেই হাসিবের মনটা খুব খারাপ। কারণ তার খালা তাকে আজ ঢাকা নিয়ে যাবে। হাসিব থাকে কাউখালী। এখানের এক বিদ্যালয়ে সে পড়াশুনা করে। তার বাবা একটু পাগল ধরনের সবাই বলে হাসিবের মায়ের মৃত্যুতে নাকি তার বাবার এই অবস্থা হয়েছে। হাসিব তার বাবাকে ছাড়া একদিনও থাকতে পারে না। তাই সে যেতে রাজি নয়। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীর সকলেই তাকে বুঝিয়ে ঢাকায় পাঠিয়ে দিল। ঢাকা এনে তার খালা তাকে এক নামকরা স্কুলে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দিল। সে নিয়মিত স্কুলে আসে এবং পড়াশুনায় ভাল। তাই শিক্ষকরা তাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। কিন্তু এই স্নেহ ক্লাসের ফার্স্ট বয় অমিতের ভাল লাগে না। সে হাসিবকে শত্রু হিসেবে দেখতে লাগল। তাই সে সর্বদা হাসিবের পিছনে লেগে থাকত।

একদিন হাসিব স্কুলে প্রবেশ করে দেখল যে অমিত ও তার কয়েকজন বন্ধু গল্প করছে। তখন অমিত হাসিবকে দেখে বলল, "ঐ রকম পাড়া গাঁয়ের স্কুলে কে না ফার্স্ট হতে পারে। আমি ঐ স্কুলে না পড়েই ফার্স্ট হতাম। এটা হল ঢাকার নামকরা স্কুল। এখানে ফার্স্ট হওয়া অত সহজ নয়। আর ও যদি ফার্স্ট হয় তবে আমি এ স্কুলেই পড়ব না। হাসিব যে কাউখালী স্কুলে ফার্স্ট হত এটা সে হাসিবের বন্ধু সাকিবের নিকট থেকে শুনেছে। অমিতের এই কথা হাসিবের মনে আঘাত হানল। তখন সে ক্লাসে বসে কাঁদতে লাগল। সাকিব তাকে কাঁদতে দেখে তাকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করল। হাসিব সব ঘটনা খুলে বলল। সাকিব বলল দেখ হাসিব তোকে এর দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে হবে। তুই এবার ফার্স্ট হয়ে দেখিয়ে দে। তুইও পারিস। বাড়িতে এসে হাসিব তার খালাকে এই ঘটনার কথা বলল। তার খালাও তাকে একই কথা বললেন। এভাবে দেখতে দেখতে বার্ষিক পরীক্ষা চলে এল এবং এক সময় পরীক্ষা শেষ হল। হাসিব ভালভাবেই সবগুলো পরীক্ষা দিল। কিছুদিন পর ফলাফল ঘোষণার নির্ধারিত দিন এল। ফলাফলের দিন সকলেই তাড়াতাড়ি এল। সেদিন সবার মনে উৎকণ্ঠা, কে ফার্স্ট হবে? হাসিব না অমিত। ফলাফল ঘোষণার জন্য শ্রেণী শিক্ষকসহ প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রবেশ করলেন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথার পর প্রধান শিক্ষক ফলাফল ঘোষণা শুরু করলেন। শুরুতেই তিনি প্রথম দশজনের নাম বললেন। প্রথম হয়েছে হাসিবুর রহমান, দ্বিতীয় হয়েছে মেহেদী হাসান, তৃতীয় হয়েছে সাকিবুর রহমান। এভাবে নয় জনের নাম ঘোষণা করার পর সকলেই আশ্চার্যান্বিত হল। এখন ও পর্যন্ত অমিতের নাম ঘোষিত হয়নি। এরপর প্রধান শিক্ষক বললেন, দশম হয়েছে গতবারের ফার্স্ট বয় অমিত হাসান। এই দশ জনের ফলাফল দিয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক চলে গেলেন। তারপর শ্রেণী শিক্ষক বাকী সবার ফলাফল দিয়ে চলে গেলেন। সবাই বলাবলি করল অমিতের উচিত সাজা হয়েছে। কিন্তু হাসিবের খুব খারাপ লাগল। সে ভেবেছিল সে ফার্স্ট এবং অমিত দ্বিতীয় হবে। কিন্তু অমিত যে এত পিছনে পড়বে তা সে ভাবতেও পারেনি। ওদিকে অমিত মাথা নিচু করে কাঁদছিল। তখন হাসিব তার হাত অমিতের পিঠে রেখে বলল, "বন্ধু কেঁদো না। এবার ফার্স্ট হওনি তো কি হয়েছে, আগামীবার তুমি অবশ্যই ফার্স্ট হবে। তখন অমিত তাকে বলল, "আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। আসলে তুমি বন্ধুর মত।" হাসিব বলল, "বন্ধুর মত নয়, বন্ধুই।" অমিত তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আসলেই তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু।

নতুন প্রজন্মের জন্য

মোঃ মাহবুব আলম

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ২, বিভাগ ঃ বিজ্ঞান

রাণী মৌমাছি এই মাত্র ডিম পেড়ে ফিরেছে। সকল কর্মীর কর্ম দেখছে। যারা নতুন জন্মেছে তাদের কর্মের প্রতি আরও ভালভাবে লক্ষ্য রাখছে। দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখে পড়ল এই চাকের সবচেয়ে প্রবীন কর্মী বর্তনকে। বর্তন এখানকার সবচেয়ে অভিজ্ঞ মৌমাছি। সে প্রতিদিনই সবার চেয়ে বেশি মধু সংগ্রহ করে। তাছাড়া রাণীকে বেশ শ্রদ্ধা করে যা হোক, তাকে দেখে রাণী মৌমাছি ডাকল। সে রাণীর ডাকে সাড়া দিল।

রাণী ঃ সব ঠিকঠাক চলছে?

বর্তন ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ ?

রাণী ঃ ক'জন নতুন রাণী বেরিয়েছে ?

বর্তন ঃ আজ্ঞে, আজ পঞ্চাশটি নতুন রাণী কুঠুরি থেকে বেরিয়েছে।

রাণী ঃ পঞ্চাশটি! আর আমি এখনও তা জানতে পারিনি ?

রাণী সকল নতুন জন্ম নেয়া রাণী মারতে বের হল কারণ তার চাকে শুধু সেই সক্রিয় রাণী হিসেবে থাকতে চায়। তাই সে হুল ফুটিয়ে একে একে সকল নতুন রাণীকে মেরে ফেলল। তারপর ফিরল। অন্যান্য কাজ শেষ করে দিনের সমাপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল।

নতুন দিন শুরু হল সকলেই যার যার কাজে লেগে পড়ল রাণী মৌমাছি প্রতিদিনের মত সকল মৌমাছির কাজের প্রতি নজর রাখছে। শুধু এই তার কাজ নয়, নতুন মৌমাছি জন্ম দেয়ার জন্য ডিম পাড়াও তার কাজ। ডিম পাড়ার পর কুঠুরিতে ফিরে অন্যদের কার্যক্রম দেখতে গিয়ে এ চাকের এক নতুন মৌমাছিকে চাকের দিকে না এসে লোকালয়- এর দিকে যেতে দেখল। সে বর্তনকে ডাকল।

রাণী ঃ বর্তন, এই বর্তন বর্তন অনেক দূর থেকে রাণীর ডাক শুনতে পেয়ে তড়ি ঘড়ি করে ছুটে এলো।

বর্তন ঃ আজ্ঞে মহারাণী।

রাণী ঃ কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

বর্তন ঃ এইমাত্র মধু নিয়ে ফিরলাম মহারাণী।

রাণী ঃ ঐ নুতন মৌমাছিটি লোকালয়ের দিকে যাচ্ছে কেন?

বর্তন ঃ জানি নে।

রাণী ঃ জলদি ওকে, ডেকে আনো।

বর্তন দ্রুত উড়ে গেল এবং নতুন মৌমাছিটাকে থামিয়ে তার সঙ্গে করে রাণীর সামনে নিয়ে আসল।

বর্তনঃ মহারাণী এতো সম্পূর্ণ চেতনাহীনভাবে লোকালয়ের দিকে যাচ্ছিল।

রাণী ঃ কি নাম এর ?

বর্তন ঃ এর নাম আন্ডিস।

আন্ডিসের দিকে তাকিয়ে রাণী বলল, তুমি লোকালয়ের দিকে যাচ্ছিলে কেন ?

আন্ডিস ঃ আ-আ- আজ্ঞে মহারাণী আমি মধু নিয়ে ফিরে আসার সময় অন্য এক জায়গায় মধুর

সুবাস পাই। তখন নিজের অজান্তেই সেই দিকে চলে যেতে থাকি। বর্তন মৌমাছিই তো আমায় ফেরালেন।

রাণী ঃ আচ্ছা বর্তন অন্য জায়গা থেকে মধুর সুবাস কিভাবে আসল জান কি ?

বর্তন ঃ আমার মনে হয় লোকালয়ের কৃত্রিম মৌচাক থেকে এসেছে।

রাণী ঃ ভালো, ভালো, সেখানে কিছু মৌমাছি চলে গেলে মানুষেরও উপকার হবে মৌচাকও ছোট থাকবে।

বর্তন ঃ তা ঠিক।

রাণী ঃ শোন, শোন আজ ক'জন নতুন রাণী বের হয়েছে।

বর্তন ঃ ত্রিশ জন।

আবারও নিত্য দিনের মত নতুন রাণী নিধন চলল এবং বিভিন্ন কর্মের মধ্য দিয়ে দিনের সমাপ্তি ঘটল। এমনি ভাবে চলে যেতে লাগল দিন। প্রতিদিনই নতুন রাণীদের মেরে ফেলা হয়।

এমনি একদিন রাণী মৌমাছির মনে লোকালয় দেখার আগ্রহ জন্মায় এবং প্রবল আগ্রহটাকে রোধ করতে না পেরে চলে গেল লোকালয়ের দিকে। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটি স্কুলের ছাত্রদের সমবেত কবিতা আবৃত্তি শুনতে পেল শুরুটা এরকম—"এসেছে নতুন শিশু তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান

জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত্যু আর ধ্বংসস্তুপ পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের।"

শুনে রাণীর মনে একটা অজানা অনুভূতি সৃষ্টি হল। তখনই দেখল স্কুলের আয়া তাকে ঝাড়ু নিয়ে মারতে আসছে। তা দেখে তো রাণীর আত্মারাম খাঁচা ছাড়া ভোঁ-দৌড় দিয়ে প্রাণে বাঁচল, ফিরে আসল মৌচাকে। এখনও তার কানে পংক্তিগুলো ভাঙা রেকর্ডের মত বাজছে।

পরের দিন রাণী ঘুম থেকে উঠল। তার চোখে মুখে বিষন্নতার ছাপ। বর্তন রাণীর এই অবস্থা লক্ষ্য করল। রাণীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, মহারাণী আপনাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন?

রাণী ঃ জানি না।

বর্তন ঃ এ রকম তো আর হয় নি?

রাণী কিছুই বলল না, সে আজ কিছুই করছে না, নিশ্চুপ হয়ে আছেন। বর্তন আবার বলল আজ তো আমায় দেখেও আপনি নতুন রাণীদের কথা জিজ্ঞেস করলেন না।

রাণী ঃ আর কত? এরাই তো আমাদের ভবিষ্যত। এই নতুন প্রজন্মের জন্য তো আমাদেরই সুযোগ করে দিতে হবে তা ছাড়া মৃত্যুর কষ্ট তো ওদের মধ্যে ও আছে।

বর্তন ঃ অ্যাঁ,-অ্যাঁ-অ্যাঁ।

রাণী ঃ আর দেরি নয়। পঞ্চান্ন হাজার কর্মী থেকে পঁচিশ হাজার পুরনো কর্মী নিয়ে তৈরি হও ছেড়ে দিতে হবে স্থান চলে যেতে হবে আমাদের। পুরনো রাণী বর্তনসহ পঁচিশ হাজার পুরনো কর্মী নিয়ে চলে গেল। নতুনদের জায়গা করে দিল। কিন্তু আমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব যারা নিজেরাই এই সকল মহোক্তির উদ্ভাবক তারা কি এগুলো মেনে চলি ?

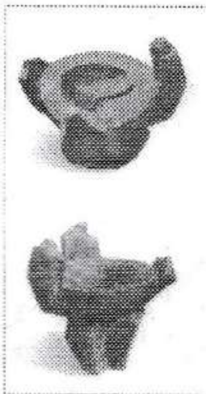

টুনুর কাণ্ড

মোঃ আরিফুর রহমান

শ্রেণী ঃ ৯ম; শাখা ঃ ক; রোল নং ঃ ৩

টুনু, মধু এবং হাবু একই গ্রামের ছেলে এবং বন্ধু। টুনুর বয়স ১০ বছর, মধুর বয়স ১১ বছর ৬ মাস আর হাবুর বয়স ১৩ বছর। বয়সে হাবু বড় হলেও সে ছিল সবচেয়ে ভীতু এবং দুর্বল। আর ১০ বছরের টুনু ছিল গ্রামের দুষ্টের শিরোমনিদের রাজা। টুনুকে গ্রামের সকল ছেলেমেয়েই সন্মান করত এবং কোন কুবুদ্ধির জন্য তার কাছে আসত এবং জটলা বাঁধাত। টুনু, মধু; হাবু সবসময় একসাথে থাকত। টুনুদের বাড়ির পূর্বে হাবুদের বাড়ি এবং উত্তরে মধুদের বাড়ি। টুনু মধু এবং হাবু তিনজনই রোজ স্কুল পালাত। স্কুল পালিয়ে অনেক দূরে চলে যায়। ফিরে এসে স্কুলের ছাত্রদের বলতে পুরো পৃথিবীটা দেখে এলাম। আমাদের গ্রামের বাইরে গেলে কত যে মজা চারদিকে এই রকম গল্প এজন্য অবশ্য তাদের স্কুলে এবং বাড়িতে কঠোর শাস্তি পেতে হত। প্রতিদিনের মত আজও টুনু সকালে মধুর বাড়িতে গিয়ে শীষ দেয়। শীষ শুনেই মধু নাস্তা খাওয়া থেকে উঠে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে আসে। মধু বের হয়ে এসেই অবাক। টুনুর মাথায় ব্যান্ডেজ। মধু জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে টুনু তোর মাথায় ব্যান্ডেজ কেন? টুনু বলল, স্কুলে চল সব বলছি। কাল রাতে আমি আর হাবু গিয়েছিলাম টুনুকে বেত্রাঘাত করতে। যেই কথা সেই কাজ। পরদিন তারা মাওলানা স্যারের রান্নাঘর চূর্ণ করে দিল। রান্নাঘর ভাঙ্গতে তাদের সুবিধাই হয়েছিল। বাড়িতে মাওলানা স্যারের স্ত্রী ছিলেন না আর স্যার ছিলেন স্কুলে। খালি ঘরে তারা বীরের মত রান্না ঘরের হাড়িপাতিল বেড়া ভাঙ্গতে শুরু করল। যেন ভাল একটা কাজ করছে। টুনুতো বাঁশ দিয়ে রান্নাঘরের চুলা ভাঙ্গতে লাগল আর গান ধরল—

আজ পাশা খেলবরে শ্যাম
একলা পাইয়াছি ঘর
করব যে চুরমার।

পরদিন টুনু স্কুলে গেল। মাওলানা স্যার বাংলা ক্লাশ করাতে আসলেন। কবিতা আবৃত্তি করছেন—

" আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে সেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে ছুটিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।"

টুনু দাড়িয়ে স্যারকে জিজ্ঞেস করল, স্যার আপনার রান্নাঘরের অবস্থা কি? স্যারতো অবাক টুনু এ খবর জানল কি করে। স্যার উত্তর দিল কে যেন খালি ঘরে আমাদের রান্না ঘরের তৈজসপত্র ভেঙ্গে দিয়েছে এবং বেড়া নিয়ে গেছে। টুনু বলল স্যার এই কাজটি আমি মধু আর হাবু করেছি। স্যার হাবু খুব গরীব। ওদের রান্নাঘরের যেনতেন অবস্থা। তাই স্যার আপনার রান্নাঘর ভেঙ্গে আমরা হাবুদের রান্নাঘর ঠিক করে দিয়েছি। স্যার তো বেজায় রেগে গেলেন, কেন তুমি এ কাজটি করেছ? টুনু বলল কেন স্যার আপনিই তো পড়াচ্ছেন—

"আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর
আপন করিতে ছুটিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।"

অতি দুঃখের মধ্যেও স্যার হাসলেন। আর মনে মনে বলতে লাগলেন কবিতা লিখেছেন জসীমউদ্দীন আর ঘর ভাঙ্গল আমার। কবি এভাবে কবিতাটি না লিখলেও পারতেন।

অদ্ভুত ইচ্ছা

মোঃ সিফাত ইসলাম

শ্রেণী ঃ ৮ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১১

এক বৃদ্ধের তিন ছেলে মৃত্যুপত্রযাত্রী ঐ বৃদ্ধের তিন ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে তিনি একটু শঙ্কিত ছিলেন। তাই একদিন তিনি তার ছেলেদের ডেকে তাদের ভবিষ্যত পেশার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। বড় ছেলে বাবার মত ব্যবসায়ী হতে চাইল। মেজ ছেলে চাইল পড়াশুনা করে চাকরী করতে। কিন্তু বার বছরের ছোট ছেলে ডাকাত হওয়ার অদ্ভুত ইচ্ছা পোষন করল। বাবা তো শুনে হতবাক। অনেক বুঝিয়েও ছোট ছেলের ইচ্ছাকে ফিরিয়ে নিতে পারেনি। অবশেষে বাবা তার ছেলের দুঃসাহসের পরীক্ষা করার জন্য একটা সাত রাজার মানিক দিয়ে বলল "সকালে এটা নিয়ে বের হয়ে সারাদিন ঘুরে রাত দ্বিপ্রহরের পর মানিক নিয়ে ফিরতে পারলেই বুঝব তুমি ডাকাত হতে পারবে। যেই কথা সেই কাজ। বাবার পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য ছোট ছেলে সারাদিন ঘুরে পৌছে গেল এক গহীন জঙ্গলে। রাত তখন প্রায় দ্বিপ্রহর খুব ঘুম পেয়েছিল তার। একটা গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়ল সে। হঠাৎ একদল ডাকাত এসে হাজির হল সেখানে। ছেলেটির পকেটে মানিকটি দেখতে পেয়ে তারা সেটিকে নিয়ে গেল এবং সেদিনের মত তাদের যাত্রা শেষ করল। ছেলেটি ঘুম থেকে উঠে দেখে তার মানিক নেই। উপায়ন্তর না দেখে ছেলেটি জঙ্গলের মধ্যে কিছুক্ষণ হাটাহাটি করল। হঠাৎ একটা আলোর শিখা দেখতে পেল কাছে গিয়ে দেখে এটি সেই ডাকাতের ঘর যে তার মানিকটি নিয়ে গিয়েছিল। ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে ছেলেটি দেখল তার মানিকসহ মোট সাতটি মানিক একত্র করে ডাকাতটি তার স্ত্রীকে বলছে এত দিন ছিল ছয়টি আজ একটি লোকের কাছে আরেকটি পেয়ে সাতটি পূরণ করলাম। এসব দেখে ছেলেটির ঐ সাতটি মানিকের প্রতি লোভ হল। সে একটা বুদ্ধি বের করল। ডাকাতদের ঘরের বাইরে মুরগীর খোয়ারে গিয়ে মুরগি নাড়াচাড়া দিতেই মুরগীগুলো ডেকে উঠল। চোর বুঝে ডাকাত ও তার স্ত্রী তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এল। এই সুযোগে ছেলেটি ঘরে গিয়ে মানিক সাতটি নিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দৌড়াতে থাকে। ঘরে ঢুকে ডাকাত যখন দেখল তার মানিক নেই তখন সেও বুদ্ধিটা বুঝতে পেরে ছেলেটির পিছু নেয়।

সারারাত দৌড়ে ছেলেটি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। খুব ভোর, এমন সময় এক ধোপাকে কাপড় কাচতে দেখে সে বলল, ধোপা ভাই, আপনিতো কাপড় কাচতে কাচতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন তাই আপনি একটু দূরে মানে ঐ বেঞ্চির নিচে গিয়ে বিশ্রাম নিন, আমি আপনার কাপড় কেঁচে দিচ্ছি। সরল বিশ্বাসী ধোপা ছেলেটির কথা অনুযায়ী কাজ করল। এ দিকে ডাকাতও দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে এসে পৌছল। ছেলেটিকে ধোপা মনে করে ডাকাতটি বলল "ভাই তুমি এদিকে কোন

লোককে আসতে দেখেছ।" তখন ছেলেটি দূরে বিশ্রামরত ধোপাকে দেখিয়ে বলল ঐ লোকটা এদিকে আসছিল তখন ডাকাত গিয়ে ধোপাকে মারতে শুরু করল। ধোপার কোন কথাই ডাকাত শুনল না। এদিকে ছেলেটি আবার পালিয়ে গেল। প্রায় আধাঘন্টার মত মারার পর ধোপা যখন মৃত প্রায় তখন ডাকাত ধোপার মুখে আসল ঘটনা শুনে হতবাক। ডাকাতটি আবার ধাওয়া করল ছেলেটিকে। এদিকে ছেলেটি প্রায় জঙ্গল অতিক্রম করে ফেলেছে। হঠাৎ ছেলেটি দেখতে পেল এক লোক ঘোড়ায় চড়ে বিদেশ থেকে অনেক টাকা-পয়সা স্বর্ণালংকার সহ অনেক কিছু নিয়ে আসছে। ছেলেটি আর লোভ সামলাতে পারলনা। জঙ্গল থেকে একটা শিয়ালের বাচ্চা ধরে, সাতটা মানিক চারিদিকে রেখে শিয়ালটির লেজ ধরে ঘুরাতে লাগল। বিদেশী লোকটি ছেলেটির কারবার দেখে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার তুমি শিয়ালটি ঘুরাচ্ছ কেন? এবং মানিক গুলো কোথায় পেলে? ছেলেটি বলল, এটি সাধারণ শিয়াল নয়, এটি যাদুর শিয়াল, এটাকে ঘুরালে প্রতি এক ঘন্টা পর পর একটা করে মানিক পড়ে। শুনে তো লোকটি অবাক। শিয়ালটি কেনার জন্য বায়না ধরল। ছেলেটি বলল, আচ্ছা আপনি তো অনেক পীড়াপীড়ি করছেন, তাহলে আপনার সাথে যা কিছু আছে সব আমাকে দিতে হবে। এমন কি আপনার ঘোড়াটাও। বিদেশী লোকটি ভাবল যদি এভাবে মানিক পাওয়া যায় তবে সারা জীবন বসে খেতে পারব। তাই সে ছেলেটির কথায় রাজি হল। এবার ছেলেটি ঘোড়ায় চড়ে দিল ছুট। বিদেশ ফেরত লোকটি প্রায় এক ঘন্টা ধরে শিয়ালটিকে ঘোরাতে লাগল। কিন্তু হীরা-মানিক তো দুরের কথা পড়তে লাগল পঁচা-গলা পায়খানা লোকটি ভীষণ হতাশ হয়ে গেল। এরই মধ্যে ডাকাত এসে হাজির। ডাকাত লোকটিকে জিজ্ঞেস করতেই সে সব ঘটনা খুলে বলে। ডাকাত বলল আরে বোকা তুমিও ঐ ছেলের ফাঁদে পড়লে। ছেলেটি ঘোড়ায় চড়ে যাওয়াতে ডাকাত তাকে আর ধরার চেষ্টা করল না। এদিকে ছেলেটি বাড়িতে এসে বাবাকে সাতটি মানিক ও অন্যান্য জিনিস দেখালে বাবা বলল আমি তো হতবাক হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু হ্যাঁ তুই দেখছি বড় হয়ে সত্যিই মস্ত বড় ডাকাত হতে পারবি।

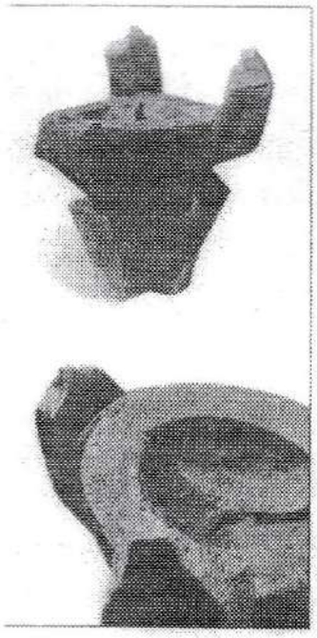

মিথ্যার পরিনাম

মোঃ শহীদুজ্জামান

শ্রেণী ঃ ৯ম, রোল নং ঃ ৭, বিভাগ ঃ বাণিজ্য

একদা এক বাবুর্চি আর এক মালিক ছিল। বাবুর্চির একটি বিশেষ গুণ ছিল বটে। আর সেটি হল তার হাতের রান্না। তার রান্না এতই সুস্বাদু ছিল যে আশেপাশের বাড়ির মহিলারা পর্যন্ত তার রান্নার সুগন্ধে রান্না ঘরে চলে আসত।

একদিন মালিকের জন্য বাবুর্চি একটি হাঁসের আস্ত রোস্ট তৈরি করল। রোস্টটি এতই সুস্বাদু হয়েছিল যে বাবুর্চি নিজের সেই রোস্ট খাবার জন্য লোভ করল। যে কথা সেই কাজ। লোভের চাপে পড়ে বাবুর্চি শেষ পর্যন্ত মালিকের জন্য রান্না করা হাঁসের রোস্টের একটি পা খেয়েই ফেলল। তারপর সে চাইল মালিককে বোকা বানাতে যেন মালিক বুঝতে না পারে এর পর যখন মালিক খাবার গ্রহনের জন্য খাবার টেবিলে বসল, সে লক্ষ্য করল রোস্টে হাঁসের এক ঠ্যাং নেই। এরপর মালিক টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল এবং রাগের স্বরে বাবুর্চিকে লক্ষ্য করে বলল—

মালিক ঃ কী ব্যাপার রোস্টে হাঁসের এক ঠ্যাং কই গেল?

বাবুর্চি ঃ আজ্ঞে, সাহেব এ হাঁসের একটি ঠ্যাংই ছিল।

আসলে মালিক ততটা বোকা ছিল না। বরং একটু চালাক প্রকৃতির লোকই ছিল বটে।

মালিক ঃ এক পায়ে হাঁস বলেতো কিছু নেই।

বাবুর্চি ঃ কিন্তু সাহেব হাঁসের যে এক ঠ্যাংই ছিল।

এ কথায় বাবুর্চিকে রেগে গিয়ে মালিক বলল—তোমাকে আমি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করব কিন্তু। ঠিক করে বল, কি হয়েছে। এই সময় বাবুর্চি দেখল বাইরে কতগুলো পোষা হাঁস এক পা লোমের ভিতর মুড়ি দিয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে বাবুর্চি মনে করল এখন আর সাহেব বোকা না হয়ে পারবে না। তখন বাবুর্চি মালিককে বলে উঠল।

বাবুর্চি ঃ সাহেব, সাহেব এই দেখুন বাইরে কতগুলো এক পেঁয়ে হাঁস দাড়িয়ে আছে। মালিক তখনও বোকা হল না। সে বাবুর্চিকে বলল, দেখ আমার দিকে। মালিক কিছুক্ষণ হাততালি দিয়ে শব্দ করল আর তৎক্ষণাৎ হাঁসগুলো ভয়ে মুড়িয়ে থাকা ঠ্যাংটা নামিয়েই দৌড়ে পালাল। এ দৃশ্য দেখেতো বাবুর্চির মাথায় হাত। এখন সে কি করে মালিককে বোকা বানাবে। তারপর বাবুর্চির মাথায় আরও একটি বুদ্ধি চাপল সে মনে করল এবার দেখি মালিক কিভাবে তার চালাকি ধরতে পারে। তখন বাবুর্চি মালিককে বলল—

বাবুর্চি ঃ সাহেব আসলে কি আমি নিজেই একটা ভুল করেছি।

মালিক ঃ ভুল! কি ভুল করেছ।

বাবুর্চি ঃ আমি যখন হাঁসটা জবাই করেছিলাম তখনতো হাঁসের এক ঠ্যাং ভিতরে ছিল তারমধ্যে আমি আবার আপনার মত হাততালি দেই নি তো তাই বুঝি পাটা আর বের হয় নাই। তাই এ হাঁসের এক ঠ্যাংই ছিল।

মালিক ঃ তুমি চুপ কর। আজ থেকে তোমার চাকরী নট। কারন তুমি মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছ।

শিক্ষা ঃ আসলে যদি মালিকের নিকট বাবুর্চি সত্য কথা বলত তাহলে তার চাকরি চলে যেত না। এক কথায়, সত্য সব সময় মুক্তি দেয় আর মিথ্যা অন্ধকারে ঠেলে দেয়।

ঘুরে এলাম চট্টগ্রাম

শেখ আশরাফ উদ্দিন

শ্রেণী ঃ ৮ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ০৫

২০০১ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে হঠাৎ করেই একদিন চট্টগ্রাম যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হল। চট্টগ্রাম যাব শুনে আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। অক্টোবর মাসের ছয় তারিখ। পূজার ছুটিতে স্কুল বন্ধ। আমি এবং আমাদের পরিবারের আটজন। সকাল দশটায় আমাদের মাইক্রোবাসে রওয়ানা দিলাম। কত পথ প্রান্তর নদী-নালা পেরিয়ে আমরা যখন চট্টগ্রাম পৌঁছলাম তখন বিকেল চারটা বাজে। আমরা একটি হোটেলে উঠলাম। হোটেলে আগে থেকেই রুম ভাড়া করা ছিল। সেদিন সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তাই সেদিন আর কোথাও যাওয়া হল না। পরদিন সকালে আমরা রাঙামাটির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পাহাড় কেটে কেটে তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তার দু'পাশে পাহাড় আর পাহাড়। মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর দুই-চারজন উপজাতি ছেলেমেয়ে দেখা যাচ্ছিল। পাহাড়ের উপর দু'চারটে কুঁরে ঘর ও দেখা যাচ্ছিল। যখন আমরা রাঙামাটি পৌছলাম তখন বেলা বারটা বাজে। আমরা দুপুরের খাওয়া সেরে দু'টার দিকে একটি ইঞ্জিন বোট ভাড়া করলাম। আমরা লেকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। লেকের দু'ধারে উচুঁ উচুঁ পাহাড়। লেকের বাতাস খুব ভাল লাগছিল। অনেক দূর যাওয়ার পর আমরা পাহাড়ের কোনে একটি ঝর্ণা দেখতে পেলাম। উচুঁ পাহাড়ের গা ঘেষে ঝর্ণার পানি পড়ছে। সত্যিই সে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। এরপর আরও কিছুক্ষণ ঘুরে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পরদিন আট তারিখ আমরা পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত এবং ফয়েজ লেকে বেড়াতে গেলাম পরের দিন সকাল দশটায় কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। যেতে যেতে রাস্তার দু'পাশে সারি সারি গাছ দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছিল।

আমরা যখন কক্সবাজার পৌঁছলাম তখন দুপুর একটা সেখানে গিয়ে হোটেল শৈবালে উঠলাম। তারপর খেয়ে ঘুরতে বের হলাম। প্রথমেই এলাম সাগর পাড়ের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখি মানুষের ভীড়। যখন সমুদ্রের নিকট দাঁড়ালাম মনে হল এই সেই স্বপ্নের সমুদ্র সৈকত। সাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে খুবই আনন্দ লাগছিল। আমার ছোট বোন রিতু পানিতে নেমে খুশিতে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছিল। তখন আমরা সবাই পানিতে নেমে গোসল করলাম। পানি থেকে উঠতে ইচ্ছা করছিল না। সেখানে আমরা অনেক ছবি তুললাম এবং সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সেই গোধূলিলগ্নের অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করলাম। এরপর হোটেলে এসে গোসল সেরে হোটেলের বারান্দার দাঁড়ালাম। আমাদের হোটেল ছিল সমুদ্রের খুব কাছে। সেখানে দাঁড়িয়েই আমরা সাগরের বিশাল ঢেউয়ের গর্জন শুনতে পেলাম। এক একটি ঢেউয়ের যে কি শব্দ। এরপর রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন দশ তারিখ আমাদের ফেরার পালা। সেখান থেকে আসতে ইচ্ছেই করছিল না ফিরে আসার সময় আমাদের মনে পড়ছিল গত চার দিনের প্রতিটি মুহূর্তের কথা। সত্যিই খুব আনন্দে ছিলাম। বাড়িতে ফেরার অনেক পর এখনও আমার মনে পড়ে চট্টগ্রামের সেই দিনগুলির কথা। পাহাড় পর্বত কক্সবাজারের বিশাল বেলাভূমি সাগরের ঢেউয়ের অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য এবং গোধূলি লগ্নের সেই সূর্যাস্তের দৃর্শ্য আজও আমার মনে দোলা দেয়।

দুইটি কুঁড়ি ও একটি পাতার দেশ

রিয়াদ -বিন-শহীদ

শ্রেণী ঃ ৮ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৩৯

আমি একবার আমার মা-বাবার সাথে সিলেটে আমার খালার বাসায় গিয়েছিলাম। আমরা রাত দশটার সময় উপবন ট্রেনযোগে সিলেটের দিকে রওনা হই। প্রায় রাত দুইটা পর্যন্ত সবার সাথে গল্প করেছিলাম। তারপর একটু তন্দ্রায় পরেছিলাম। ভোর রাতের দিকে উঠে ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে মনে মনে বলতে লাগলাম আর কতদূর সিলেট রেল স্টেশন। অবশেষে সকাল ছয়টার দিকে আমরা সিলেট গিয়ে পৌঁছালাম। তারপর আমরা একটি ট্যাক্সিক্যাব ভাড়া করে সিলেটের চৌকিদেখিতে অবস্থিত আমার খালার বাসায় গেলাম। আমার খালা ও খালু আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন। তারপর আমরা হাত মুখ ধুয়ে সবাই একসাথে নাস্তা করলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর আমরা লাক্কাতুরা চা-বাগানে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেল। অনেক পুরুষ ও মহিলারা পিঠে ঝুড়ি নিয়ে চাপাতা সংগ্রহ করছিল। আমরা এই চাপাতা সংগ্রহের অপূর্ব দৃশ দেখলাম। তারপর বাগান দেখা শেষ করে আমরা চা উৎপাদন কেন্দ্রে গেলাম। সেখানে গিয়ে চা পাতা থেকে চা উৎপাদনের নানা পদ্ধতি দেখলাম। প্রথমে চাপাতা সংগ্রহের পর তা একটা চৌবাচ্চায় সিদ্ধ করা হয়। তারপর ঐ চাপাতা একটি ছাকনির মাধ্যমে ছাঁকা হয়। এভাবে নানা কৌশলের মাধ্যমে চাপাতা থেকে চা উৎপাদন করা হয়। এ সব কিছু দেখে সবাই আবার দুপুর আড়াইটার দিকে বাসায় ফিরে এসে গোসল করে খাবার খেতে বসে গেলাম। সেদিন ছিল পবিত্র শবে-বরাতের রাত। তাই রাতে আর কোন জায়গায় বেড়াতে যাইনি। সন্ধ্যার সময় মাগরিবের নামায পড়ে হালকা নাস্তা খাওয়ার পর আব্বা আর খালুর সাথে মসজিদে গেলাম। তারপর ইমাম সাহেবের কথা শুনলাম এবং নামায আদায় করলাম। তারপর রাত দশটার দিকে বাসায় ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে উঠে ফযরের নামায পড়ে নাস্তা খেয়ে জাফলং যাবার জন্য তৈরি হলাম। সকাল সাতটার দিকে আমরা একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করে জাফলং এর দিকে রওনা হলাম। পথের দুইপাশে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। যেন সবুজের সমারোহ। প্রায় দুই ঘন্টা পর আমরা জাফলং গিয়ে পৌঁছলাম। তারপর আমরা একটি স্পিরিট বোট ভাড়া করে জিরোপয়েন্টে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম শত শত লোক নৌকায় করে নদী থেকে পাথর তুলছে। এই দৃশ্য খুবই মনোরম। সেখানের নদীর পানি এতই স্বচ্ছ যে নদীর তলদেশের বালি পর্যন্ত দেখা যায়। সেখানকার পাহাড়ের দৃশ্যও খুব সুন্দর পাহাড়ের উপর হাজার হাজার কমলা গাছ। এসব কিছু দেখে আমরা নদীতে গোসল করলাম। গোসল শেষে আমরা দুপুর দুইটার দিকে কাছের হোটেল থেকে মোটা চালের ভাত, ঝাল গরুর মাংস ও ডাল কিনে খেলাম। তারপর খাওয়া শেষে বাসার দিকে রওনা হলাম। বাসায় এসে চা-নাস্তা খেয়ে সবাই গল্পে মেতে উঠলাম। তারপর রাতের খাবার খেলাম।

পরদিন সকালে আমরা শাহ্ জালাল (রঃ) মাজারে গেলাম। সেখানে গিয়ে মাজার জেয়ারত করলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম একটি পুকুরে বিশাল বড় বড় গজার মাছ এবং হাজার হাজার জালালী কবুতর। আমরা মাছগুলোকে চিংড়ি মাছ খাওয়ালাম। তারপর আমরা সেখান থেকে হযরত শাহ্ পরান (রঃ) এর মাজারে গিয়ে মাজার জেয়ারত করে জোহরের নামায পড়লাম। তারপর আশে পাশে কিছুক্ষণ ঘুরে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে বাসায় ফিরে এলাম। পরের দিন সকাল সাতটায় আমরা জয়ন্তীকা ট্রেন যোগে ঢাকার দিকে রওনা হলাম। দুপুর তিনটার সময় আমরা ঢাকা এসে পৌঁছালাম। এই ভ্রমণটি ছিল আমার জন্য খুবই আনন্দদায়ক।

আমাদের প্রত্যেকেরই মাঝে মাঝে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য এবং আনন্দ লাভের জন্য ভ্রমণ করা প্রয়োজন।

অভি

মোঃ অলিভ্র হাসান

শ্রেণী ঃ ৮ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৩৪

আমার প্রিয় বন্ধু অভি। আমরা জীবনের অধিকাংশ সময়ই এক সাথে কাটিয়েছি। এক সাথে লেখাপড়া করেছি, খেলাধূলা করেছি। আমরা যখন হোস্টেলে পড়ি তখন তেমন একটা ঘুরে আসা হয়নি। তাই অনেকদিন ধরে বাসনা ছিল যে, কোথাও গিয়ে একটু মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়ানো।

আমাদের পরীক্ষা শেষ হল। সুতরাং বেড়াতে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করতে পারলাম না। আমি ভাবলাম যে সিলেটে চা বাগান দেখতে যাব। কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধু অভি সে আমাকে নিয়ে তার মামা বাড়ি বেড়াতে যাবে। অবশ্য সে অনেকদিন যাবৎ তার মামা বাড়ি যায় না। তাই আমি তার অনুরোধটুকু উপক্ষো করতে পারলাম না। তার মামা বাড়ি গোয়ালন্দ। বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সেই নিশংস পদ্মা-নদী। আমি ভাবলাম নদীতে সাঁতার কাটব, মাছ ধরব, নৌকা দিয়ে ঘুরব। অনন্ত দূর আকাশে নদীর সীমানায় সূর্যাস্ত দেখব। এটাতো আমার অনেকদিনের কল্পনা ছিল। আর আজ এই কল্পনা সত্যই হবে তা ভেবে আমি অভির চেয়েও বেশি খুশি হলাম। আমি আর অভি দুজনে মিলে বাড়ি গেলাম। অভিও আমি বাবাকে বলে রাজি করালাম। মা বললেন যে, এতদূর তোমরা একা একা যেতে পারবে না। কিন্তু আমি আর অভি ছিলাম নাছোরবান্দা, তাই মা আর কিছু বললেন না। আমি ও অভি পরেরদিন সকালে একসাথে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি সকাল ৯:৩০ মিনিটে ছাড়ল আমরা মাত্র এক ঘন্টার মধ্যেই পদ্মার পাড়ে এসে নামলাম। নেমেই দেখি প্রলংঙ্করী ভংঙ্কর পদ্মা। শুনেছি এই পদ্মা মানুষকে নিঃস্ব করেছে, করেছে আশ্রয়হীন। কিন্তু এটা আমি মোটেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যা হোক আমরা এম. বি-৫ নামে একটি লঞ্চে উঠে রওয়ানা হলাম। কিন্তু আকাশটা কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। অবশ্য তাতে আমাদের মনে কোন ভয় ছিল না। কিন্তু দেখছি অনেক মানুষ ভয় পাচ্ছে। কারণ লঞ্চটা যতই দূরে যাচ্ছে আকাশটা ততই মেঘাচ্ছন্ন হচ্ছে। এখন আমার এবং অভিরও একটু ভয় লাগছে। চারিদিকে দেখছি শুধু কান্নাকাটি। এক সময় শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়। আমি, অভির হাতটা চেপে ধরলাম। এক সময় দেখি লঞ্চটা ডুবে যাচ্ছে। আমি বললাম অভি, এর পরে আর কি হয়েছে আমি আর কিছুই জানি না।

জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমি একটা ছোট্ট চড়ে পড়ে আছি। আমার মত অনেকেই সেই চরে পড়ে আছে, আমি উঠে দাঁড়ালাম। আস্তে আস্তে আমার সব মনে পড়তে লাগল। আমি ভাবলাম অভি কিন্তু এখানে যে সব অচেনা মানুষ। কিন্তু অভি যে প্রলংঙ্করী পদ্মার মাঝে হারিয়ে গেছে এটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি আজও ভাবি আমার সঙ্গে অভির দেখা হবে। হয়ত কোন গোধূলী লগ্নে একাকি নিরবে বসে কোন গাছের চারায় পানি ঢালার সময়। গাছের চারপাশে জোনাকি পোকার মৃদু আলোর অন্ধকারে কোন কল্পনার ছায়ায় আমি তাকে দেখব। কারণ আমার বন্ধু অভিই যে আমার জীবনে প্রথম মৃত্যুর শ্বাদ।

কক্সবাজার ভ্রমণ

মোঃ আশরাফুল হক

শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ২৪

ডিসেম্বর মাস তাই পরিক্ষাও শেষ হয়েছে তাই বসে বসে সময় কাটাতে ভাল লাগছিল না। তাই আমার ইচ্ছে ছিল কোথাও গিয়ে ঘুরে আসি। আব্বা রাত বাসায় ফেরার পর বলল আমরা এই মাসে কক্সবাজার যাব। তখন আমি এই কথা শুনে খুশিতে নেচে উঠলাম। এই আনন্দের কথা শুনে আমার ঘুম আসলনা। যাবার দিন তারিখ ডিসেম্বর মাসেই ঠিক করা ছিল। দিনটি ছিল ২৩ ডিসেম্বর। দেখতে দেখতে শুভ দিনটি এসে গেল। আমারও খুব ভাল লাগছিল। অনেক আগেই আব্বা যাবার জন্য টিকেট করে রেখে দিল। আমরা যাবার জন্য ছয়জন ছিলাম। আমি, আমার বোন, বাবা, মা, খালা মামা। খালামনি সকালেই আমাদের বাসায় এসেছেন। আমরা সবকিছু দুপুরে ঠিক করে রেখেছি। আমাদের যাবার সময় ছিল রাত্রে। সন্ধ্যে আমরা হালকা গোছগাছ করে নিলাম। পরে হালকা কিছু খেয়ে নিলাম। যাবার আগে আমরা সঙ্গে করে কিছু খাবার নিয়ে নিয়েছি। রাত্রি ১০ টায় শুরু হল আমাদের যাত্রা। আমাদের বাসা থেকে রিক্সা নিয়ে গেলাম কাঠের পুলে। সেখানে আমাদের বাস অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকে আমরা বাসে ওঠলাম। আমাদের বাস ছাড়ে রাত্রি সাড়ে দশটায়। আমরা যে যার জায়গা নিয়ে বসে পড়লাম। বাস ছাড়ল, যেতে যেতে অনেক রাত হল। বাস রাত্রি চারটা বাজে কুমিল্লায় এক নূরজাহান হোটেলের সামনে থামল।। সেই হোটেলটা ছিল খুবই নামীদামী। শীতের রাত্রে বের হতে ইচ্ছে ছিলনা তবুও বের হলাম। চারদিকে কুয়াশা সাড়ে চারটার দিকে আমরা আবার বাসে ওঠলাম। আবার বাস ছাড়ল। বাসের ঝুলুনিতে আমার ঘুম পাচ্ছিল আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বাসে ভোর ৬টায় জাগি। দেখি সবাই জেগে আছে। কেউ কেউ কথা বলছে। ভোড়বেলায় কি কুয়াশা শুধু সাদা কুয়াশা। কুয়াশার কারনে কিছু দেখতে পারছিলাম না। পাহাড়ী গ্রামঞ্চল তো তাই বেশী কুয়াশা পড়ছিল। একটু পরে সূর্য ওঠল, চারদিক রোদে ভরে গেল। কুয়াশা কেটে গেল। তারপরই কি অপূর্ব দৃশ্য আমি অবাক হয়ে গেলাম। চারপাশে উঁচু পাহাড় গাছপালা আর হালকা বনজঙ্গল দেখতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। তার ওপর আবার ঘরবাড়ি। আরও দেখলাম লাল মাটির পাহাড়। আমরা দেখতে দেখতে কিছুক্ষনের মধ্যে পৌছে গেলাম আমাদের স্থানে। আমরা বাস থেকে নেমে গেলাম। আমাদের হোটেলটাও ছিল খুব সুন্দর, গোছগাছ ছিল রুমগুলো। অনেক বড় বাড়ান্দা ছিল সেখানে। সেখানে খুব সুন্দর ফুলের বাগানও ছিল। আমি আব্বাকে বললাম আমরা সাগর দেখতে যাব। তখন মামা আমাদের দুইভাই-বোনকে নিয়ে গেলেন সাগর পাড়ে। আমি সাগর দেখেতো অবাক হয়ে গেলাম। তখন আমার মনে হল আমি কি বাস্তব দেখছি না স্বপ্ন দেখছি। কি অপরূপ সুন্দর সাগর দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। শীতের দিন এই সাগরের ঢেউ ছিল শান্ত। কিছুক্ষণ পরে আমরা আমাদের হোটেলে ফিরে গেলাম। আমরা খাওয়া দাওয়া করে সোজা সাগর পাড়ে রওনা দিলাম। সাগরের পানিতে যখন আমি পা রাখলাম আমার পা চমকে উঠল। আস্তে আস্তে সাগরের আরও

সামনে গেলাম ঢেউ এসে আমাকে ভিজিয়ে দিল। তারপর সেখানে কি আনন্দ। আব্বা-মা খালা,বোন তারা আধ ঘন্টা ভিজে চলে গেল। আমি আর মামা প্রায় দুঘন্টার মত ভিজলাম। তাছাড়া সাগর পাড়েও ঘুরলাম। আমরা ফিরে এলাম আমাদের স্থানে। গোছল করে ফ্রেশ হলাম। দুপুরের খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিলাম কিছুক্ষন। বিকেলে আমরা ঘুরতে বের হলাম মার্কেট দেখলাম কি সুন্দর জিনিস অবশ্য দামও অনেক। সন্ধ্যে আবার হোটেলে ফিরে গেলাম। সকালে তাড়াতাড়ি ওঠলাম কিন্তু শীতের জন্য বের হলাম না। সূর্য ওঠার পর আমরা বের হলাম। আমাদের সকালের নাস্তা এক হোটেলে সেড়ে নিলাম। সেখানে গিয়ে আমরা অনেক ছবি তুললাম ঝাউ বনে, ঝাউ বনও ছিল খুব সুন্দর। তারপর আমরা হোটেলে গিয়ে আবার সাগর পাড়ে গেলাম ভিজতে। সাগর পাড় থেকে আবার হোটেলের ফিরে গেলাম। গোসল করে দুপুরে কিছুক্ষন বিশ্রাম নিলাম। এরপর বিকেলে অন্যান্য জায়গা যেমন ঃ আবহাওয়া কেন্দ্র, সেখানকার অফিস, বোদ্ধদের মঠ ইত্যাদি। সেখনে আমাদের ছবিও আছে। আমরা এত ওপরে ওঠে গিয়েছে যে টের পাইনি। সেটা ছিল পাহাড়ের মত উঁচু। সেখানেই আবহাওয়ার কেন্দ্র অফিস ছিল। সেখান থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি আমরা প্রায় মাঝামাঝি উঁচুতে আছি। নিচে আরোও দেখলাম লম্বা লম্বা বড় বড় ঘর আমরা সেখান থেকে রিক্সায় সাগর পাড়ের সামুকের দোকানে যাই। সেখান থেকে ফিরে যাই হোটেলে। রাতের খাবর খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হল। এরপর শামুকের দোকানে গিয়ে বেটে খাট সুন্দর শামুকগুলোও কিনেছিলাম। ফিরে যাবার দিন সকালে আমরা নিস্তব্দ সাগর আবার একবার দেখে গেলাম। আমরা চলে যাব বলে সাগরের ঢেউয়ের নিস্তব্ধতার মত আমাদের মনও নিস্তব্ধ ছিল। এরপর আমরা সবাই বাসে ওঠলাম। রাত সাড়ে দশটায় বাস ঢাকা থামল। এই কক্সবাজার ভ্রমন আমার চিরকাল মনে গেঁথে থাকবে।

হামযা ও রুস্তম

মোঃ জাহিদুল ইসলাম

শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ক, রোল নং ঃ ১

একদা এক সময় দুই বন্ধু কামাল ও জামাল ছিল। একদিন এক লঞ্চ দুর্ঘটনায় লঞ্চ ডুবে যায়। এবং কয়েক শতাধিক লোক নিহত হয়। অনেকেই সেখানে নিহত মানুষদের দেখতে যায়। সবাই যখন দেখতে গিয়েছে তাই কামাল ও মনস্থির করলো যে সে দেখতে যাবে। এখন সরকার লঞ্চটি উদ্ধারের জন্য বি.আই.ডব্লিউটিএ এর হামযা ও রুস্তমকে খবর দেয়। যথা সময়ে হামযা ও রুস্তম লঞ্চ ডুবি স্থানে পৌছে। তখন হামযা ও রুস্তমের উদ্ধার কাজ শুরু করে দেয়। এমন সময় এখানে আসে কামাল। রুস্তম ও হামযা একটা লঞ্চকে পানি থেকে টেনে তুলছে, এটা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে কামাল। তখন সে উদ্ধারকাজ দেখে বাসায় ফেরে। বাসায় এসে সে জামালকে বলে দোস্ত জান আমি কি দেখেছি? হামযা ও রুস্তম মিলে একটা লঞ্চের কলার ধরে পানি থেকে টেনে তুলছে। তখন জামাল অবাক হয়ে বলল,- "দোস্ত, আমাকে কি আগামী কাল হামযা ও রুস্তমকে দেখাতে নিয়ে যাবে?" কামাল বলল, ঠিক আছে। পরের দিন লঞ্চ যে স্থানে ডুবেছিল কামাল জামালকে সে স্থানে নিয়ে যায়। তখন জামাল বলল, আমি তো কোন কিছুই দেখছি না; আমাকে সামনে নিয়ে চল। তারপর কামাল জামালকে সামনে নিয়ে দেখাল এটা হামযা ও ওটা রুস্তম। তখন জামাল বলে কোথায়? এখানে তো কোন মানুষ দেখছি না। তখন কামাল আবার বলল, এটা তো হামযা আর ওটা রুস্তম অর্থাৎ ডুবন্ত লঞ্চ উদ্ধারের যন্ত্র। তখন জামাল বলল, আগে বলবি না আমি মনে করেছি মানুষ। কামাল বলল-"মানুষ কি এত শক্তিশালী হয়?"

কোটবাড়ির স্মৃতি

মোঃ ইমরান হোসেন চৌধুরী

শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ২

এখন আমি যে ভ্রমণ কাহিনীটি উল্লেখ করছি সেটা আমার নিজ জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ডিসেম্বরে আমি বাংলাদেশের একটি পুরাকীর্তি সম্পন্ন ঐতিহাসিক স্থান কুমিল্লার কোটবাড়ি'র উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করি। বাসে উঠার পর বাস তার নিজ গন্তব্যের দিকে ছুটে যায়। বাসের জানালা দিয়েই আমি বাইরের দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বাস তার গন্তব্যে পৌছেঁ যায়। আমি বাস থেকে নেমে রিক্সা খুঁজি। কেননা সেই সময় আমার গন্তব্য ছিল কোটবাড়ির শালবন, বিহার, ময়নামতি ও পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো। বেশ বেলা থাকতেই রিক্সায় উঠে বসলাম।

পৌছে যাই কোটবাড়ি। মনের মাঝে এক অন্য রকম অনুভূতি কাজ করছিল তবে ভয় ভয় লাগছিল না যে তা নয়। কারণ আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একা। যদিও আশে পাশে লোকজন ছিল তবুও আমার পরিচিত কেউই ছিল না সেখানে। যাইহোক রিক্সা ভাড়া চুকিয়ে ঢুকে পড়ি শালবন বিহারে। আমি যখন যাই সেই সময়টা ছিল সম্ভবত শীতের মাঝামাঝি ফলে প্রচুর দর্শনার্থীর ভীড় ছিল। শালবন বিহারের পুরাকীর্তি দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারি না। আরও মুগ্ধ হই যখন জানতে পারি এ পুরাকীর্তি আজ থেকে তিনশত বছরের পুরনো (সম্ভবত।) কোটবাড়ির আর যা যা আমার মুগ্ধ করেছে তা হল ময়নামতি যাদুঘরের অন্যান্য ও অতুলনীয় সব পুরাকীর্তি যার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া বেমানান। এ ছাড়া মানুষের কর্মব্যবস্থা, কর্মব্যস্ততা, বিচিত্র পেশা আর পাহাড়। এত মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি তাকিয়ে ছিলাম-পাহাড়ের দিকে যার রূপের বর্ণনা কলমের কালিতে দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যেন নিজ অস্তিত্বকে পাহাড়ের রূপের সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সময় আপন গতিতে চলে আমারও সময় শেষ হয়ে আসছিল এক বুক মুগ্ধতা নিয়ে ফিরে চললাম বাসের দিকে। বাস ছুটে যায় আমাকে নিয়ে পেছনে পড়ে রয় কোটবাড়ি আর কোটবাড়ির স্মৃতি।

আমার মা

মোঃ রাকিব সরকার

শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৬২

মা নাম নেয়ার সাথে সাথে মনের সব দুঃখ, অতৃপ্তি শান্ত হয়ে যায়। মাকে যেন এক পলক না দেখতে পেলে আমার বুকের প্রতিটি স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। মা আমাদের দশ মাস দশ দিন ধরে খুব কষ্ট করে গর্ভধারণ করেছে। মা'র জন্য আমি এই সুন্দর সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা পৃথিবীকে ক্ষুদ্র হয়ে ও অবলোকন করছি। মা আমাদের ছোটকাল থেকেই খুব আদর স্নেহ করে লালন পালন করে থাকে। মা আমাদের যে ভাষা যে ব্যবহার, আচার-আচারণ ইত্যাদি শিক্ষা দান করে থাকেন তাই পরবর্তী জীবনে আমাদের আদর্শবান করে গড়ে তোলায় সাহায্য করে।

মাকে আমি পৃথিবীর যে কোন সৃষ্টির চেয়ে ভালবাসি। মাকে ভালবাসতেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষিরা। পৃথিবীর অলি আউলিয়ারাও। পৃথিবীর যে কোন বিবেকবান লোক তার নিজের প্রাণের চেয়ে ও মাকে ভালবাসতেন। আমার মা আমার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা। মা আমাকে সর্বদা হৃদয়ের গহীনের সাথে রেখেছে। আমার জন্মদিনের সর্ব প্রথম মনে করিয়ে দেয় আমার মা। আমি যখন অসুস্থ হয়ে পরেছিলাম তখন মা আমার বিছানার পাশে সারা রাত নিঘুম ভাবে কাটিয়ে দিয়েছেন। যখন আমি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করি তখন তার মুখে বসন্তের কোকিলের মত হাসি ফোঁটে উঠে। আমার মা ছিলেন খুবই সচেতন। আমার প্রতিটি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মাকে অনুভব করি। আমার মার মনের দিকে লক্ষ্য করলে পাথর ও গলে যেতে দ্বিধাবোধ করবে না।

আমার দেখা সুন্দরবন

মোঃ আব্দুল ইলা

শ্রেণী ঃ ৫ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১২

ভ্রমণ একটি আনন্দ উৎসব। নানা কর্মব্যস্ততার এক ঘেয়েমিতে মানুষ যখন হাফিয়ে পড়ে তখনই তারা চিত্ত বিনোদন তথা আনন্দ উৎস খোঁজে। আমি একটি আনন্দ উৎস তথা ভ্রমণের কাহিনী খুঁজে পেয়েছি। আনন্দ মানুষকে কর্ম চঞ্চল করে তোলে। যখন মানুষ কোন স্থানে ভ্রমণের সুযোগ পায়; তখন যে খুব দ্রুত সে স্থানে ভ্রমণে যায় তার জীবনের কর্মের একঘেয়েমিতা দূর করবার জন্য। আমার জীবনেও একটি মজাদার ভ্রমণের কাহিনী রয়েছে। আমরা একদিন পরিবারের সকলে ঠিক করেছিলাম নদী তীরে ভ্রমণে বেরুব। দিনটি ও ছিল ছুটির দিন তথা শুক্রবার। আমার মা-বাবা, কাকা এবং আমরা তিন ভাই-বোন ভ্রমণে বেরুব বলে ঠিক করেছিলাম। শুক্রবার দিন বিকেলে আমরা সকলেই ভ্রমণে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু এ ছুটির দিনেও কাকা একটা জরুরী কাজে আটকে গিয়েছে। তবুও তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু সময় ও ঘড়ির কাটার টিকটিক ছন্দের সাথে এগিয়ে চলল। আমরা আর দেরী না করে বেরিয়ে পড়লাম। সৌভাগ্যবশত কাকার সাথে চলতি পথে আমাদের দেখা হয়ে গেল। আমরাও তাকে সাথে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে রিক্শা করে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছলাম। বাসে করে আমরা সোজা খুলনা পৌঁছলাম। খুলনা থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে পেরিয়ে এক স্পিডবোটে করে সুন্দরবনে পৌঁছলাম। স্পিডবোটে থাকাকালীন সময়ে আমরা চারিদিকের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করলাম। বিচিত্র রঙের পাখি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে ডানা মেলে স্বাধীনভাবে; জেলেরা মাছ ধরছিল। সব মিলিয়ে এক মনোমুগ্ধকর চিত্র চিত্রিত হয়েছে। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তবে একটা জিনিস খারাপ অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখ লাগল যে, আমাদের স্পিডবোটের ঢেউয়ের তাড়নায় একটা ডিঙ্গি নৌকা ডুবতে বসেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে তা ডুবে নি।

আমরা সুন্দরবনের অভ্যন্তরে পৌঁছলাম। ঝাঁক ঝাঁক হরিণ দেখে মুগ্ধ হলাম। কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখার সৌভাগ্য আমাদের হলো না। আরো নানা প্রজাতির গাছ ও প্রাণী দেখলাম। আমরা দুপুর ২টার দিকে কিছু জলখাবার খেয়ে নিলাম। সুন্দরবনের মৌয়ালিরা মধু সংগ্রহ করছে এ দৃশ্য ও দেখলাম। আমরা রবিবারে ১২টার দিকে বাড়ী ফিরে এলাম।

ভ্রমণ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষ তার কর্মব্যস্ততার মাঝে ভ্রমণের মাধ্যমে তার জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তোলে। ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষামূলক বস্তু বা সাধারণ জ্ঞান লাভ করা যায়।

দুখী ছেলে

মোঃ জহিরুল ইসলাম

শ্রেণী ঃ ৬ষ্ঠ, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১

একটি ছেলের নাম জুয়েল। দশম শ্রেণীতে পড়ে। প্রথম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সে প্রতিবারই প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয়নি। সে পড়ালেখায় খুব ভাল ছিল দেখে তার মনে খুব অহংকার ছিল। সে প্রায়ই ছাত্রদেরকে বলত, আমার মত এত নম্বর তুলে প্রথম হতে পারবি? সেজন্য ছাত্ররা তার কথা শুনে খুব মন খারাপ করত। সে, স্যার পড়া ধরবে না তাও সে স্যারকে বলত, স্যার এটা পড়া। সে জন্য তাকে অনেক স্যারই বিনা পয়সায় পড়াত কারণ সে ভাল ছাত্র।

এমন করে অনেকদিন কেটে গেল, সে সুখে শান্তিতে জীবন ধারন করতে লাগল। হঠাৎ একদিন সে বন্ধুদের সাথে খেলছে দৌড়াদৌড়ি করে। কে যেন পিছন থেকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে। সে সুপারম্যান এর মত উড়ে মাটিতে পড়ল। তারপর তার দাঁত ভেঙ্গে গেল এবং সারা মুখ তার রক্তে ভরে গেল। কারণ সে যেদিকে পড়েছিল সেখানে ছিল বিরাট বড় ইট। তারপর সে একা কলপাড়ে কুলি করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধুরা জুয়েলকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু তারা পায় না। অবশেষে তারা কলপাড়ে তাকে পেল এবং বলল জুয়েল খেলবি না, আয় মাঠে আয়, কিন্তু জুয়েল একটা কথাও বলেনা। তারপর তারা জানলো জুয়েলের দাঁত ভেঙ্গেছে। তার পরদিন বন্ধুরা তাকে রাগাতে লাগল, দাঁত ভাঙ্গা বুড়া, দাঁত ভাঙ্গা বুড়া, আর সে কোন কিছু বলতে গেলে তাকে বলতে, ঐ তোর দাঁত ভাঙ্গছে আর কথা বলিস তোর লজ্জা করে না। বুড়া। এমন করে তাঁকে একএকজন বন্ধু এক একভাবে উপহাস করতে লাগল এমন কি তাঁর একটি বন্ধু খুব মোটা নাম তার অনিক জুয়েলের দাঁতের কথা শুনে তাকে বলল, জুয়েল তোর দাঁত দেখি দেখাস না কেন? কথাও বলিস না। ব্যাপার কি যখন সে দেখাচ্ছে না তখন অনিক তার পেটের মধ্যে ঘুঁষি মারল এবং জুয়েল আউ আউ করল এবং তার দাঁত ভাঙ্গা দেখে অনিক আরও উপহাস করতে লাগল, জুয়েল আগে কথা বলত জোরে কিন্তু এখন বলে আস্তে। পড়া বলত আগে আর এখন পড়া বলতে চায় না, বসত প্রথম বেঞ্চে এখন বসে লাস্ট বেঞ্চের কিনারায়। এই দাঁত ভাঙ্গা নিয়ে সে অনেক দুঃখ করে এমনকি দিনে রাতে কাঁদে। আত্মীয়ের সাথে ভালভাবে কথা বলে না। এর পর পড়াশুনায় কিছুটা অবনতি হলেও পরে আবার সে পড়ালেখায় মনেযোগ দেয়, ফলে S. S. C Examination—এ A+ অধিকারী হয়েছে। কারন সময় মাত্রই পরিবর্তনশীল। তাই সে এ দুঃখ কষ্ট বাদ দিয়ে এখন পড়ালেখায় আরো ভাল করে মনোযোগ দিয়েছে কারন সে দাঁতের ডাক্তার হতে চায়।

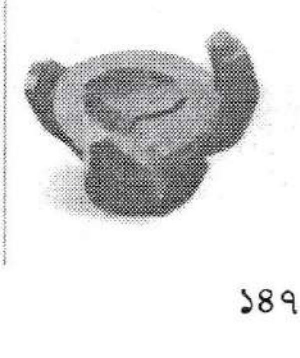

জাহাজ ভ্রমণ

শেখ মোঃ জামশেদুজ্জামান (অনি)

শ্রেণী ঃ ৫ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৪২

জাহাজ ভ্রমণের কথা শুনলে সবারই মন আনন্দে নেচে উঠে। ঠিক তেমনই একদিন আমার জাহাজ ভ্রমণের সুযোগ এসে গেল। আমি এবং আমার পরিবারের সবাই জাহাজে করে আমাদের গ্রামের বাড়ী খুলনায় গিয়েছিলাম। সেদিন সত্যিই সত্যিই আমি জাহাজ ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করেছিলাম।

প্রথমেই আমার বড় ভাইয়া জাহাজের কেবিন ভাড়া করে আসে। আমাদের ভ্রমণের তারিখ ছিল ১৩ই নবেম্বর, ২০০১ইং। আমি আমার মা-বাবার সাথে গিয়েছিলাম। আমাদের সাথে আমার বড় ভাইয়া, মেঝ ভাইয়া, আমার মেঝ ভাইয়ার বন্ধু এবং আমাদের এক খালাত ভাই গিয়েছিল। যাত্রার দিন আমরা আমাদের বাসা থেকে বিকেল ৫টার দিকে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালের উদ্দেশ্যে রওনা হই। প্রথমে আমরা রিক্সাযোগে সদরঘাট গেলাম এরপর টার্মিনালের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করে জাহাজে আমাদের ভাড়া করা কেবিনে উঠি। আমাদের জাহাজটির নাম ছিল অষ্ট্রিচ। জাহাজটি ছিল অন্যতম বৃহৎ জাহাজ। জাহাজে উঠে প্রথমেই আমি পুরো জাহাজটি ঘুরে দেখলাম।

সন্ধ্যা ছয়টার দিকে আমাদের জাহাজ ঘাট ছেড়ে তার যাত্রা শুরু করে। এটি ছিল আমার জীবনের প্রথম নৌ-ভ্রমন। যখন জাহাজ ছেড়ে তার যাত্রা শুরু করল আমি এবং মেঝ ভাইয়া জাহাজের সম্মুখ দিকে চলে গেলাম। তখন সন্ধ্যের ঠাণ্ডা শীতল বাতাস আমাদের হাঁড়ে কাঁপন জাগিয়ে তোলে। এরপর আমি কেবিনে চলে আসি। আমি এত বেশি আনন্দিত ছিলাম যে, আমি বার বার কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে নদী দেখতে লাগলাম। নদীর তীরের দৃশ্য দেখে আমার মনে একটি গানের সুর বাজছিল—

"নদীর কুল নাই-কিনার নাইরে"।

আমরা সেদিন জাহাজ ভ্রমণে গিয়েছিলাম সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত। নদী তীরে চাঁদের সেই ঝলমলে আলো খুব সুন্দর লাগছিল। চাঁদের আলোতে নদীর মাঝে ছোট ছোট মাছ ধরার নৌকা দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল তারপর কিছুক্ষণ পরে আমি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। সকাল বেলা উঠেই দেখি আমাদের জাহাজ বরিশাল ঘাটে ভিড়ে আছে। এরপর ছয়টায় বরিশাল ঘাট ছেড়ে চলে আসে। তার প্রায় দুই ঘন্টা পরে হঠাৎ করে আমাদের জাহাজটি একটি ছোট নদীতে ঢুকে যায়। মেঝ ভাইয়ার কাছে জানতে পারলাম এর নাম গাবখান চ্যানেল। তখন আমি একদম জাহাজের সামনে চলে গেলাম। আর নদীর দুই তীরের মনোরম দৃশ্য গুলো দেখতে লাগলাম। নদীর দুই ধারে গাছ যেন নদীর পানি ছুয়ে গেছে। সেদিন সকালবেলার সূর্য ওঠার দৃশ্যটাও আমার খুব ভাল লাগছিল। যখন সূর্য উঠছিল তখন মনে হয়েছিল সূর্যটি যেন নদীর মাঝ থেকে আকাশে উঠে গেছে। এরপর আমার ক্ষিধে পেতেই আমি কেবিনে ফিরে গেলাম। সকাল নয়টা বাজে আমাদের খাবার দেয়া হয়েছিল। আমাদের সকালের নাস্তার মধ্যে ছিল রুটি, মাংস এবং ভাজি। দুপুর বেলা খেয়েছিলাম ভাত, মাছ, মাংস ও ডাল। এরপর আমাদের জাহাজ বিভিন্ন নদী নালা পেরিয়ে রাত আটটার দিকে খুলনা বন্দরে পৌছায়। আমরা জাহাজ থেকে নেমে আমাদের বাড়ি চলে যাই। পরিশেষে আমি বলব যে, জাহাজ ভ্রমণে আমি এতই আনন্দ পেয়েছিলাম যা আর কোন দিনও পাইনি। জাহাজে চড়ার প্রতিটি সময় আমার খুব ভাল লেগেছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমার মন আনন্দে ভরে ছিল। আরও বেশি ভাল লেগেছিল নদী তীরের মনোরম দৃশ্যগুলো দেখে আমার সৃষ্টিকর্তার কথা মনে পড়েছিল এবং আমি গেয়ে উঠে ছিলাম—

"তোমার সৃষ্টি জগৎ যদি হয় এত সুন্দর না জানি তা হলে তুমি কত সুন্দর"। জাহাজ ভ্রমণ আসলেই একটি আনন্দদায়ক ভ্রমণ।

ভ্রমণে বুড়িগঙ্গা

মোঃ তৌফিক ইসলাম খান (অনিক)

শ্রেণী ঃ ৫ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১২

আমাদের দেশ নদীমাতৃক দেশ। অর্থাৎ ইংরেজীতে—"Bangladesh is a land of rivers." বাংলাদেশ জালের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নদী। ঢাকা যে নদীর তীরে অবস্থিত সে নদী অর্থাৎ "বুড়িগঙ্গা" ঢাকার একটি ঐতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন নদী।

আমি একদিন আমার বাবা মায়ের সাথে গিয়েছিলাম প্রথমে বাসা থেকে ধানমণ্ডি অফিস। তারপর বাসে ওয়াইজ ঘাট; এ স্থান থেকে অবশেষে লঞ্চে। লঞ্চটির নাম চাঁদপুর। লঞ্চটি বুড়িগঙ্গা সেতু ঘেষে পার হয়ে একটি কোনে থামল। জায়গাটি খুবই সুন্দর, সবুজের সমারোহ এবং সুবিস্তৃত ধানক্ষেত। এটি ছিল আমার নদী পথে প্রথম ভ্রমণ। এ সময়টি ছিল বর্ষাকাল। আকাশে একস্তুপ সাদা ও কালো মেঘের ভেলা। নদীতে অনেক নৌকা, লঞ্চ ও স্টীমার ছিল। যেমন- ডিঙি, সাম্পান। স্টীমারের মধ্যে মাদারীপুর, চাঁদপুর। অবশেষে নদী তীরে সূর্যাস্তের দৃশ্য উপভোগ করে, সন্ধ্যা ৭টার দিকে রওনা হলাম। আমাদের নানা মজাদার খাবার দেয়া হয়েছিল। এ অনুভূতি আমি কখনও ভুলব না। ফিরে আসার সময় কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের একটি কথাই মনে পড়লিছ—

"দিনের আলো নিভে এল
সূয্যি ডোবে ডোবে
আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে
চাঁদের লোভে লোভে।"

চড়ুই পাখি ও কাকের থাবা

মোঃ সৈয়দ মাহ্মুদ

শ্রেণী ঃ ৬ষ্ঠ, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ২২

একটি ছোট পাখি নাম চড় ই। চড়ুই পাখিটি একটি তিনতলা বাড়ির এক পাশে পাইপের ভিতর বাসা বানিয়েছিল। একটি ছেলে তার বন্ধুকে মাঝে মাঝে ডাকতে আসত এই বাড়িটিতে। চড়ুই পাখির বাসার দিকে তাকাত সে। চড়ুই পাখিটি একটি কাকের দিকে নজর রাখত। চড়ুই পাখির বাসার ওপরের রেলিং এর মধ্যে বসে থাকত চড়ুই পাখিটি। চড় ই পাখিটি ভয়ে কাককে দেখতেই পালিয়ে যেত। চড়ুই একদিন বাসায় আসার পর কাকটি আড়ালে লুকিয়ে থাকে। সে সময় চড় ই কাউকেই দেখেনি। বদমাশ কাকটি চড়ুইকে থাবা দিয়ে ধরে ফেলে। কাকটি তার ঠোঁট দিয়ে চেপে এমনভাবে চড় ইকে ধরে যে চড়ুইটি ছুটার জন্য ছটফট করতে থাকে। এক সময় যে ছেলেটি তার বন্ধুকে ডাকতে আসত সে এই করুন দৃশ্য দেখতে পায়। ছেলেটি রাস্তা থেকে এক টুকরো ইট নেয় এবং কাকটিকে মারার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু কাকটি ছিল ভীষণ চালাক। কাকটি দেখে ফেলে ছেলেটিকে। কাকটি উড়ে গিয়ে অন্য রেলিং এ বসে। সেখানেও ছেলেটি ইট মারতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। যে বন্ধুকে ডাকতে আসত ছেলেটির নাম আশিক আলম ইভান।

শিক্ষা সফরে জাফলং

সাজনে আরা মালেক

সহকারী প্রধান শিক্ষক

ভ্রমণ মানেই আনন্দ। কিন্তু সেই আনন্দ অনেক সময় বয়স ও পারিপার্শ্বিক কারনে উপভোগ করা হয়ে ওঠে না। নভেম্বর-২০০৩ এ 'নায়েম' ট্রেনিং এর অংশ হিসেবে এমনি একটি ভ্রমণ তথা শিক্ষা সফরের সুযোগ হাতে এসে গেলে। ১২ ও ১৩ নভেম্বর দু'দিনের জন্য যেতে হবে জাফলং ভায়া সিলেট। সময়টা ছিল রমজান মাস। তাই সাহস পাচ্ছিলাম না যেতে। দোদুল্যমনতার মধ্যে অবশেষে ছেলেমেয়েদের উৎসাহে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ভোর রাতে সেহেরী খেয়ে আর ঘুমানো হল না। ভোর ৬.৩০ মিনিটে ট্রেন ছাড়বে কমলাপুর স্টেশন থেকে। স্টেশনে পৌঁছে দেখি দলের প্রায় সবাই যার যার আসন নিয়ে বসে পড়েছে। চার পাঁচজন প্লাটফরমে আমার জন্য অপেক্ষা করছে কারণ আমিই ছিলাম ৩৪জনের দলের সর্বশেষ যাত্রী। মাসুদা আমার সিট তার পাশেই রেখে দিয়েছিল। ট্রেনে উঠেই বসে পড়লাম। আমাদের কো-অর্ডিনেটর ডঃ জসিবর স্যার ও দলের সবাই আমাকে দেখে খুশি হলেন। কারন আমার যাওয়ার নিশ্চয়তা ছিল না।

ঠিক ৬.৪০ মিনিটেই সিলেট গামী ট্রেন 'পারাবত' আমাদের নিয়ে রওনা হল। জানালা দিয়ে ঘনকুয়াশা দেখতে পেলাম, বুঝলাম শীত আসন্ন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে কুয়াশার সাদা চাদর আস্তে আস্তে সরতে শুরু করল। দু'পাশের প্রকৃতিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ট্রেনে এ পথে আমার প্রথম যাত্রা। দু'পাশের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে এতই ভাল লাগছিল যে, মনে মনে ভাবলাম-না আসলে বড় ভুল করতাম। স্রষ্টা তাঁর নিপুণ হাতে সৃষ্টিকে কত রংয়ে, কত ঢংয়ে, সাজিয়েছেন তা স্বচক্ষে না দেখলে উপলব্ধি করা যায় না। কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও বা দিগন্ত জোড়া সমতল ভূমি। কোথাও মাটির রং লাল, কোথাও ফিকে লাল আবার কোথাও বা অবারিত সবুজ সমতল ভূমি। ভূমির বৈচিত্র্যের সাথে তাল মিলিয়ে গাছ-গাছালির বৈচিত্র্য ও লক্ষনীয়। কোথাও শুধু কাঁঠাল বাগান, কোথাও শুধু বাঁশ ঝাড়, কোথাও কড়ই বাগান। আবার মাঝে মাঝে লতাগুল্ম পরিবেষ্টিত ভূমিও দেখতে পেলাম। তবে ঢাকা থেকে সিলেট সীমান্ত পর্যন্ত নারকেল বা তাল বৃক্ষ খুব কমই চোখে পড়েছে।

দৃষ্টি নন্দন দৃশ্যটি শুরু হয়েছে সিলেট সীমান্তে প্রবেশের পর। রাস্তার ডান দিকে উঁচু পাহাড় আর বাম দিকে দিগন্ত জোড়া সমতল ভূমিতে ধান ক্ষেত। তারই মাঝ দিয়ে দ্রুতগতিতে চলছে আমাদের ট্রেন। একবার ডানে তাকাইতো আবার বামে। সে কি মনোহর দৃশ্য! একদিক দেখলে আরেক দিক অদেখা রয়ে যায়। পাহাড়ী ভুমিতে রয়েছে আমাদের অর্থকরী ফসল চায়ের বাগান। একটির পর আরেকটি। সমতল ভূমিতে রয়েছে সোনালী ধান আর ধান। সিলেটের বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত দেখে আমার কেবলই মনে হয়েছে, আমাদের দেশের মানুষ কেন ভাতে কষ্ট পায়? এরকম ধানক্ষেত প্রথম জীবনে একবার দেখেছিলাম লাহোর (পাকিস্তান) অঞ্চলে। আর এ বয়সে এসে দেখলাম সিলেটে।

একদিকে চা বাগানে চা শ্রমিকরা পিঠে ঝুড়ি

নিয়ে পাতা তুলছে। চা বাগানগুলোকে পরম মমতায়, আদরের ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছে কড়ই গাছ। অপর দিকে সোনালী ধানের উপর সূর্যরশ্মি পড়ে কি যে এক মোহনীয় আভার সৃষ্টি করেছে তা না দেখলে ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয় চলতে চলতে আমরা দুপুর ৩.০০টায় সিলেট স্টেশনে এসে পৌছলাম। ট্রেন থেকে নেমে শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে কাছাকাছি একটি স্কুল পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত হল।

সবাই মিলে স্টেশনের অদূরে 'নসিবন ন্নেছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়' পরিদর্শনে গেলাম। এটি একটি বেসরকারী বিদ্যালয়। আগের দিনই রমজানের ছুটি হয়ে গেছে। প্রধান শিক্ষককে বাড়ি থেকে সংবাদ দিয়ে আনা হল। তিনি আমাদের সম্মানে বসতে দিলেন। পরে সমস্ত বিদ্যালয় ঘুরিয়ে দেখালেন। পাঠাগার, বিজ্ঞানাগার থেকে শুরু করে সবকিছুই সীমিত সামর্থের মধ্যে তিনি গড়ে তোলেন। তাঁর সবচেয়ে যে বিষয়টি আমাকে মুগ্ধ করেছে তা হলো-বিদ্যালয়ের ভেতরের ছোট্ট পুকুরটিতে তিনি মাছের চাষ করেন, আর পুকুর পাড়ে গড়ে তুলেছেন নার্সারী। যা বিদ্যালয়ের আয়ের উৎস। তবে ব'াংলাদেশের লন্ডন' নামক জেলা শহরটির এই বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। প্রধান শিক্ষক বাহির থেকে ছাত্রীদের জন্য পানীয় জল আনার ব্যবস্থা করেন। রোজার দিনে আমাদেরকে আপ্যায়ন না করতে পারার বেদনা তিনি প্রকাশ করলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে গেলাম হযরত শাহ্জালাল (রাঃ)র মাজার শরীফ জিয়ারত করতে।

মাজার শরীফে পৌছা মাত্রই ইফ্তারের সাইরেন বেজে উঠল। আমরা সবাই ইফ্তার সেরে নিলাম মাজার সংলগ্ন হোটেলে বসে। যেখানে আমরা রাত কাটিয়েছিলাম। রাতে খাবারের আগে ডঃ জসিবর স্যার সবাইকে নিয়ে বসলেন পরদিনের পরিকল্পনা নিয়ে। সেখানে ছোটখাট একটি 'যেমন খুশি' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হল। দলে দু'একজন ছাড়া আমরা সবাই ছিলাম বৃদ্ধদের দলে। হঠাৎ যেন সেই ছোট্ট বেলার দিনগুলিতে ফিরে গেলাম যা অনেক দিন মনে থাকবে। এরপর চলে গেলাম মাজার শরীফে। রাতের সেহেরী বাদে প্রায় সারা রাতই আমরা মাজার শরীফ মসজিদে কাটালাম। ফজরের নামাজ শেষে মাজার সংলগ্ন পুকুরে হযরত শাহ্ জালাল (রাঃ) র স্মৃতি বিজরিত সাতশত বছরের গজার মাছ দেখতে গেলাম। অসংখ্য গজার মাছ। একটির উপর দিয়ে আরেকটি গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু আজ যখন এ লেখা লিখছি ততদিনে গজার মাছগুলো এ দেশের কিছু অমানুষের কারনে মরে গেছে যা পত্রিকার পাতায় দেখতে পেলাম।

পরদিন সকাল ৭.৩০ মিনিটে আমরা জাফলং এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পথে হযরত শাহ্ পরান (রাঃ) র মাজার শরীফ জিয়ারত করলাম। আমাদের বাস জৈন্তাপুরের কাছাকাছি পৌছতেই ডঃ জসিবর স্যার আমাদের শ্রীপুর দেখার প্রস্তাব দিলেন এবং এও বললেন যে, এটা না দেখলে আমরা ভুল করব। সাহস করে বাস থেকে নেমে পড়লাম। দূর্গম পাহাড়ী পথ। হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় আমরা ভারতের মেঘালয় সীমান্তে পৌঁছে গেলাম। কি অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য! পাহাড়ী বনভুমিতে (বাংলাদেশ অংশে) দিগন্ত জোড়া পরিকল্পিত সুপারী বাগান। থরে থরে পাকা সুপারী গাছে গাছে ঝুলছে। ভারতীয় অংশে পাহাড়ের গায়ে পরিপক্ক আপেল, কমলা আর আঙ্গুরের বাগান। ছোট শিশুর মত লোভ সংবরন করা খুব কঠিন ছিল জেনেও আমরা আইনের কাছে বন্দী ছিলাম। পথিমধ্যে দেখলাম খাসিয়া মেয়েরা ঝুড়ি নিয়ে চা বাগানে পাতা তুলতে যাচ্ছে। তাদের দু'একজনের সাথে কথা হল। এবার ফেরার পালা, সবাই এসে বাসে বসলাম।

এবার আমাদের বাস জাফলং এর পথে এগিয়ে চলছে। ভারত আর সিলেট সীমান্তের

মাঝখানে স্রষ্ঠা যেন পাহাড়ী গালিচা ঝুলিয়ে দিয়ে সীমানা নির্ধারন করে দিয়েছেন। আমার বারবার মনে হচ্ছিল হযরত শাহ্ জালাল (রাঃ) কিভাবে এ দূর্গম পথ পাড়ি দিয়ে সিলেটে এসে তাঁর আস্তানা গাড়লেন। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। পথিমধ্যে 'তামাবিল' দেখলাম যেখানে ভারতীয় ট্রাকে এসে কয়লা জমা হচ্ছে। দূরে ভারতীয় পাহাড়ী রাস্তায় গাড়ী, ট্রাক, মানুষ চলাচল করছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝর্ণার অপরূপ রূপালী দৃশ্য । দুপুরের আগেই আমরা জাফলং ডাউকি নদীর তীরে এসে পৌঁছলাম। এই 'ডাউকি নদী' ভারতের মেঘালয়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এর উৎসস্থল এবং মিলিতস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেও কিছু জানতে পারলাম না। নদী তীর থেকে দেখতে পেলাম অসংখ্য লোক আমাদের দেশের জেলেদের মত পাথর তুলছে-কেউ বালতি, কেউ চালনি, কেউ বা অন্য কোন উপায়ে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। সিদ্ধান্ত হল নৌবিহারের। দুটি নৌকা ভাড়া করে নৌবিহারে নেমে পড়লাম। নৌকায় বসেই সিদ্ধান্ত হল-ডাউকী নদীর অপর তীরে খাসিয়া পল্লী দেখতে যাব। যেই কথা সেই কাজ। দুপুরের খর রৌদ্রে নৌকা থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলাম। পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। এক সময় আমরা খাসিয়া পল্লীতে এসে পৌছলাম। এখানে আরেক জীবন। ঘরগুলো 'মাচাং' এর মত করে উঁচুতে তৈরি। এখানেও বনভুমিতে পরিকল্পিত সুপারী বাগানকে ঘিরে পানের বরজ গড়ে উঠেছে। খাসিয়া নারী শ্রমিকরা পান পাতা তুলে সেগুলো থরে থরে সাজাচ্ছে। গৃহকর্তা বা কর্ত্রীর সঙ্গে কথা হল তাদের জীবনা চরন নিয়ে। কথার মধ্যে বুঝা গেল, তারা অর্থনৈতিকভাবে খুব স্বচ্ছল নয়। সরকার ও তাদের প্রতি খুব একটা খেয়াল করে না। আবার ফেরার পালা। হাঁটার পথে পরিচয় হল বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত পুরুষ-নারী পাথর শ্রমিকের সাথে। কথা প্রসঙ্গে নারী শ্রমিকরা তাদের পারিশ্রমিকের বৈষম্যের কথা বলল। আমার মনে হল-এ বৈষম্যের অবসান হওয়া জরুরী।

নদীর ঘাটে এসে নৌকায় উঠলাম। দুপুর ১টায় আমরা আবার বাসে উঠে বসলাম। বাস দুপুর ২.১৫ মিনিটে সিলেট রেল স্টেশনে এসে পৌঁছল। দুপুর ২.৩০ মিনিটে আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম 'উপকুল' ট্রেনে। ট্রেনে বসেই ইফ্তারী সারতে হল। রাত ১১.৩০ মিনিটে ট্রেন আমাদেরকে নিয়ে কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছল।

আমার নিজের দেশ—মায়ের দেশ—বাংলাদেশের একটি পাহাড়ী অঞ্চলের নৈসর্গিক দৃশ্য মনের মধ্যে ধারন করে এক অপরিসীম ক্লান্তিহীন আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম রাত ১২.০০টায়। মনে পড়ছিল বারবার বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার অংশ—

"দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু
দেখা হয়নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে দু'পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু।"

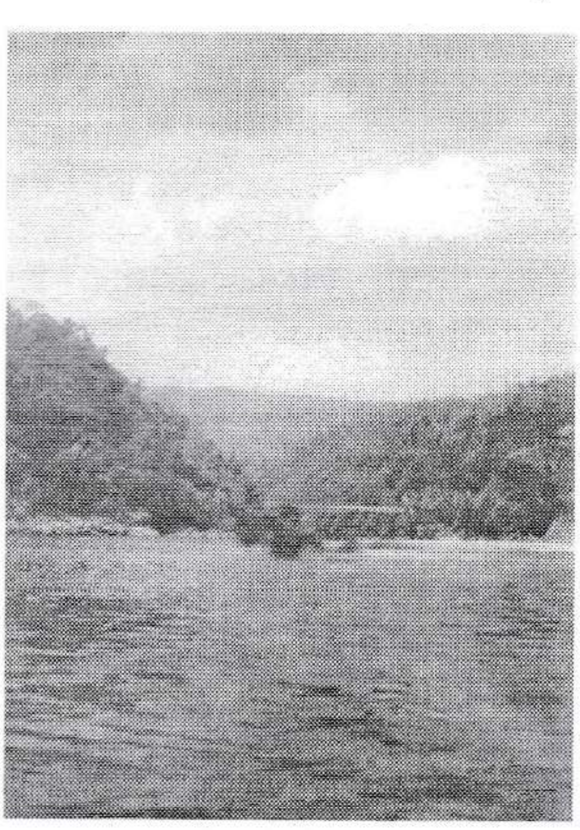

কৌতুক ও ধাঁধাঁ

ভেবে উত্তর দাও, নতুবা পরে লজ্জিত হবে।

—এরিস্টটল

১

মোঃ মাহ্‌মুদ হাসান

শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ক, রোল নং ঃ১৫

বড় ভাই রফিকুল্লাহ্‌ ঃ খাওয়া শেষ করে বলল, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্‌।

ছোট ভাই শুকুর ঃ দ্রুত খাওয়া শেষ করে সে বলল, রফিকুল্লাহ।

বড় ভাই ঃ জিজ্ঞেস করল-"তুই আমার নাম বললি কেন?'

ছোট ভাই ঃ বারে, প্রতিদিন তুমি খাওয়া শেষে আমার নাম বল। আর আমি আজই শুধু তোমার নাম বলেছি। এতে দোষের কি?

২

মোঃ আমির হোসেন হামজা

শ্রেণী ঃ ৬ষ্ঠ, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১৮

শিক্ষক ঃ কি ব্যাপার তপন, স্কুলে আসতে এত দেরি হল কেন?

তপন ঃ স্যার চিপ্‌স কিনতে গিয়ে দেখি টাকাটা যেন কোথায় পড়ে গেছে টাকা খুঁজতে খুঁজতে এত দেরি হলো।

শিক্ষক ঃ দিপু তোমার দেরি হলো কেন?

দিপু ঃ স্যার, আমি যে তপুর টাকার উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাই দেরি হলো।

৩

মোঃ নাহিদুল ইসলাম

শ্রেণী ঃ ৮ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৩৮

শিক্ষক ঃ তোমরা দেরি করে এসেছ কেন?

জুয়েল ও সোহেল ঃ স্যার, আপনিই তো বলেছেন রাস্তায় সব কিছু দেখে আসবে। তাই এক জায়গায় সাপের খেলা ও অন্য জায়গায় বানরের খেলা দেখে আসলাম।

তাই তো স্কুলে আসতে দেরি হয়ে গেল।

৪

মোঃ জহিরুল ইসলাম

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ১৪

● পরীক্ষার কেন্দ্র থেকে বেড়িয়ে দুই বন্ধু আলাপ করছে—

১ম বন্ধু ঃ জানিস আমার না কিছুই কমন পড়েনি, পুরো সাদা খাতা জমা দিয়েছি।

২য় বন্ধু ঃ আমিও সাদা খাতা জমা দিয়েছি কিছুই কমন পড়েনি বলে।

১ম বন্ধু ঃ বলিস কি! স্যার ভাবছে আমরা দু'জন নকল করেছি।

● একজন লোক নৌকায় চড়ে নদী পাড় হচ্ছিলেন। হঠাৎ তুফানের ধাক্কায় লোকটি নদীতে পড়ে গেলেন। তখন মাঝি তাকে টেনে আবার নৌকায় তুললে লোকটি ভদ্রতার খাতিরে মাঝিকে বলল, ভদ্রলোক—Thank you very much.

মাঝি ঃ স্যার এখানে আর কি মাছ দেখছেন। সমুদ্রে পড়লে দেখতেন কত মাছ।

● একদিন বাবা আর ছেলে বের হয়েছে ঘুরতে। যেতে যেতে ছেলে রাস্তায় দেখল একটি দোকানে কয়েকজন লোক চা খাচ্ছে। তাই দেখে ছেলে বাবাকে বলল, ওরা কি খায় বাবা?

বাবা উত্তর দিল— "চা"।

ছেলে বাবাকে বলল— আমি চাইতে পারব না, তুমি চাও।

৫

মোঃ কামরুল হাসান

শ্রেণী ঃ ৬ষ্ঠ, শাখা ঃ খ রোল নং ঃ ১৯

● প্রশ্ন ছিল আরবের প্রাচীন অধিবাসী সম্পর্কে যা জান লেখ (প্রশ্নের মান-১০)

পরদিন ক্লাসে—

ছাত্র ঃ স্যার আমাকে পাঁচ নম্বর কম দিলেন কেন ?

শিক্ষক ঃ তুমি সম্পূর্ন উত্তর লেখনি কেন?

ছাত্র ঃ কিন্তু প্রশ্নে ছিল তুমি যা জান তাই লেখ। তাই আমি যা জানি তাই লেখেছি।

৬

মোঃ সানি রশীদ

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১৫

● থিয়েটারে যাবেন ভদ্রলোক তাই টিকেটের দরকার। টিকেট কাউন্টারে গিয়ে—

ভদ্রলোক বললেন ঃ আমায় একটা হাফ টিকেট দিন।

টিকেট কেরানী বললেন ঃ সে কি মশায় আপনি তো বয়স্ক লোক হাফ টিকেট দিয়ে কি করবেন?

ভদ্রলোক বললেন ঃ আহা! তা দেন তো, আমার যে একটা ছোখ অন্ধ তাই আমি অর্ধেক দেখব।

● এক ভদ্রলোক চিঠি লিখে খামে বন্ধ করে তার ছেলের হাতে পয়সা দিয়ে বললেন ঃ এটার উপর টিকেট লাগিয়ে বাক্সে ফেলে দিও একটু পরেই ছেলে ফিরে এসে বাবার হাতে পয়সা ফেরত দিল। তার বাবা অবাক হয়ে বললেন, কিরে চিঠি ডাকে দিস নি? ছেলে বলল, দিয়েছি তবে সবাই যখন ওদিকে ছিল তখন আমি লুকিয়ে টিকেট না লাগিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছি।

৭

মাহমুদুল হাসান পিয়াস

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৪০

● দুই চাপাবাজ কথা বলছিল।

১ম চাপাবাজ ঃ জানিস বন্ধু আমার দাদার এক বিশাল গোয়াল ঘর ছিল। যার এক দ্বার দিয়ে ঢুকে অন্য দার দিয়ে বের হতে পুরো বছর লেগে যেতো।

২য় চাপাবাজ ঃ আমার নানার ইয়া লম্বা একটা বাঁশ ছিল যা দিয়ে তিনি আকাশের মেঘ সরিয়ে সূর্য দেখতে পারতেন।

১ম চাপাবাজ ঃ তাহলে তিনি বাঁশটা কোথায় রাখতেন ?

২য় চাপাবাজ ঃ কেন? তোর দাদার গোয়াল ঘরে।

৮

মোঃ জানে আলম

শ্রেণী ঃ ১০ম শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ৭

● পরীক্ষার হলে দুই বন্ধু নকল করছিল।

১ম বন্ধু ঃ তোর কাছে ঐ ভাবসম্প্রসারণ টা আছে ।

২য় বন্ধু ঃ কোনটা।

১ম বন্ধু ঃ ঐ যে ১ নম্বরটা "নকল ছাড়, শিক্ষার উন্নতি কর"।

৯

মামুনুর রশীদ (শাওন)

শ্রেণী ঃ ৫ম, শাখা ঃ ক

বাবা ঃ শ্রেণী পরীক্ষায় কয়টি অংশ ছেড়ে এসেছো টুটুল?

টুটুল ঃ একটি।

বাবা ঃ আচ্ছা তা ভুলে গেছো কয়টি?

টুটুল ঃ মাত্র একটি।

বাবা ঃ বাহ্! অংক কয়টি ছিল পরীক্ষায়?

টুটুল ঃ দুইটি।

১০

সিফাত ইসলাম

শ্রেণী ঃ ৮ম , শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১১

● দুই বন্ধু লাল্টু ও পল্টু কথা বলছে—

লাল্টু ঃ এই পল্টু তোর বয়স কতরে?

পল্টু ঃ দশ, তোর বয়স কত লাল্টু?

লাল্টু ঃ আমার ও দশ।

পল্টু ঃ ওমা! গত দুই দিন বছর ধরে তুই বলছিস তোর বয়স দশ। আসল ব্যাপার কি?

লাল্টু ঃ আরে আমি ভাই এক কথায় মানুষ আজ একথা কাল অন্য কথা এমন কাজ কখনও করি না।

● মা ও ছেলে কথা বলছে ঃ

ছেলে ঃ মা বড় হয়ে আমি পাইলট হবো। পাইলট হয়ে আমাদের ঘরের উপর দিয়ে প্লেন চালিয়ে যাব।

মা ঃ তা আমার খোকা প্লেন চালিয়ে যাচ্ছো সেটা বুঝবো কিভাবে?

ছেলে ঃ কেন? যাবার সময় ঘরের উপর একটা বোমা ফেলে যাব।

১১

গাজী আশরাফুল ইসলাম

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৩৮

● **শিক্ষক ঃ** অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাচঁতে পারে না। এই গ্যাস ১৭৭৩ সালে আবিস্কৃত হয়েছে।

ছাত্র ঃ স্যার ১৭৭৩ সালের আগে মানুষ তবে বাচঁতো কিভাবে?

● কিরে ইমন তুই ইতিহাসে ফেল মেরেছিস?

ইমন ঃ কি করব দোস্ত? আমার যখন জন্মই হয়নি তখন কি ঘটেছিল, তাই স্যার প্রশ্ন করেছিল?

● পাশাপাশি দুই বন্ধু বাস করে। একজন বি, এ পাশ অন্যজন বি,কম, পাশ, যে বন্ধুটি বি, কম, পাশ করেছে তার বাবা নিরক্ষর, তাই বাবা খবর শুনে ছেলেকে বললেন আমি কি তোকে পড়ার খরচ কম দিয়েছি যে তুই বি, কম পাশ করলি।

শিক্ষক ঃ একটি চোর কাল আমার ঘড়িটি চুরি করেছে, এই বাক্যে কর্ম কোনটি?

ছাত্র ঃ কর্ম কোথায় স্যার? সবটাই কু-কর্ম।

১২

মোঃ ইমরান খান

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ খ , রোল নং ঃ ৮, বিভাগ ঃ বিজ্ঞান

● শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন—

শিক্ষক ঃ বলত হাসি এর ইংরেজি কি?

ছাত্র ঃ এতো সোজা স্যার! লাফ

শিক্ষক ঃ তাহলে হাসা হাসির ইংরেজী কি?

ছাত্র ঃ লাফালাফি।

১৩

সাকির রুবাইয়াত আহমেদ

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৩৯

● এক স্কুল শিক্ষক ক্লাশে টেবিলের উপর মাথা রেখে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ স্কুল পরিদর্শক এসে উক্ত শিক্ষককে ডাক দিলেন, এই যে মাষ্টার সাহেব কি করছেন?

শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন ইহাকেই নিদ্রা বলে। আগামীকাল অনিদ্রা ও সুনিদ্রার কারণ পড়াব মনে থাকবে তো?

১৪

মোঃ ইমরান হোসেন চৌধুরী

শ্রেণী ঃ ৭ম , শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ২

মা ঃ আয়, আয় চাঁদ মামা টুসির কপালে টিপ দিয়ে যা।

মেয়ে ঃ আয়, আয় চাঁদ নানা আম্মুর কপালে টিপ দিয়ে যা।

মা ঃ আরে টুসি, নানা নাতো, মামা।

মেয়ে ঃ আম্মু চাঁদ তোমার মামা হলে, আমার হবে নানা।

ছেলে ঃ মা জানো, আমাদের বাথরুমটা না অটো হয়ে গেছে। দরজা খুললেই বাতি জ্বলে।

মা ঃ পিকলু, তার মানে তুই গতকাল রাতেও ফ্রিজে প্রসাব করেছিস।

শিক্ষক ঃ শের শাহ ঘোড়ার ডাকের প্রবর্তন করেন।

ছাত্র ঃ কেন স্যার এর আগে ঘোড়া ডাকত-না।

শিক্ষক ঃ বলো তো, তাজমহল কোথায়?

ছাত্র ঃ পারি না, স্যার।

শিক্ষক ঃ বেঞ্চের উপর দাঁড়া।

ছাত্র ঃ কেন স্যার, বেঞ্চের উপর দাঁড়ালে কি তাজমহল দেখা যাবে?

[সংগৃহীত]

১৫

খ. ম. সাদ্দাম হক

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১১

● **হোটেল বয় ঃ** আপনার ছেলে আমাদের হোটেলে খেয়ে আপনার চেয়ে বেশী বকশিশদেয় স্যার!

ভদ্রলোক ঃ হ্যাঁ তা দিতে পারে। কারন তার বড়লোক বাবা আছে। কিন্তু আমার তো নেই।

● নোংরা জুতা পরে বাল্ব বদলাতে টেবিলের উপর উঠেছে গৃহকর্তা।

স্ত্রী ঃ একটু দাঁড়াও কাগজ বিছিয়ে দিই।

স্বামী ঃ দরকার নেই এমনিতেই নাগাল পাব।

● **ক্রেতা ঃ** ভাই, ডিমের হালি কত?

দোকান ঃ ১৫ টাকা হালি। আর যদি আপনি ফাটা ডিম নেন, তবে ১০ টাকা হালি।

ক্রেতা ঃ তাহলে আমাকে ভাল ডিম গুলো থেকে এক হালি ডিম ফাটিয়ে দিন।

● স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা। প্রশ্ন পত্র খুব কঠিন হয়েছে দেখে এক ছাত্র তার শিক্ষকে বলছে—

ছাত্র ঃ খুব কঠিন প্রশ্ন হয়েছে স্যার! উত্তর দিতে ১২টা বেজে যাবে।

শিক্ষক ঃ তাতে কি হয়েছে ? খাতা ঠিক ১টা বাজে নেয়া হবে।

(১)

মোঃ জাভেদ উল্লাহ

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ

প্রশ্ন ঃ চলে কিন্তু হাঁটে না কি জিনিস তা বলো না?
উত্তর ঃ টাকা ও পয়সা।
প্রশ্ন ঃ লাগ বললে লাগে না, লাগবে না বললে লেগে যায়?
উত্তর ঃ ঠোঁট।
প্রশ্ন ঃ মাইটা হাড়ি কাঠের গাই, বাছুর বিনা দুধ দোহাই?
উত্তর ঃ খেজুর গাছ।
প্রশ্ন ঃ আগা খস খস গোড়ায় মৌ, যে না পারবে সে পবন ঠাকুরের বৌ?
উত্তর ঃ ইক্ষু।

(২)

মোঃ আহমেদ শরীফ জাকি

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ০৩

প্রশ্ন ঃ ভেবে চিন্তে বলত ভাই, কোন গ্রামেতে মানুষ নাই?
উত্তর ঃ টেলিগ্রাম।
প্রশ্ন ঃ কোন নারী, নারী না ?
উত্তর ঃ ডিকশ নারী।
প্রশ্ন ঃ চক থেকে এলো সাহেব কোট প্যান্ট পরে, কোট প্যান্ট খুলতে গেলে চোখজ্বালা করে?
উত্তর ঃ পিঁয়াজ।
প্রশ্ন ঃ চলিতে চলিতে তার চলা হল ভার, মাথাটি কাটিয়া দিলে চলিবে আবার?
উত্তর ঃ পেন্সিল।
প্রশ্ন ঃ জানালা নেই, মই নেই, কিন্তু আকাশে উঠে যায়, জিনিষটা কি?
উত্তর ঃ ধোঁয়া।
প্রশ্ন ঃ পৃথিবীর চেয়ে ভারী কি?
উত্তর ঃ পাপ।
প্রশ্ন ঃ সেই জিনিষটা কারে কয়, যার আছে সে ভিরু নয়?
উত্তর ঃ সাহস।
প্রশ্ন ঃ কাঠের শরীর দেখতে ভালো ধারালো তার মুখ, গাছের সাথে যুদ্ধ, করতে লাগে তার বড় সুখ?
উত্তর ঃ কুড়াল।

(৩)

খন্দকার রাশেদুল ইসলাম (ফাহিম)

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৪৫

প্রশ্ন ঃ চারদিকে কাঁটা কুটা মধ্যে দিয়ে সাহেবের বেটা?
উত্তর ঃ আনারস।
প্রশ্ন ঃ বাহির দিয়া লোহার বেড়া ভেতর দিয়ে জোয়ার ভাটা?
উত্তর ঃ নারিকেল।
প্রশ্ন ঃ এমন একটি প্রতিষ্ঠানের নাম বল যে প্রথম দুই অক্ষরে একটি প্রাণীর নাম, মধ্যের এক অক্ষরে আমাদের দেহের একটি অঙ্গের নাম তৃতীয় ও চতুর্থ অক্ষর মিলে হয় উদ্ভিদের একটি আঙ্গের নাম শেষের দুই অক্ষর মিলে হয় একটি ফলের নাম?
উত্তর ঃ হাসপাতাল।
প্রশ্ন ঃ একটি লোক গোসল করে মাথা ভিজে না?
উত্তর ঃ কচুপাতা।
প্রশ্ন ঃ মনে হয় দুটি তার কান আছে বুঝি কাছে গিয়ে একটি কানও নাহি পাই খুঁজি?
উত্তর ঃ দোকান।
প্রশ্ন ঃ তিন অক্ষরের নাম তার সব লোকে খায়, প্রথম অক্ষর বাদ দিলে মেয়েরা চায়?
উত্তর ঃ খিচুরী, চুরী।
প্রশ্ন ঃ দিন রাত চলি ফিরি নাই মোর অবসর দিন যায়, মাস যায় যায় যে বছর?
উত্তর ঃ ঘড়ি।
প্রশ্ন ঃ রাজার ছেলে হাটে যায় বাইশ তেইশটা জামা গায়ে?
উত্তর ঃ বাঁধাকপি।

(৪)

মোঃ মাহমুদ হাসান

শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১৫

১. একটি ইলেকট্রিক ট্রেন দশ ফুট বেগে চলছে, বাতাসও দশ ফুট বেগে ট্রেনে বিক্ষপাশে আসছে, তাহলে ধোঁয়া কোথায় যাবে?
উঃ ইলেকট্রিক ট্রেনের ধোঁয়া থাকে না।
২. চৌচল্লিশ পায়ে চলে, জালের মধ্যে জড়িয়ে থাকে, কেউ হাসে, কেউ কাঁদে?
উঃ ফুটবল।

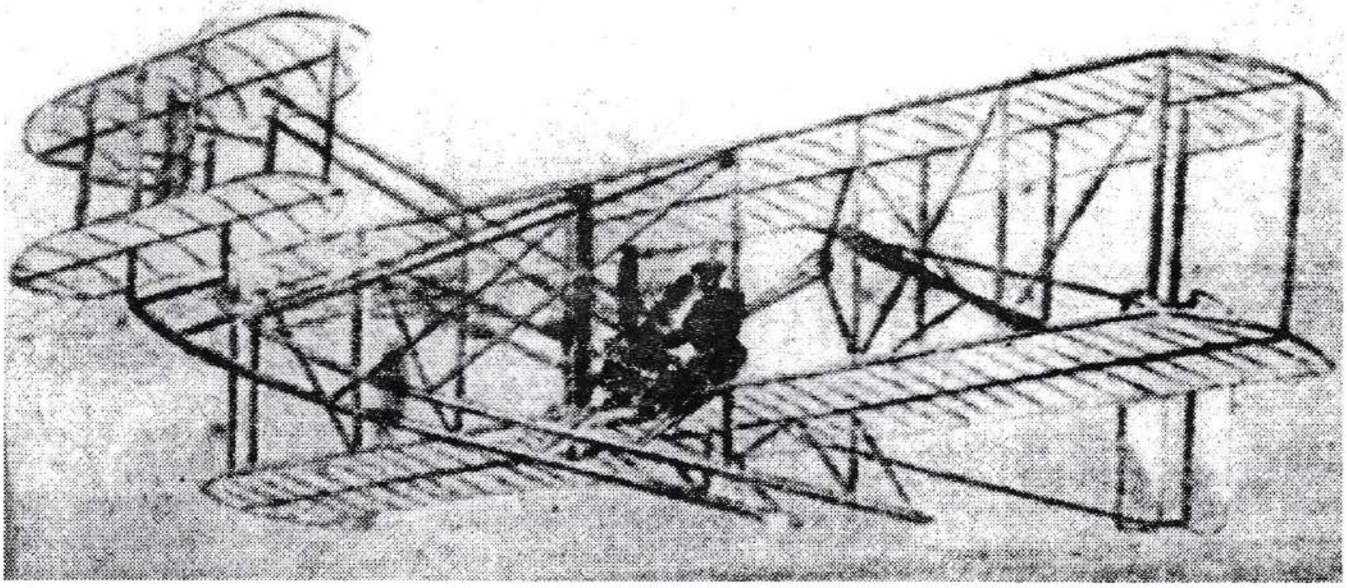

বিজ্ঞান
ও
বিচিত্র

অতি দ্রুত বুঝতে চেষ্টা করো না, কারন তাতে অনেক ভুল থেকে যায়।

— এডওয়ার্ড হল

জিরো থেকে হিরো

মোঃ আল-আমীন

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ২, বিভাগ ঃ বিজ্ঞান

কেউ বড় হয়ে জন্ম গ্রহণ করে না। মানুষ নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের দ্বারা এ পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। জন্ম মহিমা মাত্র। এই গুণে গুণান্বিত হয়ে অনেকে এখন মহাকালের পাতায় চিরভাস্মর। এমনি কয়েকজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করছি যাদের জীবন শুরু হয়েছিল ক্ষুদ্র পরিসর থেকে। যেমনঃ—

প্রথম জীবনে ছিলেন

মহাকবি শেক্সপিয়ার- থিয়েটারের হেলপার

গল্পকার হেনরী- রাখাল

ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী- বৈমানিক

মার্কিন উপন্যাসিক উইলিয়াম ফকলার- রং মিস্ত্রী

ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী মিসেস গোল্ডমায়ার- স্কুল শিক্ষিকা

জার্মানি ডিটেটেটর এড্‌লফ হিটলার- পোষ্টার মিস্ত্রী

ইংরেজ কবি রবার্ট বার্ণস- বর্গাচাষী

বিজ্ঞানী আলবার্ট আনস্টাইন- অফিসের কেরানী

বিখ্যাত গায়ক এলভিস প্রিসলী- ট্রাকড্রাইভার

বাংলাদেশের বিখ্যাত দানবীর ও শিল্পপতি রনদা প্রসাদ সাহা- একজন সেপাই

[সংগৃহীত]

সাধারণ জ্ঞান

মোঃ নাঈমে হাসান

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ ক, বিভাগ ঃ বাণিজ্য

ক) বাংলা ভাষার বয়স কত?

উ ঃ প্রায় ৪০০০ বছর।

খ) কতসালে বায়তুল মোকারম মসজিদে নামাজ আদায় শুরু হয়?

উ ঃ ১৯৬২ সাল থেকে।

গ) ২০০২ সালে বাংলাদেশে কততম বিশ্বইজতেমা হয়? এতে কত লোক শরীক হয়?

উ ঃ ৩৮ তম। প্রায় ৫ লক্ষলোক শরীক হয়।

ঘ) বাংলাদেশের কোন ব্যক্তি একটানা ৪৮ ঘন্টা ডুব দিয়ে পানির নিচে থাকতে পারে?

উঃ খুলনার নওশের আলী।

ঙ) বাংলাদেশের কোন গ্রামে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বট গাছ পাওয়া গিয়াছে?

উঃ যশোর জেলার কালিগঞ্জ থানার সরাই তলা গ্রামে।

চ) কোন ঝর্নার পানি রক্তের মতো লাল? সেই ঝর্ণার পানি পাত্রে রেখে দিলে রক্তের মতো জমাট বেধে যায়?

উ ঃ নিনডিমাবা নামক ঝর্ণা।

ছ) দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় মোবাইল কোম্পানি কোনটি?

উঃ গ্রামীণ ফোন। *[সংগৃহীত]*

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি

মোঃ ওসমান গনি

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ১৫, বিভাগ ঃ বাণিজ্য

১) কোন প্রাণী জীবনে একবারও পানি পান করে না?

উ ঃ যুক্তরাষ্ট্রের মরুপ্রাণী ক্যাঙ্গারু র‍্যাট

২) কোন দেশে ময়লা আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়?

উ ঃ জার্মানীতে।

৩) কোন দেশে একটি গাছ ৩২টি ফল দেয়?

উ ঃ সাইপ্রাসের সিসকো এলাকায়।

৪) কোন দেশে গাছ মানুষ খায়?

উ ঃ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলের মানুষ খেকো গাছ।

৫) কোন ব্যক্তি ৩৮৫ দিন না খেয়ে বেঁচে আছেন?

উঃ ম্যানসেটেরাস শহরের শ্রীমাত ক্যারোলিন।

৬) পৃথিবীর কোন দেশে রাবারের রাস্তা আছে?

উ ঃ ফ্রান্সের প্যারিস শহরে।

৭) কোন শহরে কুকুরের হোটেল আছে?

উ ঃ ফ্রান্সের প্যারিস শহরে।

৮) বিশ্বের কোন মহিলা ষাঁড়ের সাথে লড়াই করে বিজয়ী হন?

উ ঃ ১৯৯৮ সালে ষাঁড়ের সাথে মানুষের লড়াইয়ে স্পেনের ক্রিস্টিয়ানা সানচেজ বিজয়ী হন।

মধুর গুণ সমাচার

মোঃ ইফতে খারুল ইসলাম

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৫০

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন মধু ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পেতে দেয় না। মিসরে প্রাচীনকালে ক্ষতস্থানে মধুর প্রলেপ দেয়া হত। কিছুদিন আগ পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, মধু দিয়ে ঢেকে রাখায় ক্ষতস্থানে বাতাসের স্পর্শ লাগে না। সেই সঙ্গে এতে চিনি বেশি থাকায় ব্যাকটেরিয়ার বিস্তার বাধা পায়।

যুক্তরাজ্যের কার্ডিকে ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এক নতুন সমীক্ষায় দেখেছেন যে, মধুতে এমন কিছু উপাদান আছে যা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। কৃত্রিম মধুর চেয়ে প্রাকৃতিক মধু ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে তিন গুণ বেশি।

এই বিজ্ঞানীদের দলের প্রধান রোজ কুপার বলেছেন, আমরা দোকানে দৌড়ে গিয়ে মধু কিনে এনে ক্ষত চিকিৎসার পরামর্শ দিচ্ছি না। যাদের ক্ষত ব্যাপক তাদের উচিত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া। তিনি বলেন, দোকানের মধু খুব কার্যকর নাও হতে পারে। কারণ দোকানের মধু যাতে অনেক দিন থাকে, সেজন্য বোতলে ভরার আগে তা গরম করা হয়। এতে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে মধুর ক্ষমতা কমে যায়।

মজার তথ্য

মোঃ মওদুদ ওয়ারেছ কামাল

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ২

আগুন কেন পানিতে নিভে যায় ঃ আগুনে পানি ঢালবার ফলে বাতাসের অক্সিজেন আগুনের কাছে আসতে পারে না, তাছাড়া পানি অনেক পরিমানে উত্তাপ শোষন করে ফেলে। ফলে আগুন পানিতে নিভে যায়।

কোন জন্তু র চারটি পাকস্থলী আছে ঃ তারু নামের জন্তুর চারটি পাকস্থলী চাছে।

পেঁচা কেন রাতের বের হয় ঃ দিনের বেলায় সূর্যের আলো পেঁচার চোখে ভালভাবে প্রসারিত হয় না তাই ওরা রাতে বের হয়।

বর্ষন বৃক্ষ ঃ দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রকার গাছ থেকে তীব্র রোদের সময় পানির মত জলীয় পদার্থ নির্গত হয়। এ পদার্থ জলের মত নির্মল পানীয়। এই গাছের নামই বর্ষন বৃক্ষ।

অশ্বশক্তি (Horse Power) ঃ এটি হল এফ. পি. এস পদ্ধতিতে ক্ষমতার ব্যবহারিক একক। প্রতি মিনিটে ৩৩,০০০ফুট পাউন্ড কাজের হারকে এক অশ্ব শক্তি (Horse Power) বলা হয়। যদি কোন ব্যক্তি বা বস্তু ৩৩,০০০ পাউন্ড ওজনকে প্রতি মিনিটে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে খাড়া ১ফুট তুলতে পারে তবে তার ক্ষমতা বা শক্তিকে এক অশ্বশক্তি বলে।

মুক্তা ঃ ঝিনুক বা এ জাতীয় প্রাণীর দেহাভ্যন্তর থেকে প্রাপ্ত এক প্রকার পাথর জাতীয় পদার্থ। এসব প্রাণীর দেহের ভেতরের কোমল অংশে বালুকণা প্রভৃতি প্রবেশ করলে এর আঘাত সহ্য করার জন্য প্রাণীটি এক প্রকার লালা নিগতি করে। ঐ লালা বালুকনার চারপাশে জমাট বেঁধে মুক্তার জন্ম হয়।

দুধ কেন টক হয় ঃ দুধের মধ্যে এক ধরনের জীবানু ঘুড়ে বেড়ায়। বাইরের আবহাওয়ার উত্তাপে এরা আয়তন এবং সংখ্যায় বাড়ে ফলে গরম দুধে ন্যাকটিন নামক এসিডের পরিমান বাড়ায়। তাই দুধ টক হয়।

প্রথম মানব ক্লোন

মোঃ নেয়ামুল হাসান

শ্রেণী ঃ ৯ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ১, বিভাগ ঃ বিজ্ঞান

সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে জন্ম নিয়েছে মানব ক্লোন শিশু। ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ সারা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়ে সিজারিয়ানের মাধ্যমে জন্ম নেয় কন্যা শিশুটি। তার নাম দেয়া হয় 'ইভ'। যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদা অঙ্গরাজ্যের লাসভেগাস শহরভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান হিউম্যান ক্লোনিং সোসাইটি 'ক্লোনেইড' মানব ক্লোন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে। ফরাসী বিজ্ঞানী প্রথিতযশা রসায়নবিদ ব্রিজিট বোইসিলিয়ার সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট এবং ক্লোনিংয়ের কার্যক্রমে তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ক্লোনিংয়ের জন্য ৩০ বছর বয়সী এক মার্কিন মহিলা ডি এন এ (DNA) দান করেন।

ক্লোনিং কার্যক্রম ঃ যার ক্লোন করা হবে তার শরীরের যেকোন স্থান থেকে একটি কোষ নেয়া হয়। ক্লোনিং প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন একটি নিষিক্ত ডিম্বানু। এই কোষ থেকে আগেভাগেই ডিম্বানু সরিয়ে নেয়া হয়। কোষের জেনেটিক কোডও একই সঙ্গে সরানো হয়। এবার দাতার কোষের নিউক্লিয়াস সংযোজন করা হয় ডিম্বাণুর সঙ্গে। দাতার জেনেটিক কোডও দেয়া হয় ডিম্বাণুতে। ভ্রূণে পরিণত হওয়ার আগ পর্যন্ত কোষটি গবেষণাগারেই বেড়ে ওঠে। এরপরই চূড়ান্ত কাজ, ভ্রুনটিকে জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। জরায়ুতে ভ্রূনটি বেড়ে ওঠে স্বাভাবিক শিশুর মতই। তারপর কোষ দানকারীর মতই জন্ম নেয় হুবহু আরেকজন।

ক্লোনিং এর পটভূমি ঃ ক্লোনিং প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৯৬ সালে মেষ শাবক ডলির জন্ম লাভের মধ্য দিয়ে। তারপর শুরু হয় এর জোড় প্রক্রিয়া। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ক্লোনিং এর পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত আসতে থাকে। সে সময় মানব ক্লোনিং নিয়ে তেমন কিছু শোনা যায় নি, পরে শোনা যায়। তবে বিজ্ঞানীরা গোপনীয় ভাবে এই কাজটি চালিয়ে যেতে থাকেন। মানব ক্লোনের ঘটনাটি প্রকাশ হয় গত বছর অর্থাৎ ২০০২ সালে। সারা বিশ্বে এ নিয়ে শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক, তৈরি হয় দুটি পক্ষ। বিতর্ক ওঠে নৈতিকতা নিয়ে। হৈ হৈ রব ওঠে সর্বমহলে। কয়েকটি দেশে আইনের মাধ্যমে মানব ক্লোনিং নিষিদ্ধ করা হয়। এদের মধ্যে জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম।

ক্লোনিং এ জটিলতা ঃ ক্লোনিং নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে যেসব মত আসতে থাকে তা, জোরালো হয় প্রথম ক্লোন মেষশাবক ডলির অবস্থা দেখে। ডলিকে ক্লোন করা হয়, ছয় বছর বয়সী একটি বয়স্ক ভেড়ার কোষ থেকে। প্রথম দিকে অনেকেই ধারণা করেন ডলি বেশিদিন বাঁচবে না। রোগ শোকে আক্রান্ত হবে ঘন ঘন। রোগ প্রতিরোধক শক্তিও থাকবে কম। পরবর্তীতে দেখা যায় ডলি ঘন ঘন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। শারীরিক বৃদ্ধিটাও ঠিকমত হচ্ছে না। বর্তমানে ডলি গেঁটে বাতে আক্রান্ত। ব্যাপারটি বিজ্ঞানীদেরও ভাবিয়ে তোলে। এই জটিলতা যে কোন প্রাণীর বেলায়ও দেখা দেবে। মানুষের বেলায় আরও বেশি সম্ভাবনা থেকে যাবে। ডলির পরে গরু, শূকর, বিড়াল ইত্যাদি জীবজন্তুর ক্লোনিং করা হয়। কিন্তু সকল প্রাণীর ক্ষেত্রেই ক'দিন পর অজ্ঞাত কারণে মড়ক লাগে। তখনই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আসলে ক্লোনিং প্রক্রিয়াটি সহজ নয় বরং জটিল। বিজ্ঞানীরা যুক্তি দেখিয়েছেন মানব ক্লোন হলে নানা অসুবিধা হবে, একই চেহারার মানুষে ভরে যাবে গোটা দুনিয়া। এ সব সমস্যার কারণে বিজ্ঞানীরা চাননি মানব ক্লোন হোক, কিন্তু তার পরও হয়েছে।

নিঃসন্তান দম্পতিদের জন্য সুখবর

ক্লোনিং পদ্ধতির মাধ্যমে নিঃসন্তান দম্পতিরাও সন্তান লাভ করতে পারবেন। কোনো সন্তানহারা বাবা-মা ক্লোনিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত সন্তানের ডি এন এ (DNA) ব্যবহার করে তাদের সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। এই কারণে অনেক নিঃসন্তান দম্পতি সন্তানহারা বাবা-মা ক্লোনিং এর পক্ষে। অনৈতিক হলেও তারা যে কোনো উপায়ে সন্তান চান। ধর্মীয় ব্যাপারও তাদের কাছে উহ্য। কাড়ি কাড়ি টাকা

খরচ করে হলেও তাদের দাবি সন্তানকে মৃত সন্তানের মত হুবহু হতে হবে।

বিজ্ঞানীদের মতভেদ ঃ মানব ক্লোনিং নিয়ে বিজ্ঞানীদের মতভেদ দুই জায়গায়—

১। কেন একজন মানুষকে রোগাক্রান্ত করে জন্ম দেয়া হবে?

২। কেন একই চেহারার মানুষ জন্ম দেয়া হবে?

এ দুটো সমস্যার সমাধান করতে পারলেই কেবল বিজ্ঞানীদের মতভেদ দূর হবে। তাদের এক পক্ষের কাছে যদিও ধর্মীয় এবং নৈতিকতার বিষয়টি মূখ্য নয়। তারা কেবল বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিটাকে জিইয়ে রাখতে চান।

মানব সেবায় ক্লোনিং ঃ ক্লোনিং নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মতভেদ থাকলেও বিজ্ঞানীরা এটাকে মানব সেবার কাজে লাগাতে চাচ্ছেন। পারকিনসন্স থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত বিভিন্ন দূরারোগ্য ব্যধির চিকিৎসায় ক্লোনিং ব্যবহার করা হবে। সেটা সম্ভব হলে চিকিৎসা বিজ্ঞান আরও একধাপ অগ্রগতি লাভ করবে।

অবশেষে ক্লোন মানব শিশুর ভূমিষ্ট হওয়াকে বিজ্ঞনীরা চরম উৎকর্ষের সঙ্গে তুলনা করতে চাচ্ছেন। এ তুলনায় কোনো বিতর্কের স্থান নেই।

[সংগৃহীত]

বিখ্যাতদের জীবনী থেকে

মোঃ ইমরান হোসেন চৌধুরী
শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ২

আইনস্টাইন ঃ আইনস্টাইন একবার এক হোটেলে যাওয়ার সময় ভুলে বাড়িতে চশমা ফেলে গেছেন। হোটেল বেয়ারা তাকে মেন্যু দিলে চশমা ছাড়া তিনি সেটা পড়তে পারলেন না। তাই তিনি পাশের এক লোককে ডেকে বললেন—"দয়া করে আমার জন্য মেন্যুটা একটু পড়ে দেবেন?" লোকটি বলল— "আপনার মত আমিও পড়তে জানি না।"

টমাস আলভা এডিসন ঃ বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন একবার তার নিজের নাম ভুলে গিয়েছিলেন। ট্যাক্স জমা দেওয়ার জন্য কোর্ট হাউজে গিয়ে তিনি কিছুতেই নিজের নাম মনে করতে পারছিলেন না। এমন সময় তার এক প্রতিবেশী তাকে দেখে বলে ওঠেন—"আরে টমাস আলভা এডিসন না?" তখন তার নিজের নাম মনে পড়ে।

জর্জ বার্নার্ড শ ঃ ইংল্যান্ডের অন্যতম বিখ্যাত কবি টেষ্টারসন যেমন মোটা, প্রখ্যাত উপন্যাসিক এবং দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ ছিলেন তেমনি রোগা। একবার এক ভোজসভায় দু'জনের দেখা হয়। তখন ইংল্যান্ডে খুব দুর্ভিক্ষ চলছিল। টেস্টারসন শীর্নকায় জর্জ বার্নার্ড শ কে ঠাট্টা করে বললেন—"মসিয়ে আপনার চেহারা দেখে ভাল করেই বোঝা যায় এখন ইংল্যান্ডে দারুন দুর্ভিক্ষ চলছে।" জর্জ বার্নার্ড শ একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন— "তা হতে পারে, তবে আপনাকে দেখলে বুঝতে বাকি থাকে না যে, দুর্ভিক্ষটা কেন হয়েছে।"

স্যার আইজ্যাক নিউটন ঃ বিশ্ববিখ্যাত স্যার আইজ্যাক নিউটন একবার তার এক বন্ধুকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করলেন। তারপর সে একথা একদম ভুলে গেলেন। যথাসময়ে বন্ধুটি নিউটনের বাড়িতে এসে নিউটনকে না পেয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে প্রচন্ড ক্ষুধায় বন্ধুটি খাবার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং নিউটনের রাখা খাবারগুলো খেয়ে ফেললেন। তারপর উচ্ছিষ্টগুলো প্লেটে তুলে আবার ঢেকে রাখলেন। নিউটন ফিরে এসে অবাক হয়ে বন্ধুটিকে বললেন "তুমি এই অসময়ে। চল আমরা খেতে বসি। খেতে খেতেই তোমার সাথে গল্প করা যাবে।" পাশের ঘবে গিয়ে প্লেটের ঢাকনা খুলে নিউটন ভীষন লজ্জা পেলেন। বললেন—"দেখেছ কি ভুলো মন আমার, আগেই খেয়ে গেছি, তা আমার একদম মনে নেই।"

কম্পিউটার ভাইরাস

মোঃ এহসানুল হক

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৪৭

কম্পিউটার ভাইরাস কি ?

কম্পিউটার ভাইরাস এবং জৈবিক ভাইরাস এদের কাজ ও উদ্দেশ্য প্রায় একই। জৈবিক ভাইরাস মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টি করে এবং কম্পিউটার ভাইরাস কম্পিউটারের সমস্যা সৃষ্টি করে। আসলে এই ভাইরাস হল এমন একটি প্রোগ্রাম যা কম্পিউটারের অন্য প্রোগ্রাম বা ডাটা ধ্বংস করে দেয়। কম্পিউটার ভাইরাস হল কম্পিউটারের একটি রোগের মত।

ভাইরাসের নাম করণঃ

ভাইরাস [VIRUS] এর পূর্ণরূপ হলো — ভাইটাল ইনফরমেশন রিসোর্সেস আন্ডার সিজ [Vital Information Resources Under seize] অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রখ্যাত গবেষক ও কম্পিউটারবিদ "ফ্রেড কোহেন" ভাইরাস নামকরণ করেন।

ভাইরাস কম্পিউটারের কি ক্ষতি করেঃ

ভাইরাস কম্পিউটারের কম বেশী বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি করে। যেমন—

১) কম্পিউটার চলতে চলতে হঠাৎ Hang হয়ে যায়। ফলে সেভহীন মূল্যবান তথ্য হারিয়ে যায়।
২) কম্পিউটারের অনেক প্রোগ্রাম নষ্ট করে ফেলে।
৩) কম্পিউটারে হার্ডডিস্কে সংরক্ষিত অনেক মূল্যবান তথ্য মুছে ফেলে।
৪) কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক নষ্ট করে ফেলে।
৫) কম্পিউটারের গতি (Speed) কমিয়ে দেয়।
৬) হার্ডডিস্কে Bad sector বাড়ায়।
৭) হার্ডডিস্কে Fat নষ্ট করে দেয়।
৮) বায়োসের প্রোগ্রাম মুছে দেয়। ফলে কম্পিউটার চালু হয় না।

ভাইরাস কে তৈরী করে?

ভাইরাস একটি প্রোগ্রাম। তাই কম্পিউটারের অত্যন্ত মেধাবী প্রোগ্রামারই তৈরী করে ক্ষতিকারক এ প্রোগ্রাম। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ধ্বংস করে রাস্তা তৈরী করা হয় আবার ঐ ডিনামাইট দিয়েই সৃষ্টির সেরাজীব মানব ধ্বংসে মেতে উঠে। অনেক সাধনা করে বড় বড় প্রোগ্রামার বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম তৈরী করেন আবার তাদের মধ্যেই অনেক ভাইরাস সৃষ্টি করে।

কেন এ ভাইরাস সৃষ্টি করেন?

বিজ্ঞানের অনন্যতার একটি অন্যতম উদাহরণ হল ভাইরাস। বিজ্ঞান একদিকে মানুষের উপকার করছে যেমন—ঔষধপত্র, যানবাহন, যন্ত্রপাতী আবিস্কার করে আবার অপরদিকে চরম বিপর্যয় ঘটিয়েছে বিভিন্ন মরনাস্ত্রের মাধ্যমে মানুষের অপকার করছে। তেমনি ভাইরাস সৃষ্টি করা একটি মাত্র উদ্দেশ্য হল কম্পিউটারের ক্ষতি করা। প্রোগ্রামারদের মাঝে ও এমন মানষিকতার কেউ কেউ আছেন যারা অন্যের ক্ষতি করে আনন্দ পায়। আবার প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধের কারনে ও ভাইরাস সৃষ্টি করে। এ সকল কারনেই ভাইরাস সৃষ্টি হচ্ছে।

কম্পিউটার ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তা কিভাবে বুঝা যায়?

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা গেলে বুঝতে হবে যে কম্পিউটার ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে ঃ

১) কম্পিউটারে স্পীড (Speed) কমে যায়।
২) কম্পিউটারের ফাইল এর আয়তন বেড়ে যাবে।
৩) হার্ডডিস্ক এর আয়তন হ্রাস পাবে।
৪) হঠাৎ কম্পিউটার (Shutdown) হয়ে যাবে।
৫) মজার বা অদ্ভুত মেসেজ দেখাবে।
৬) কম্পিউটার বার বার (Hang) হয়ে যাবে।
৭) র‍্যাম (Ram) এর গতি কমে যাবে।
৮) Save কৃত প্রোগ্রাম নিজে নিজে মুছে যাবে।
৯) হঠাৎ কম্পিউটার চালু হবে না।
১০) হার্ডডিস্কে (Bad sector) বাড়বে।

কম্পিউটারকে ভাইরাস মুক্ত রাখতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় ?

কম্পিউটারকে ভাইরাস মুক্ত রাখতে হলে নিম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায়ঃ—

১) কম্পিউটারে এন্টি ভাইরাস সফটওয়ার (Soft Ware) রাখা।

২) নিয়মিত এন্টিভাইরাস রান করা।
৩) অন্যের ডিস্ক বা ফাইল ব্যবহার করার আগে পরীক্ষা করে নেওয়া।
৪) নিয়মিত ফাইল ব্যাকআপ (Backup) করা।
৫) Com এবং Exe ফাইলগুলোকে রিড অনলি (Read only) করে রাখা।
৬) সকলকে ভাইরাস প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করা।

সায়েন্স ফিকশন

খ. ম. সাদ্দাম হক

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১১

"হ্যামেলিনের সেই বাঁশীওয়ালা" আমরা জানি সেই হ্যামেলিনের বাঁশীওয়ালার শিশুদেরকে নিয়ে উধাও হওয়ার এক আশ্চর্য বেদানাদায়ক কাহিনী। যা ঘটেছিল বাঁশীওয়ালার সেই আশ্চর্য বাঁশীর গুনে যার সুরে বিমোহিত হয়ে ইদুর গুলো ও তার পেছন পেছন চলেছিল এবং অনুরুপভাবে এক ঝাঁক শিশু ও। এ গল্প আমাদের অজানা নয়। কিন্তু সেই লোকটি যে কোথায় গিয়েছিল সেই ছোট্ট প্রানিবন্ড শিশুদের নিয়ে তা কেউ জানে না। কিন্তু লোকটি এসে ছিল একটি নাম না জানা একটি দূরের গ্রহ থেকে। আগন্তুক এসেছিল হয়তো একটা জাত বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে। অর্থাৎ আগন্তুক যে গ্রহের বাসিন্দা যে গ্রহের একটি মানুষ জাতি ছিল বিলুপ্ত প্রায়। তাই তাদের দরকার পরেছিল নতুন জীবনের। কিন্তু সে কোন জীবন বা জীবন্ত প্রাণী হলে চলবে না। তাই ওদের সমজাতীয় বা প্রায় সমজাতীয় জীবন। যে রকম জীবনের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল মহাবিশ্বের সৃদুরতম প্রান্তের সেই অজানা গ্রহজগতের মহাকাশ চারীরা। তারা একেক জন একেক মহাকাশ যানে করে চারিদিকে দূরবর্তী সব গ্রহ গুলোর মধ্যে। এদের মধ্যেই এক জন এসে পরেছিল আমাদের এই পৃথিবীর জামার্নির একটি ছোট শহরে। তারা যে গ্রহ হতে এসেছিল সে গ্রহের সভ্যতা সুপ্রাচীন-সমুন্নত। নিঃসীম মহাশুন্য অতিক্রম করে গ্রহান্তরের যাতায়াত করবার জন্য মহাকাশ যান তৈরি করবার মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না কারিগরি বিদ্যা তারা আয়ত্ব করেছিল সে শ্যামলাবরণী এক গ্রহলোকে আগন্তুক সন্ধান পেল তার প্রায় সমজাতীয় প্রাণের। সেই গ্রহই আমাদের এই পৃথিবী। আগন্তুক নামল পৃথিবীর বুকে। মহাকাশ যান খানাকে লুকিয়ে রাখল একটি পাহারের গুহায়। পৃথিবীর মানুষদের সে কিছুদিন পর্যবেক্ষণ করল। করে সন্তুষ্ট হল এ জাতীয় প্রাণেই তার কাজ চলবে। এজাতীয় কিছু মানব- মানবীকে নিজের গ্রহে নিয়ে যেতে পারলে পক্ষান্তের সুদূরতম প্রান্তের একটি জাতি আসন্ন বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে। নতুন প্রানশক্তির আগমনে এক সুর্য সভ্যতা আবার সঞ্জীবত হয়ে উঠবে। নতুন জীবনের সংমিশ্রনে তাদের গ্রহজগতে জেগে উঠবে এবং নতুন প্রাণের আঙ্কুর।

আগন্তুক ঠিক করল এই শ্যামলাবরণী ধরনী থেকে সে একাদল শিশু নিয়ে যাবে। সেই শিশুদের বড় করে তোলা হবে তাদের গ্রহজগতে তাই হ্যামেলিন শহরকে সে একটি কৌশলে ইদুরমুক্ত করল। তার সঙ্গে একটি অদ্ভুত যন্ত্র ছিল যার থেকে বিভিন্ন সুর বের হত। সেই সুরে ছিল দুর্নিবার আকৃষনীয় শক্তি। সুরেরটানে টানে যেমন ছুটে চলল ইদুরগুলো তেমনি শিশুরাও তার পেছনে ছুটে চলল। তাছাড়া আগুন্তুক তাদের ভিন্ন গ্রহের নানা ধরনের কল্পকাহিনী। তারা সে সুর শুনে আগন্তুকের পেছন তারা গেল শহর পেরিয়ে একটা পাহাড়ের কাছে। যে ঢুকল মহাকাশযানে। তারপর মহাকাশযান আকাশে উঠল পৃথিবীর টানছাড়িয়ে উধাও হল নিঃসীম মহাশূণ্যে। সৌরজগৎ ছাড়িয়ে যেতে লাগল নাম না জানা জগতের সেই আশ্চর্য মহাকাশযান। আরেহী শিশুরা ভয় পাইনি। তাদের চারিদকে তখনও বিমোহিত সুর তাই তারা বুঝাতে পারল না কখন তারা পৃথিবীর বাঁধন কাটিয়ে মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে চলছে এক অজানা গ্রহজগতে।

কিন্তু অজানা আগন্তকের দূর্ভাগ্য। মহাকাশযানে দেখাদিল দূর্যোগ অর্থাৎ যান্ত্রিক গোলযোগ। অজানা আগাগুক ছিল চালক। সে শত চেষ্টা করেও বিপর্যয় এড়াতে পারল না। যেখানে বিকল হল মহাশূনের সে অংশ

সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ মঙ্গলের আর্কষনী ক্ষেত্রের মধ্যে। মঙ্গলের প্রচন্ড টানে মহাকাশযান গিয়ে আছড়ে পড়ল মঙ্গলের বালুকাময় প্রান্তরে। ধারনা করা হয় সেই মহাকাশচারী কোন যান্ত্রিক কৌশলে পতনের বেগ কিছুটা হ্রাস করতে পেরেছিল তাই পৃথিবীর সন্তানরা সব মরল না, যারা বেঁচে রইল তারা মঙ্গলের বুকে গড়ে তুলল নতুন বাসভূমি। ঔপনিবেশিক ভাবে এর মালিকানা তাদেরই। শিশুরা বড় হয়ে মরুর বুকে গড়ে তুলল এক বিরাট মন্দির। বিধ্বস্ত মহাকাশযান খানাকে রাখল মন্দিরে মধ্যে একটি বড় আসনের উপর। তাদের বংশধরেরা মরুর বুকে আর সেই মন্দিরকে মনে রাখে নি। মন্দির পরিত্যক্ত হয়েছে। পৃথিবীর সন্তানদের বংশ ধরেরা এখন মঙ্গলের সন্তান আর পৃথিবী এখন তাদের কাছে রূপকথা।

বাইনারি সংখ্যা

মোঃ তানজিরুল ইসলাম

শ্রেণী ঃ ১০ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৭, বিভাগ ঃ বিজ্ঞান

যে কোন সংখ্যা লিখতে আমরা ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬,৭, ৮ ও ৯ এই দশটি অঙ্কের সাহায্য নিই। এই গুলোকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসিয়ে যে কোন সংখ্যা লেখা যায়। এই পদ্ধতিটা পৃথিবীর সব দেশের মানুষ ব্যবহার করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই দশটা অঙ্কের পরিবর্তে মাত্র দুটো অঙ্ক ব্যবহার করেই কিন্তু যে কোন সংখ্যা লেখা যায়। এই দুটো অঙ্ক হচ্ছে-'০' আর '১'। শুধু শূন্য (০) আর এক (১) ব্যবহার করে সংখ্যা লিখলে তাকে বাইনারি সংখ্যা বলা হয়। প্রাচীনকালে চীন দেশে অঙ্কের পন্ডিতরা এই পদ্ধতিতে অনেক অঙ্ক কষে ছিলেন কিন্তু বাইনারি পদ্ধতি সত্যিকার চালু হল কম্পিউটার মেশিন চালু হবার পরে।

কম্পিউটার যন্ত্র বিদ্যুতে চলে এবং এতে করে অনেক ধরনের অঙ্ক কষা যায়। কিন্তু কম্পিউটার শুধু বাইনারি পদ্ধতিতে অঙ্ক কষতে পারে। এই কারণটা বোঝা তেমন শক্ত কিছু নয়। আমাদের ঘরে যে ইলেকট্রিক বাল্ব আছে সেটা সুইচ টিপলে জ্বলে। আবার সুইচ বন্ধ করলে নিভে যায়। তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় আলো জ্বলছে কি না? তাহলে উত্তর হতে পারে দুটো 'হ্যা' অথবা 'না'। এবার 'হ্যা'-টাকে যদি আমরা '১' এবং 'না' টাকে '০' ধরি তাহলেই ব্যাপারটা বাইনারি পদ্ধতিভুক্ত হয়ে পড়ছে। তাই বৈদ্যুতিক যন্ত্র নিয়ে '০' আর '১' দিয়ে কাজ করা সহজ।

এবার দেখা যাক সাধারণ সংখ্যাকে কিভাবে বাইনারি পদ্ধতিতে লেখা যায়। ধরি ৭ সংখ্যাকে আমরা বাইনারি পদ্ধতিতে শুধু '০' বা '১' ব্যবহার করে লিখব। প্রথমে ৭ কে ২ দিয়ে ভাগ করি। তাহলে ভাগফল হল ৩ আর ভাগশেষ ১। এই ভাগশেষ ১ হচ্ছে বাইনারি সংখ্যার প্রথম অঙ্ক। এখন ৩ কে আবার ২ দিয়ে ভাগ করি। এবার ভাগফল পাওয়া যাবে ১ আর ভাগশেষ ১। এই ভাগশেষ ১ টা হচ্ছে বাইনারি সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্ক। আবার আগের ভাগফল ১ কে ২দিয়ে ভাগ করি। ১ কে ২ দ্বারা ভাগ যাচ্ছে না, তাই ভাগফল ০ আর ভাগশেষ ১। এই ভাগশেষ ১ হচ্ছে বাইনারি সংখ্যার সর্বশেষ অঙ্ক। তাহলে ৭ এর বাইনারি রূপ হল ১১১।

বার বার ভাগ করে বাইনারি সংখ্যা বের করা একটু ঝামেলা তাই আমরা যদি ছক করে নেই তাহলে কাজটা সহজ হয়ে যায়।

নিম্নে ছক আকারে বাইনারি সংখ্যা কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলোঃ

সংখ্যা	১৬	৮	৪	২	১
০					০
১					১
২				১	০
৩				১	১
৪			১	০	০
৫			১	০	১
৬			১	১	০
৭			১	১	১
৮		১	১	০	০
৯		১	০	০	১
১০		১	০	১	

[সংগৃহীত]

WORLDWIDE PUBLIC HOLIDAYS

Md. Ashraful Islam Shahed

Class : Nine, Sec : B, Group : Science, Roll No : 5

Bangladesh

Shaheed day	ঃ (21-Feb.)
Eid-ul-Azha*	ঃ (23-25 Feb.)
Birthday of father of nation	ঃ (17 Mar)
Independence day	ঃ (26 Mar)
Bangla New years day	ঃ (14 Apr)
May day	ঃ (1 May)
Eid-e-milad-un-Nabi*	ঃ (25 May)
Buddha Purnima	ঃ (1Jun)
National Mourning day	ঃ (15 Aug)
Shab-e-Barat*	ঃ (22 Oct)
Eid-ul-Fitr*	ঃ (7-9 Dec)
Victory day	ঃ (16 Dec)
Christmas day	ঃ (25 Dec)

Indonesia

New year's day	ঃ (1 Jan)
Eid-ul-Azha	ঃ (23 Feb)
Good Friday	ঃ (15 Mar)
Hijiriyah new year	ঃ (29 Mar)
Seclusion day	ঃ (13 Apr)
Ascension day of Jesus christ	ঃ (9 May)
Maulid of prophet Muhammad	ঃ (25 May)
Waisak day	ঃ (26 May)
Independence day	ঃ (4 Oct)
Isra Miraj day	ঃ (6-7 Dec)
Edul Fitr*	ঃ (25 Dec)
Christmas day	ঃ (25 Dec)

Pakistan

Eid-ul-Azha*	ঃ (24-25 Feb)
Pakistan day	ঃ (23 Mar)
Moharram*	ঃ (26-27 Mar)
May day	ঃ (1 May)
Eid-e-millad-un-Nabi*	ঃ (25 May)
Independence day	ঃ (14 Aug)
Iqbal Day	ঃ (9 Nov)
Eid-ul Fitr*	ঃ (7-9 Dec)
Birth of Quide-e	ঃ (25 Dec)

China

New Years day	ঃ (1 Jan)
Lunar new years	ঃ (12-14 Feb)
Labour day	ঃ (1-3 May)
National day	ঃ (1-3 Oct)

Japan

New years day	ঃ (1 Jan)
Coming of age day	ঃ (14 Jan)
Nat'l foundation day	ঃ (11 Feb)
Vernal equinox day	ঃ (21 Mar)
Greenery day	ঃ (29 Apr)
Memorial day	ঃ (3 may)
Holiday for a nation	ঃ (4 May)
Children's day	ঃ (6 May)
Marine day	ঃ (20 Jul)
Respect the age day	ঃ (16 Sep)
Autumnal equinox day	ঃ (23 Sep)
Health-sports day	ঃ (14 Oct)
Culture day	ঃ (4 Nov)
Thanks giving day	ঃ (23 Nov)
Emperor's Birth day	ঃ (23 Dec)

Malaysia

New year's day	ঃ (1 Jan)
Chinese new year	ঃ (12-13 Feb)
Hari Raya Haji	ঃ (23 Feb)
Awal Muharram	ঃ (15 Mar)
Labour day	ঃ (1 May)
Prophet's Birth day	ঃ (25 May)
Wesak day	ঃ (26 May)
Agong's Birth day	ঃ (1 Jun)
National Birth day	ঃ (31 Aug)
Deepavili	ঃ (3 Nov)
Hari raya puasa	ঃ (6-7 Dec)
Christmas day	ঃ (25 Dec)

Thailand

New year's day	ঃ (1 Jan)
Makha Bucha day	ঃ (26 Feb)
Chakri day	ঃ (8 Apr)
Songkran festival	ঃ (15-16 Apr)
Labour day	ঃ (1 May)
Coronation day	ঃ (6 May)
Wisakha Bucha day	ঃ (27 May)
Buddist lent day	ঃ (25 Jul)
H. M. The queen's Birth day	ঃ (12 Aug)
Chulalongkorn day	ঃ (23 Oct)
H. M. The King Birth day	ঃ (5 Dec)
Constitution day	ঃ (10 Dec)
New years eve	ঃ (31 Dec)

Canada

New year's day	ঃ (1 Jan)
Good Friday	ঃ (29 Mar)
Easter Monday	ঃ (1 Apr)
Victoria day	ঃ (20 May)
Canada day	ঃ (1 Jul)
Labour day	ঃ (2 Sep)
Thanks giving day	ঃ (14 Oct)
Remembrance day	ঃ (11 Nov)
Christmas day	ঃ (25 Dec)
Boxing day	ঃ (26 Dec)

France

New years day	ঃ (1 Jan)
Easter Sunday	ঃ (31 Mar)
Easter Monday	ঃ (1 Apr)
Labour day	ঃ (1 May)
Victory day 1945	ঃ (8 May)
Ascension day	ঃ (9 May)
Whit Monday	ঃ (20 May)
National day	ঃ (14 Jul)
Feast of Assumptsion	ঃ (15 Aug)
All saint's day	ঃ (1 Nov)
Victory day 1918	ঃ (11 Nov)
Christmas day	ঃ (25 Dec)

Singapore

New year's day	ঃ (1 Jan)
Chinese new year	ঃ (12-13 Feb)
Hari raya haji	ঃ (23 Feb)
Good Friday	ঃ (29 Mar)
Labour day	ঃ (1 may)
Vesak day	ঃ (26 May)
National day	ঃ (9 Aug)
Deepavali	ঃ (3 Nov)
Hari Raya puasa	ঃ (6 Dec)
Christmas day	ঃ (25 Dec)

New Zealand

New year's festival	ঃ (1-2 Jan)
Waitangi day	ঃ (6 Feb)
Easter Sunday, Monday	ঃ (31 Mar, 1 Apr)
ANZAC Day	ঃ (25 Apr)
Labour day	ঃ (28 Apr)
Christmas and Boxing	ঃ (25-26 Dec)

South Koria

New year's day	ঃ (1 Jan)
Lunar new year's	ঃ (11-13 Feb)
Independence day	ঃ (1 Mar)
Arbor day	ঃ (5 Apr)
Children's day	ঃ (5 May)
Buddas Birth day	ঃ (19 May)
Memorial day	ঃ (6 Jun)
Constitution day	ঃ (17 Jul)
Liberation day	ঃ (15 Aug)
Ch'usok	ঃ (20-22 Sep)
Nat'l foundation day	ঃ (3 Oct)
Christmas day	ঃ (25 Dec)

U. S. A

New year's day	ঃ (1 Jan)
M. L. King's Birth day	ঃ (21 Jan)
Washington's Birth day	ঃ (18 Feb)
Memorial day	ঃ (27 May)
Independence day	ঃ (4 Jul)
Labour day	ঃ (2 Sep)
Columbus day	ঃ (14 Oct)
Veterens day	ঃ (11 Nov)
Thanks giving day	ঃ (28 Nov)
Christmas day	ঃ (25 Dec)

U. K

New year's day	ঃ (1 Jan)
Good Friday	ঃ (29 Mar)
Easter Monday	ঃ (1 Apr)
Early may bank	ঃ (6 May)
Spring bank	ঃ (27 May)
Summer bank	ঃ (26 Aug)
Christmas day	ঃ (25 Dec)
Boxing day	ঃ (26 Dec)

** Subject to the appearance of the moon*

বিদ্যালয় পরিক্রমা

শাহানা আখতার

সহকারী শিক্ষক

প্রাচীন বট বৃক্ষের মত শত শিকড়ে জড়িয়ে আছে এই ব্যস্ত শহরের এক প্রান্তসীমায় ঐতিহ্যের সুবাসে লালিত এবং শিক্ষার আলোকবর্তিকা হাতে প্রজ্জলিত একটি বিদ্যালয় যার নাম ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল। কালের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বৃটিশ শাসন থেকে বহুদীর্ঘ পথ বেয়ে আজকের বাংলাদেশে আগমন পর্যন্ত সদা উন্নত ছিল এই স্কুলটির শির। ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি হেঁটেছে অনেক পথ আর সুবাসিত করেছে দেশ ও জাতিকে অসংখ্য নিষ্ঠাবান, সুযোগ্য দেশ বরণ্যে সন্তানদের সুশিক্ষায় দীক্ষিত করে। বৃটিশ শাসনামল থেকে অদ্যাবধি বিদ্যালয়টি স্বীয় ঐতিহ্য ও স্বমহিমায় মুসলিম সমাজের শিক্ষার ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। চলুন এক নজরে দেখে আসি তার বহুমুখী কর্মধারার প্রয়াস এবং সফলতার বর্ণাঢ্য স্বাক্ষর।

যেভাবে বর্ষ শুরু ঃ স্কুলটি তার শুভ নববর্ষের সূচনা করে কচি কচি মুখ এবং নিস্পাপ শিশুদের কলকাকলী নিয়ে। বর্ষ শুরুতেই পঞ্চম শ্রেণীতে ছাত্রদের জন্য সুন্দর পরিবেশে নির্ধারিত কারিকুলামে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নিরপেক্ষ বিবেচনায় ও মেধার ভিত্তিতে ভর্তি সম্পাদনের সাথে সাথে শুরু হয় রুটিন মাফিক ক্লাস পরিচালনা। ঘন্টা বাজার ধ্বনিতে শুরু হয় সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত কর্মমূখর দিন।

বিদ্যালয়ের পোশাক ও মনোগ্রাম ঃ বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পোশাক বিদ্যালয়ের পরিচয় ও ঐতিহ্য বহন করে। তাই বিদ্যালয় কর্তৃক ছাত্রদের পোশাক ও মনোগ্রাম সুনিদিষ্ট আছে। ক্লাস করা, পরীক্ষা দেয়া বা যে কোন কাজে বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে পোশাক পরে থাকা বাধ্যতামূলক। পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত নেভি ব্লু ফুল প্যান্ট, সাদা শার্ট পকেটে মনোগ্রাম, মাথায় সাদা টুপি ও নেভি ব্লু পিটি সু। শীতের পোশাক হিসেবে নেভি ব্লু সোয়েটার।

প্রত্যাহিক সমাবেশ ঃ শৃংখলা ও জাতীয়তাবোধ আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পূর্ব শর্ত। তাই প্রতিদিন শ্রেণীর পাঠদান কার্যক্রম শুরু করার ১৫ মিনিট পূর্বে বিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষকের সুদক্ষ পরিচালনায় সমাবেশের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াৎ, শপথ পাঠ, জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনও ছাত্র শিক্ষক সকলের বাধ্যতামূলক অংশ গ্রহনের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় এ অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়। এ ছাড়া প্রায়ই প্রধান শিক্ষকও সহকারী প্রধান শিক্ষক সমাবেশে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নৈতিক মূল্যবোধের উপর বক্তব্য রাখেন। সবশেষে প্রয়োজনীয় ব্যায়াম অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাত্যাহিক সমাবেশ শেষ হয়। এতে ছাত্ররা সুশৃঙ্খল ও ধর্মানুরাগী হয়ে উঠার প্রেরণা লাভ করে।

পাঠ পরিকল্পনা ঃ বছরের শুরুতে ছাত্রদের মাঝে একটি সিলেবাস বা পাঠপরিকল্পনা বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের সারা বছরে কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য তিনটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কোন পরীক্ষায় পাঠ্য পুস্তকের কতটুকু পড়ানো হবে প্রশ্ন পত্রের ধরন, মানবন্টন, সমগ্র বছরের পরীক্ষা সমূহের তারিখ ও ফলাফল ঘোষণার তারিখ ও উক্ত সিলেবাসে নির্দিষ্ট থাকে।

ডায়েরী ঃ বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন (শ্রেণীর) কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করার জন্য বৎসরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদেরকে স্কুল কর্তৃক ছাপানো একটি

উন্নতমানের ডায়েরী প্রদান করা হয়। প্রতিদিন ছাত্রদের এটি অবশ্যই শ্রেণীতে নিয়ে আসতে হয়। যাতে স্কুলের প্রতিটি ঘন্টার বাড়ির কাজ ডায়েরীতে লিখে নিতে পারে। এতে বিষয় শিক্ষকও অভিভাবকের স্বাক্ষরের ব্যবস্থা আছে। অভিভাবক/অভিভাবিকাবৃন্দ ডায়েরী দেখে ছাত্রের প্রতিদিনের লেখা পড়ার অগ্রগতি উপলব্ধি করতে পারেন। এ ছাড়া ডায়েরীতে ছাত্রের আচরণ ও বিশেষ নির্দেশনাবলী লিখা আছে যা একজন ছাত্র ও অভিভাবক/অভিভাবিকার জানা একান্ত দরকার।

বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল যেভাবে নির্ণিত হয়ঃ

১ম ও ২য় সাময়িক পরীক্ষার ২৫% করে এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৫০% নিয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হয়। এ ছাড়া প্রত্যেক বিষয়ের ১০ (দশ) নম্বরের শ্রেণী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রেণী পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ১ম সাময়িক ২য় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার নম্বরের সাথে যোগ করা হয়। অভিভাবকগণের উপস্থিতিতে ফলাফল প্রকাশ করা হয় এবং উক্ত দিবসটি অভিভাবক দিবস হিসাবে গণ্য হয়।

বার্ষিক মিলাদ মাহফিল ঃ অত্র বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কর্মকান্ডের মধ্যে মিলাদ মাহ্ফিল অনুষ্ঠান একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। শিক্ষার্থীদেরকে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য মহানবী (সঃ) এর জীবনাদর্শ আলোচনা, ইসলামের পূণাঙ্গ অনুসরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রতি বছর। মিলাদ মাহ্ফিলের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশ গ্রহনের মাধ্যমে ভাবগম্ভীর পরিবেশে হাম্দ, না'ত, গজল মহানবী (সঃ) এর জীবনী সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ, ক্বিরাত, আযান ইত্যাদি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থীরা ইসলামের মৌলিক বিষয়ের বাস্তব দিকগুলো জানার সুযোগ পায় এবং তাদের মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধের চেতনা জাগ্রত হয়। পরিশেষে কৃতিত্ব অর্জনকারী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ শিক্ষা বছরের শুরুতে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতায় ছাত্র-শিক্ষক ও আমন্ত্রিত অভিভাবকবৃন্দ অংশ গ্রহন করে থাকে। বয়স ও উচ্চতার ভিত্তিতে ছাত্রদের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। এতে ছাত্রদের মাঝে খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং তারা খেলায় অংশ গ্রহনের মাধ্যমে নিজেদের ক্রীড়া নৈপুন্য প্রদর্শনের সুযোগ লাভ করে। প্রতিযোগিতা শেষে কৃতিত্ব অর্জনকারী অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান ঃ বার্ষিক পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান অত্র বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক কর্মকান্ডের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং সর্বাপেক্ষা আকর্ষনীয় বটে।

যে সব বিষয়ে কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্রদের পুরস্কার প্রদান করা হয়-

১) শ্রেণী ভিত্তিক মেধা তালিকায় স্থান লাভ (১ম, ২য় ও ৩য় স্থান)

২) সর্বোচ্চ উপস্থিতি (শ্রেণী ভিত্তিক ১জন)

৩) উত্তম আচরণের জন্য (শ্রেণী ভিত্তিক ১জন)

৪) চিত্রাংকন (১ম, ২য়, ৩য় স্থান)

৫) জ্ঞান জিজ্ঞাসা

৬) বক্তৃতা ও বিতর্ক

শিক্ষকবৃন্দের পুরস্কার ঃ (ক) নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ না করার জন্য-

১ দিন ও ছুটি ভোগ না করার জন্য ১ম পুরস্কার

১৫ দিন ছুটি ভোগ না করার জন্য ২য় পুরস্কার

১০ দিন ছুটি ভোগ না করার জন্য ৩য় পুরস্কার

(খ) নিয়মিত দৈনিক পাঠের বিবরণী ব্যবহারের জন্য।

গ্রন্থাগার ঃ প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও সুপ্রাচীন একটি গ্রন্থাগার। এতে ষোল হাজারেরও অধিক মূল্যবান ও সুপ্রাচীন দূর্লভ বই আছে। প্রতি বছর এই গ্রন্থাগারটি আরো সমৃদ্ধ করার জন্য নতুন নতুন বই সংগ্রহ করা হচ্ছে। গ্রন্থাগারটিতে একজন সার্বক্ষণিক লাইব্রেরীয়ান নিয়োগসহ অন্যান্য সংস্কার ও আধুনিকায়নের যাবতীয় কার্যাবলী বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে

বিদ্যালয়ের কর্মরত দুইজন শিক্ষক লাইব্রেরীর দায়িত্বে আছেন।

বিজ্ঞানাগার ঃ তথ্য প্রযুক্তির এই বিশ্বায়নের যুগে পিছিয়ে নেই স্কুলটির বিজ্ঞানাগারের বহুবিধ কার্যক্রম। পদার্থ বিদ্যার- শব্দ, আলো, তড়িৎ, গতি ইত্যাদি বিষয়ে রয়েছে ছাত্রদের হাতে কলমে শিক্ষার সুযোগ। রসায়ন বিদ্যার-অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি গ্যাস প্রস্তুত প্রণালীর সম্যক ধারণাসহ অন্যান্য ধাতু খনিজ পদার্থের বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান লাভের সুবিধা আছে স্কুলটির বিজ্ঞানাগারে। অপরদিকে জীব বিজ্ঞানের নিপুণ কলাকৌশলে জীবন প্রণালীসহ অন্যান্য মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডীর কোষ বিভাজন ধমনী ও শিরা বিন্যাস এবং শরীরের অবকাঠামোর বৈশিষ্ট্য হাতে কলমে উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। এ ছাড়া ফরমালিন দ্রবণে সংরক্ষিত আছে দুষ্পাপ্য প্রজাতি প্রাণীর নমুনা।

কম্পিউটার ঃ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর অবদান কম্পিউটার-প্রযুক্তি যা থেকে পিছিয়ে নেই এই স্কুলের ছাত্র শিক্ষকবৃন্দ। স্কুলের একটি মনোরম কক্ষে উন্নত পরিবেশে কম্পিউটার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বিজ্ঞ প্রধান শিক্ষকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় ২০০০ইং সাল থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য কম্পিউটার ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের বাহিরেও পরীক্ষার রেজাল্ট, নম্বরপত্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত তথ্যাদি নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে।

টিফিনের ব্যবস্থা ঃ বিদ্যালয় কর্তৃক ছাত্রদের জন্য উন্নত মানের টিফিনের ব্যবস্থা রয়েছে। ৪র্থ ঘন্টা শেষে শ্রেণীকক্ষেই ছাত্রদের মাঝে টিফিন সরবরাহ করা হয়।

নামাজের ব্যবস্থা ঃ বিদ্যালয়ে একটি বড় নামাজ ঘর রয়েছে। এই নামাজ ঘরে প্রতিদিন ছাত্র শিক্ষক জামাতে জোহরের নামাজ আদায় করে থাকে।

বেসরকারী বিভিন্ন কর্ম কান্ডের তত্ত্বাবধান ঃ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ড তত্ত্বাবধানের জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে উক্ত কর্মকান্ড পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির একজন প্রধান থাকেন, তিনি কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

আবাসিক হোস্টেল ঃ স্কুলের সড়ক সংলগ্ন উত্তর পাশে "ডাফরিন মুসলিম হোস্টেল" নামে ছাত্রদের জন্য একটি হোস্টেল রয়েছে। উক্ত হোস্টেলে ছাত্রদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। হোস্টেলটি একজন হোস্টেল সুপার তত্ত্বাবধান করে থাকেন, যা একজন শিক্ষকের দায়িত্বে রয়েছে।

পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ও বিশেষ দো'য়ার অনুষ্ঠান ঃ

'হয়তো আমার এ পথে আর হবে নাক আসা
দুয়ারে যাই রোপন করে বুকের ভালবাসা।"

বিদায়ী ছাত্রদের হৃদয়ের বেদনা বিধুর এই নির্মল ভালবাসাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতি বছর এস, এস, সি পরীক্ষার আগে পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। পরীক্ষার্থীদের জন্য রীতিমত দাওয়াত পত্রের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে পরীক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি ফুল এবং স্নেহ মমতার প্রতীক হিসাবে সকলকে একটি করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিদায়ী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকগণ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। শেষে পরীক্ষার্থীদের জন্য মহান আল্লাহতালার কাছে মোনাজাত করা হয়।

স্কুলটির বর্তমান অবস্থা আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান প্রধান শিক্ষকের বাস্তব ভিত্তিক দিক নির্দেশনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সাথে সুযোগ্য শিক্ষক মন্ডলীর শ্রম ও মেধা যুক্ত হয়ে স্কুলের সুনাম ও ভাবমূর্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অস্থির রাজনীতির কালিমা বা অতি আধুনিকতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার কদর্যতা স্পর্শ করতে পারেনি এ সুন্দর স্কুলটিকে। এখানে বিরাজ করছে প্রাচীন ইতিহাসের গন্ধ, আধুনিকতার পরিমার্জিত রূপ, আর জ্ঞান সাধনার অনবদ্য এক নির্মল পরিবেশ।

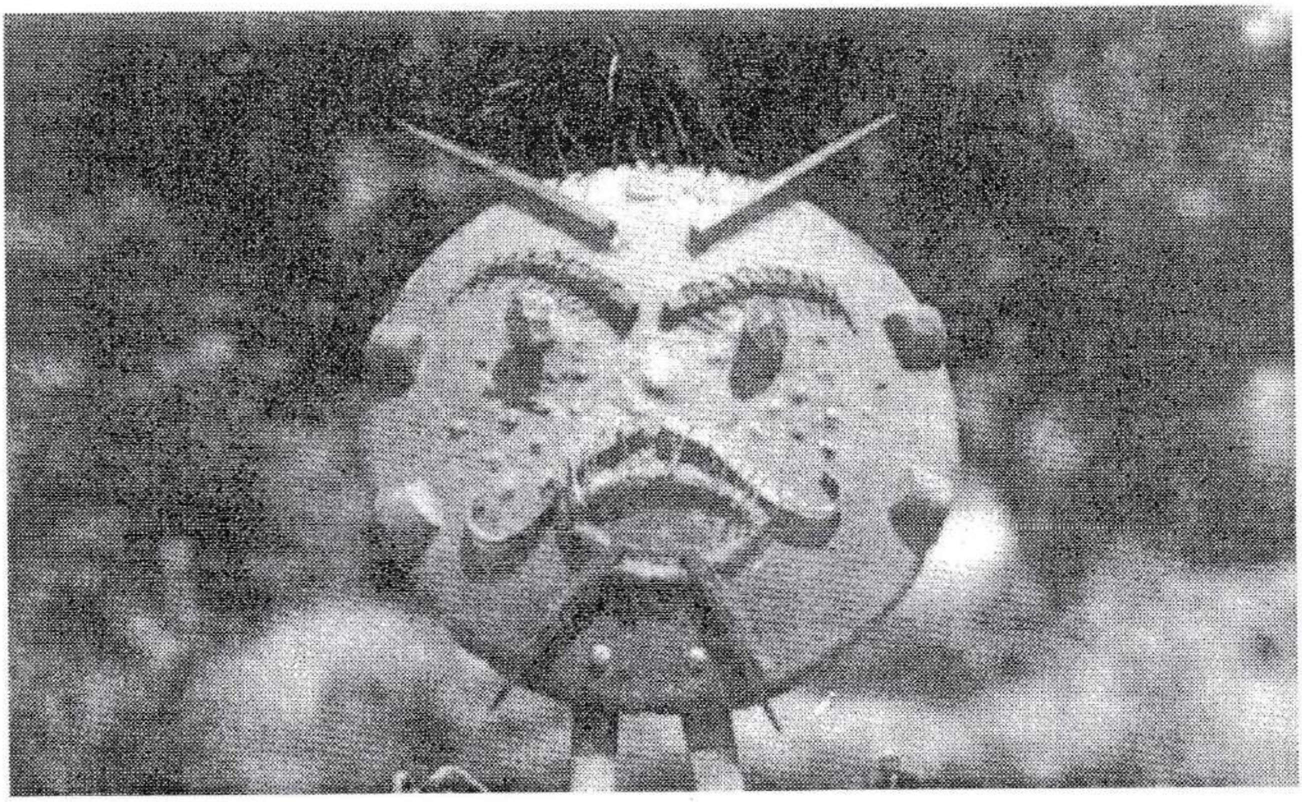

ছাত্রদের
আঁকা ছবি

মোঃ রাসেল- শ্রেণী ঃ ১০ম, বিভাগ ঃ ব্যবসায় শিক্ষা, রোল নং ঃ ৩৭

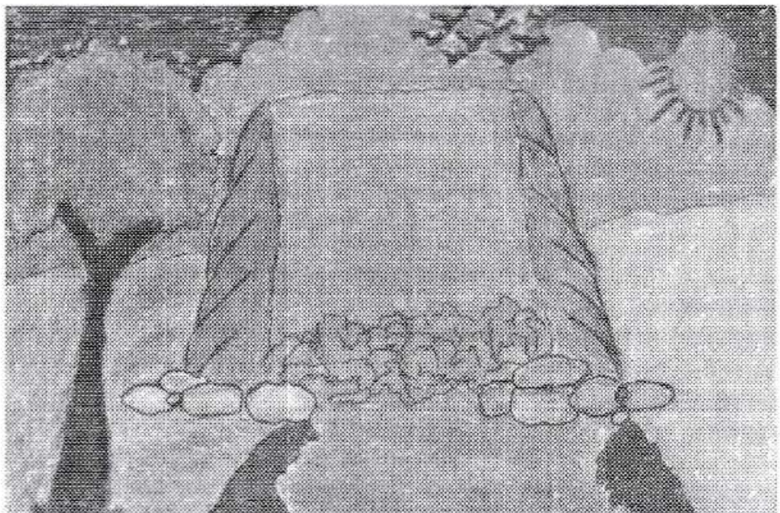

মোঃ শিবলী হায়দার খান- শ্রেণী ঃ ৮ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ১০

ছবিটি একেঁছে মোঃ সাইফুল ইসলাম, শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৫৩

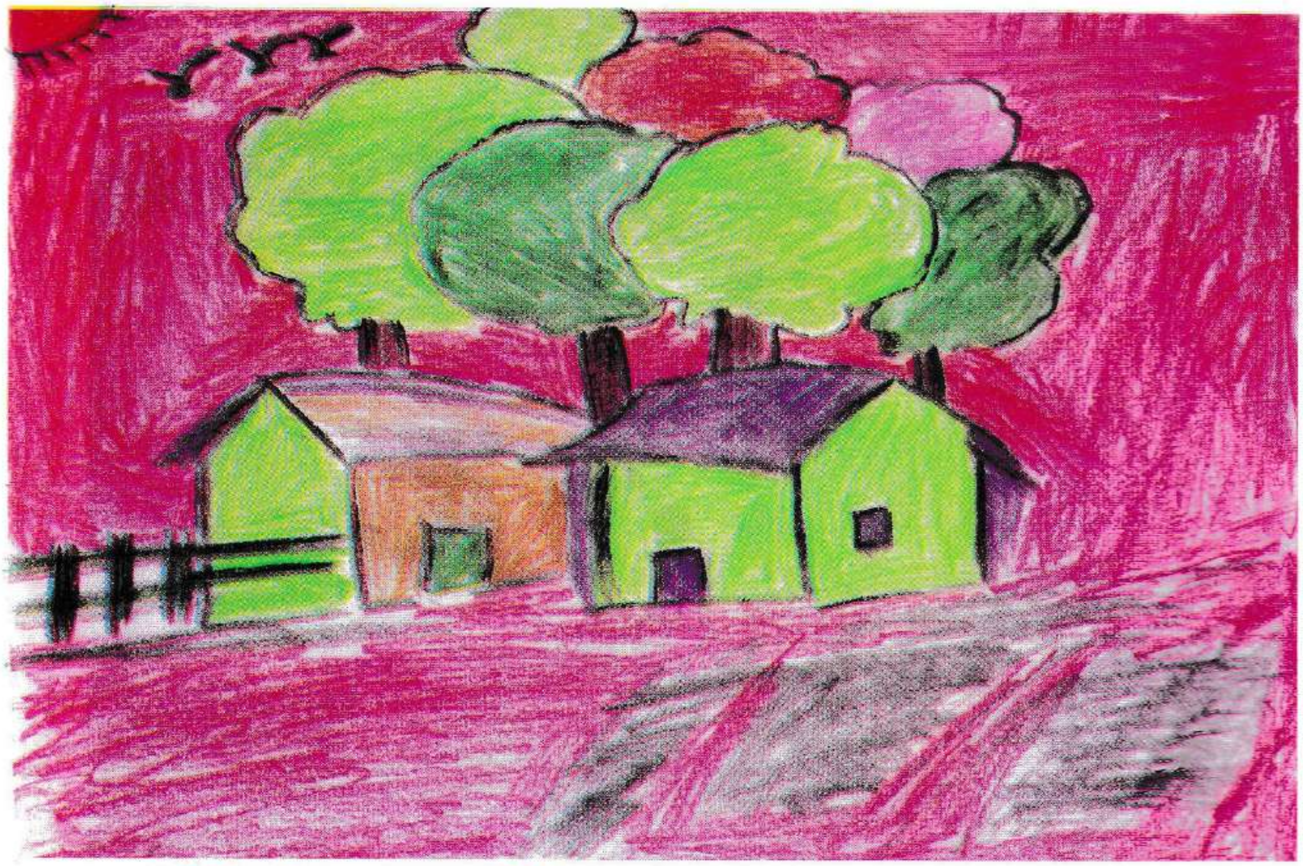

ছবিটি এঁকেছে মোঃ বাকীবিল্লাহ শ্রেণী ঃ ৭ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৩

ছবিটি এঁকেছে মোঃ হাসিবুর রহমান (অর্ণব) শ্রেণী ঃ ৮ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ২

ছবিটি এঁকেছে মোঃ তৌফিক ইমাম খান শ্রেণী ঃ ৫ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১২

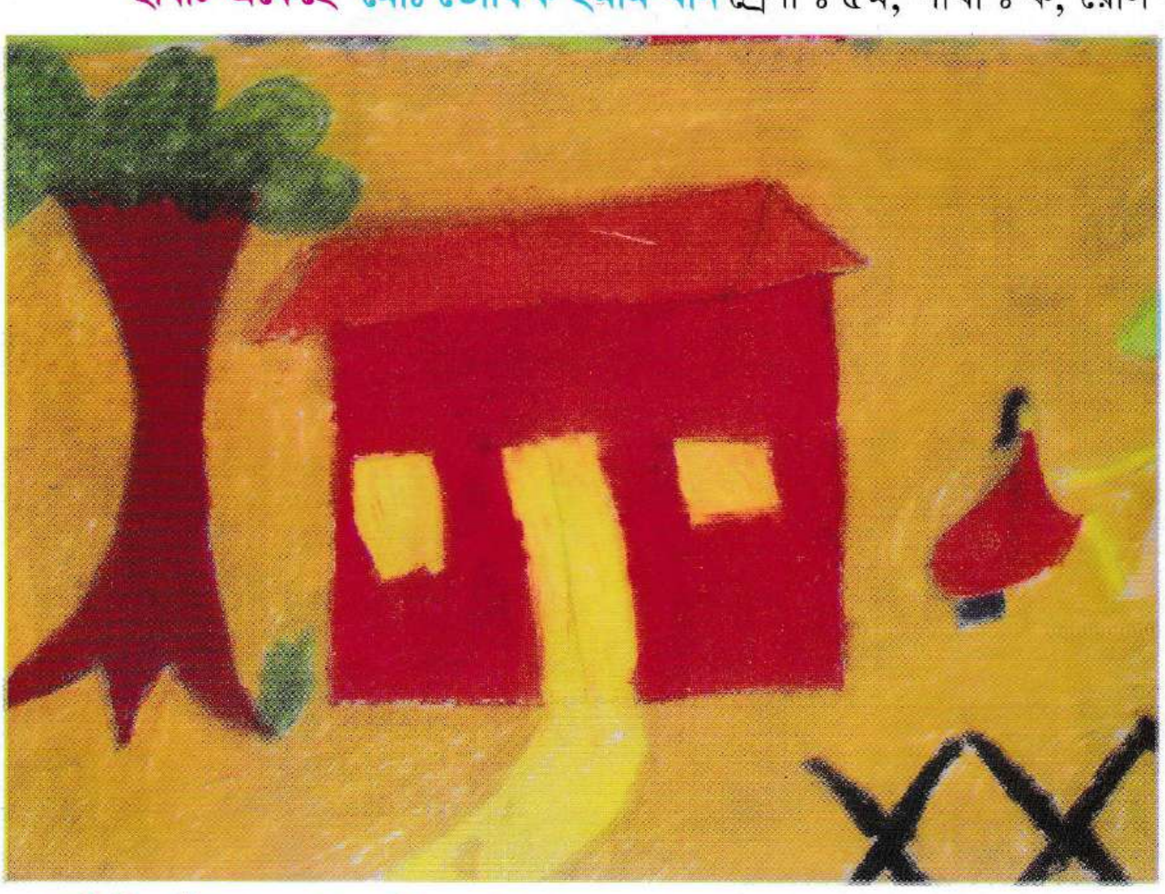

ছবিটি এঁকেছে শেখ জহিরুল ইসলাম শ্রেণী ঃ শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৭

ছবিটি এঁকেছে মোঃ তানভীর হাসান (সানি) শ্রেণী ঃ ৫ম, শাখা ঃ খ, রোল নং ঃ ৩২

ছবিটি এঁকেছে মোঃ আল-আমীন শ্রেণী ঃ , শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১৪

ছবিটি এঁকেছে মোঃ আশরাফুল আলম শ্রেণী ঃ ৫ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ১৯

ছবিটি এঁকেছে মোঃ রাসিক শ্রেণী ঃ ৫ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৮

ছবিটি এঁকেছে মোঃ রাসিক শ্রেণী ঃ ৫ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৮

ছবিটি এঁকেছে মোঃ মেহেদী হাসান রাকিব শ্রেণী ঃ ৫ম, শাখা ঃ ক, রোল নং ঃ ৩০

ঢাকা গভর্ণমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল